বঙ্কিমচন্দ্র

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :

৭ই চৈত্র,

১৮৮৪

পাঁচ টাকা

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীহরলাল বদ্ধন
বদ্ধন প্রেস
৮।৪এ, কাশী ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

"পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"

এই জীবনে
যাঁহার স্মৃতিমাত্র আমার সম্বল ;
যিনি সূতিকাগারে পুত্রের মুখ দেখিয়া
তাহাকে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ
করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার আয়োজন করিবার
পূর্ব্বেই মহাযাত্রা করিয়াছিলেন ; যাঁহার সংগৃহীত
পুস্তকরাশির মধ্যে বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার
পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাঁহার উদ্দেশে
এই পুস্তক ভক্তিসহকারে
উৎসর্গ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর যে শোকসভা হয়, তাহাতে তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার জীবনচরিত লিখিত হয়, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না এবং তাঁহার কোন দৌহিত্র পরে সে কাজ করিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কোন জীবন-চরিত রচিত হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরবৎসর 'দাসী' নাম্নী মাসিক পত্রিকায় আমি কতকগুলি প্রবন্ধে সাধারণভাবে তাঁহার রচনার এবং 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'বিষবৃক্ষ,' 'চন্দ্রশেখর,' 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসগুলির আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধগুলি সে সময় সাহিত্যিকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার পর ১৩১৫ বঙ্গাব্দে আমি সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করি। বহুদিন হইল আমার প্রকাশিত সংস্করণের পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে, যেমন শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় কর্তৃক তেমনই তাঁহার রচনার উৎকৃষ্ট অংশসমূহ একত্র প্রকাশিত হয়। স্নেহভাজন কুমার শ্রীমান বিমলচন্দ্র সিংহ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন এবং উহার শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি অপ্রকাশিত ইংরেজী রচনাও প্রকাশ করেন—সেগুলি আমি দীর্ঘকাল বিশেষ যত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি।

পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানের সময় হুগলী, ধানবাদ ও গৌহাটী তিনটি স্থানে সভায় সভাপতিত্ব করিতে আহূত হইয়া অভিভাষণ রচনাকালে আমার মনে হয়, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে যে ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তাহার পর সময় সময় মাসিকপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি সে সকলের সহিত অভিভাষণত্রয় একসঙ্গে প্রকাশ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার কতকগুলি রচনা একস্থানে রক্ষিত হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত আমার সাহিত্য-সাধনায় কিরূপ সহায় হইয়াছিল, তাহা আমি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমি যখন তরুণবয়স্ক সেই সময় চৈতন্য

লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ 'হিন্দু সমাজ ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আহ্বান করেন—পুরস্কার. মেডেল। বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসু প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন। কার্য্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রই রচনাগুলি পরীক্ষা করেন এবং আমার রচনা পুরস্কারের উপযুক্ত এই মত প্রকাশ করিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি তখন যুবক ও কলেজের ছাত্র জানিয়া আমাকে যে উৎসাহ দিয়াছিলেন, তাহা আমার সাহিত্য-সাধনায় আমাকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা অবশ্যপাঠ্য হইবার পর আমার স্নেহভাজন বহু ছাত্র আমার ক্ষুদ্র পুস্তকখানির সন্ধান করিয়াছেন। আবার এক শ্রেণীর মুসলমান "বন্দে মাতরমে" আপত্তি করায় আমি সে আপত্তি খণ্ডনের জন্যও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম।

সেই সকল প্রবন্ধ ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার তালিকা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইল। পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য কোন কোন প্রবন্ধ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পুস্তকে যে সামান্য পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

উপক্রমণিকা

মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র বহুধা বিভক্ত। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি—এই সকলই মানুষের আলোচনার ও অনুশীলনের বিষয় হইয়া থাকে। জাতির উদ্যম ও উৎসাহ সমাজের নিম্নস্তর হইতে উদ্গত হয় এবং সাহিত্য প্রভৃতি উচ্চস্তরে বিকশিত হয়। মানুষ তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনেও শিল্পের প্রতি অবহিত হয়; তাহার সাধারণ শৃঙ্খলার জন্য সমাজনীতির ও সমাজবদ্ধ হইয়া বাসের প্রয়োজনে রাজনীতির চর্চ্চা প্রয়োজন হয়। আবার মানুষ তাহার ব্যক্তিগত বা জাতীয় ভাবের জন্য যে দর্শন মানবকে প্রকৃত অতি-প্রাকৃতের রাজ্যে লইয়া যায়, সেই দর্শনকেও পশুবলের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের উপায় করে এবং যে বিজ্ঞান মানবের কল্যাণকর কার্য্যেই সার্থক হয় তাহাকে মৃত্যুর ও ধ্বংসের রথে যুক্ত করিয়া বিনাশের পথে অগ্রসর হয়। মানবের ইতিহাসের আলোচনা করিলে প্রতীত হয়—সকল জাতির মধ্যেই সময় সময় এক বা বহু মনীষী আবির্ভূত হইয়া মানবের কর্ম্মক্ষেত্রের এক বা একাধিক বিভাগে অদৃষ্টপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করেন। তাঁহাদিগের প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোকে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয়; তাঁহাদিগের চেষ্টায় কুসংস্কারের কঠিন নিগড় বিচ্ছিন্ন হয়; তাঁহাদিগের প্রভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতির স্রোতঃ দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়। তাঁহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধাসহকারে মহাপুরুষ ও যুগাবতার বলিয়া থাকি।

বঙ্গদেশে—বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে এই শ্রেণীর বহু লোকের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। কারণ, "বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মুখে শুনেন যে, বাঙ্গালা নদীমুখনীত কর্দ্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন যে, কালি পরশ্ব হিমাচল-পদতলে সাগরোর্ম্মি প্রহত হইত।" বাঙ্গালার ইতিহাসে গৌরবের অধ্যায় অল্প নহে। ফরাসী মনীষী ভিক্তর হুগো বলিয়াছেন—"লেখনী তরবার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না? ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল।"

কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলেরও অভাব ছিল না।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার শিবিরে "প্রাসিই" ও "গণ্ডরিডয়" নামক দুইটি রাজ্যের সংবাদ নীত হইয়াছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র যে জনপদের রাজধানী ছিল তাহাকে "প্রাসিই" (প্রাচী) বলিয়া অভিহিত করিয়া উহার পূর্ব্বদিকে "গঙ্গরিডি" নামক আর একটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "গণ্ডরিডয়" ও 'গঙ্গরিডি' অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। ডিওডোরস মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—গঙ্গানদী "গঙ্গরিডই দেশের পূর্ব্বসীমায় প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গরিডই রাজ্যের অধিবাসিগণের অসংখ্য বৃহদাকার রণহস্তী আছে। সেইজন্য তাঁহাদিগের দেশ কখনও কোন বিদেশী রাজার দ্বারা অধিকৃত হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা গঙ্গরিডইগণের অসংখ্য ও দুর্জ্জয় রণহস্তিসমূহকে ভয় করে।" যাহাদিগের এইরূপ রণহস্তী ছিল, তাহাদিগের নায়কগণ যে রণকৌশলসম্পন্ন ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

"বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় দেবপাল দেব ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া কীর্ত্তিত। লক্ষ্মণসেনের জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল।"

বাস্তবিক "যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে, বালিদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে বাংলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> "একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
> একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়;
> সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ···"

তাহা কবিকল্পনা নহে—অতিরঞ্জিতও নহে। কারণ, সিংহল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অধিকৃত ও পুরুষানুক্রমে শাসিত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালী উপনিবেশে পরিণত করিয়াছিল। উপনিবেশ স্থাপন যদি জাতির উন্নত অবস্থার দ্যোতক হয়, তবে বাঙ্গালী উন্নত ছিল। এই উপনিবেশ স্থাপন বাহুবলে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। বাঙ্গালীর সে পরিচয়ের অভাব নাই।

এই বাহুবল বাঙ্গালী বহুকাল অনুশীলনফলে রক্ষা করিয়াছিল। মুসলমানগণ

তিনশত বৎসরেও সমগ্র বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। "ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুষ্কর হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশেই হয় নাই।" "ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। এই পাঁচটি প্রদেশ—(১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য ও (৫) বাঙ্গালা।"

এই নদীমাতৃক প্রদেশে লোকের সাধারণ ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে নৌ-নির্ম্মাণশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উপনিবেশ স্থাপনের ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ম সে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাঙ্গালীর জলযুদ্ধতৎপরতার উল্লেখ করিয়াছেন।

সামরিক প্রয়োজনে যে অস্ত্রের—আগ্নেয়াস্ত্রেরও নির্ম্মাণকৌশল বাঙ্গালী আয়ত্ত করিয়াছিল, তাহা বহু কামানে—বিশেষ বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত "দলমর্দ্দন" কামানে বুঝিতে পারা যায়। বিষ্ণুপুর ও তাহার নিকটস্থ স্থান "মল্লভূমি" অর্থাৎ যোদ্ধদেশ বলিয়া আখ্যাত হইত। তথায় নাগরিকদিগকে যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত করিবার যে আয়োজন ছিল, তাহাতে প্রাচীন স্পার্টার কঠোর ব্যবস্থা মনে পড়ে। সেই আয়োজন এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :

"অয়ঃপাত্রে পয়ঃপানং শালপত্রে চ ভোজনম্।
শয়নং তালপত্রে চ মল্লভূমেরিয়ং গতিঃ॥"
লৌহপাত্রে বারিপান, শালপত্রে আহার্য্য গ্রহণ,
মল্লভূমে এই প্রথা—তালপত্রে শয্যা বিরচন।

এইরূপ কঠোরতার সাধন মল্লভূমির অধিবাসিগণের সংস্কারে পরিণতিলাভ করিয়া তাহাদিগের ধাতুগত হইয়াছিল বলিয়াই খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও তথায় "পতিঘাতিনী সতী" নামে পরিচিতা, দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের পট্টমহারাণীর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। রাজা লালবাই নাম্নী যবনীর মোহে আবিষ্ট হইলে প্রজারা কুলধর্ম্মনাশের আশঙ্কা করিয়া মহারাণীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করিলে তিনিই স্বামীর হত্যার ব্যবস্থা করিয়া পতির চিতায় সহমৃতা হইয়াছিলেন।

'আইন-ই-আকবরী'তে লিখিত আছে, মোগল সম্রাটগণের জন্ম বাঙ্গালা হইতে জমিদারদিগকে রাজস্ব ব্যতীত ২৩ হাজার ৩ শত ৩০ জন অশ্বারোহী সৈনিক, ৮ লক্ষ ১ হাজার ১ শত ৫০ জন পদাতিক, ১ শত ৭০টি হস্তী, ৪ হাজার ২ শত ৬০টি কামান ও ৪ হাজার ৪ শত নৌকা প্রতিবৎসর দিতে হইত।

কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলেরও অভাব ছিল না।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার শিবিরে "প্রাসিই" ও "গণ্ডরিডয়" নামক দুইটি রাজ্যের সংবাদ নীত হইয়াছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র যে জনপদের রাজধানী ছিল তাহাকে "প্রাসিই" (প্রাচী) বলিয়া অভিহিত করিয়া উহার পূর্ব্বদিকে "গঙ্গরিডি" নামক আর একটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "গণ্ডরিডয়" ও 'গঙ্গরিডি' অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। ডিওডোরস মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—গঙ্গানদী "গঙ্গরিডই দেশের পূর্ব্বসীমায় প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গরিডই রাজ্যের অধিবাসিগণের অসংখ্য বৃহদাকার রণহস্তী আছে। সেইজন্য তাঁহাদিগের দেশ কখনও কোন বিদেশী রাজার দ্বারা অধিকৃত হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা গঙ্গরিডইগণের অসংখ্য ও দুর্জ্জয় রণহস্তিসমূহকে ভয় করে।" যাহাদিগের এইরূপ রণহস্তী ছিল, তাহাদিগের নায়কগণ যে রণকৌশলসম্পন্ন ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

"বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় দেবপাল দেব ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া কীর্ত্তিত। লক্ষ্মণসেনের জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল।"

বাস্তবিক "যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে, বালিদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে বাংলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়;
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ…"

তাহা কবিকল্পনা নহে—অতিরঞ্জিতও নহে। কারণ, সিংহল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অধিকৃত ও পুরুষানুক্রমে শাসিত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালী উপনিবেশে পরিণত করিয়াছিল। উপনিবেশ স্থাপন যদি জাতির উন্নত অবস্থার দ্যোতক হয়, তবে বাঙ্গালী উন্নত ছিল। এই উপনিবেশ স্থাপন বাহুবলে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। বাঙ্গালীর সে পরিচয়ের অভাব নাই।

এই বাহুবল বাঙ্গালী বহুকাল অনুশীলনফলে রক্ষা করিয়াছিল। মুসলমানগণ

তিনশত বৎসরেও সমগ্র বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। "ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুষ্কর হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশেই হয় নাই।" "ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। এই পাঁচটি প্রদেশ—(১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য ও (৫) বাঙ্গালা।"

এই নদীমাতৃক প্রদেশে লোকের সাধারণ ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে নৌ-নির্ম্মাণশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উপনিবেশ স্থাপনের ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য সে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাঙ্গালীর জলযুদ্ধতৎপরতার উল্লেখ করিয়াছেন।

সামরিক প্রয়োজনে যে অস্ত্রের—আগ্নেয়াস্ত্রেরও নির্ম্মাণকৌশল বাঙ্গালী আয়ত্ত করিয়াছিল, তাহা বহু কামানে—বিশেষ বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত "দলমর্দ্দন" কামানে বুঝিতে পারা যায়। বিষ্ণুপুর ও তাহার নিকটস্থ স্থান "মল্লভূমি" অর্থাৎ যোদ্ধদেশ বলিয়া আখ্যাত হইত। তথায় নাগরিকদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিবার যে আয়োজন ছিল, তাহাতে প্রাচীন স্পার্টার কঠোর ব্যবস্থা মনে পড়ে। সেই আয়োজন এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :

"অয়ঃপাত্রে পয়ঃপানং শালপত্রে চ ভোজনম্।
শয়নং তালপত্রে চ মল্লভূমেরিয়ং গতিঃ॥"
লৌহপাত্রে বারিপান, শালপত্রে আহার্য্য গ্রহণ,
মল্লভূমে এই প্রথা—তালপত্রে শয্যা বিরচন।

এইরূপ কঠোরতার সাধন মল্লভূমির অধিবাসিগণের সংস্কারে পরিণতিলাভ করিয়া তাহাদিগের ধাতুগত হইয়াছিল বলিয়াই খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও তথায় "পতিঘাতিনী সতী" নামে পরিচিতা, দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের পট্টমহারাণীর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। রাজা লালবাই নাম্নী যবনীর মোহে আবিষ্ট হইলে প্রজারা কুলধর্ম্মনাশের আশঙ্কা করিয়া মহারাণীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করিলে তিনিই স্বামীর হত্যার ব্যবস্থা করিয়া পতির চিতায় সহমৃতা হইয়াছিলেন।

'আইন-ই-আকবরী'তে লিখিত আছে, মোগল সম্রাটগণের জন্য বাঙ্গালা হইতে জমিদারদিগকে রাজস্ব ব্যতীত ২৩ হাজার ৩ শত ৩০ জন অশ্বারোহী সৈনিক, ৮ লক্ষ ১ হাজার ১ শত ৫০ জন পদাতিক, ১ শত ৭০টি হস্তী, ৪ হাজার ২ শত ৬০টি কামান ও ৪ হাজার ৪ শত নৌকা প্রতিবৎসর দিতে হইত।

বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় শেষ করিবার পূর্ব্বে একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ অরাজকতা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বাঙ্গালার প্রজাপুঞ্জ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোপালকে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল। প্রজার দ্বারা নৃপতিনির্ব্বাচন গণতন্ত্রের ইতিহাসে সাধারণ ঘটনা নহে।

বাহুবলের পর যে মানসিক বলকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা উচ্চতর স্থান দিয়াছেন, তাহার কথা বলা প্রয়োজন।

পুরাতন কীর্ত্তিরক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালীর কিছু অসুবিধা আছে। বাঙ্গালার আর্দ্রবায়ু তালপত্র ও তুলট কাগজ উভয়েরই শত্রু; এই জলবায়ুর প্রভাবে বর্ণ ম্লান হয়, তালপত্র ও কাগজ শীঘ্র নষ্ট হয়, কীটদষ্ট হয়। আবার ইহারই জন্য স্থপতি-কীর্ত্তি দ্রুতবর্দ্ধনশীল বৃক্ষলতার উপদ্রবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালায় প্রস্তর সুলভ নহে। কিন্তু স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে বাঙ্গালা স্বতন্ত্র রীতি রচনা করিয়াছিল। বাঙ্গালীর স্থাপত্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব। বাঙ্গালী স্থপতি প্রস্তরের অভাব চিত্রপূর্ণ ইষ্টকে পূর্ণ করিয়াছিল। বাঙ্গালার বহু প্রাচীন মন্দিরে এই ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার শিল্পী একুশ-রত্ন মন্দিরেও তাহার অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রকট করিয়াছে। বাঙ্গালার ভাস্কর মৃত্তিকায় যেমন প্রস্তরেও তেমনি দেবদেবীর মুখে অপূর্ব্ব শ্রীদান করিয়াছে। পৃথিবীর আর কোন দেশ বয়ন-শিল্পে—কার্পাস-বস্ত্রে ও রেশমের বস্ত্রে বাঙ্গালার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালার শিল্প-পরিচয় বার্ণিয়ারও দিয়াছেন।

যখনই দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়া অবস্থা সাহিত্যাদি চর্চ্চার অনুকূল হইয়াছে, তখনই বাঙ্গালীর প্রতিভা সপ্রকাশ হইয়াছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তাঁহার সমসাময়িক বহু বাঙ্গালী মনীষীর একজন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্টাব্দের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়ে আবির্ভূত। এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা রঘুনাথ শিরোমণি, এই সময়েই স্মার্ত্ততিলক রঘুনন্দন, এই সময়েই চৈতন্যদেব, এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী—চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণব সাহিত্য।"

বাস্তবিক চৈতন্য, রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশ, রঘুনন্দন—ইঁহারা অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর মোগল শাসনে বাঙ্গালা শোষণে কাতর হয়। "যে দিন হইতে দিল্লীর

মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেইদিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না—দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্ত শোষণ করিয়া এই রত্ন-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য ?”

দেখা যায়, বাঙ্গালার নবাব-নাজিম হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ পুণ্যাহের পর ধনাগারের দারোগাকে সঙ্গে দিয়া তিনশত অশ্বারোহী ও পাঁচ শত পদাতিক সৈনিকের পাহারায় জায়গীরের ও খাসনবিসীর উদ্বৃত্ত আয়ের ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হস্তী, টাঙ্গন (অশ্ব) গুলু নামক ক্ষুদ্রকায় পার্ব্বত্য অশ্ব, মহিষ, মৃগ, বাজপক্ষী, সম্রাটের ব্যবহারার্থ ঢাকার মিহি কাপড়, গণ্ডারচর্ম্মের ঢাল, শ্রীহট্টের স্বর্ণ ও গজদন্তে বয়নকরা মাদুর, আসামী কাপড়, বনপাশী নামক তরবার প্রভৃতিও পাঠাইয়াছিলেন। *

এই সময়েও যে বাঙ্গালার সাহিত্যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের দান দেখা যায় তাহার কারণ প্রাচীর প্রকৃতিগত ধৈর্য্য ও মুসলমান-শাসনের বৈশিষ্ট্য। এই প্রকৃতিগত ধৈর্য্য সম্বন্ধে ম্যাথু আর্ণল্ড তাঁহার একটি কবিতায় লিখিয়াছেন—

"The East bowed low before the blast
In patient deep disdain ;
She let the legions thunder past,
And plunged in thought again."

ধৈর্য্য সহ উপেক্ষায় বৈর আক্রমণ
নীরবে সহিল প্রাচী। সৈন্য অগণন
হুঙ্কারি' চলিয়া গেল, প্রাচী তার পরে
নিমগ্ন হইল পুনঃ চিন্তার সাগরে।

আর মুসলমান-শাসনের বৈশিষ্ট্য—তাহা সমাজকে রূপান্তরিত করিতে পারে নাই। হিন্দু সমাজ আপনার আচার ব্যবহার শিক্ষা ও সংস্কৃতি অব্যাহত রাখিয়া, কেবল রাজকর দিয়া শান্তির বা অশান্তির মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। গ্রামে বেণুবনের মধ্য দিয়া মন্দিরের চূড়া লক্ষিত হইত ; প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দেবায়তনে আরত্রিকের বাদ্য শ্রুত হইত; সন্ধ্যায় গৃহস্থের গৃহে গৃহে তুলসীমঞ্চে দীপ জ্বালিয়া গৃহিণী

---

* "Narrative of the transactions in Bengal."

প্রণাম করিতেন—শঙ্খধনি শুনা যাইত; বারমাসে তের পার্ব্বণ ব্যতীত অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ এই সকল গ্রামে নূতন সজীবতার সঞ্চার করিত। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে বা আটচালায় গুরুমহাশয় গ্রামের বালকগণকে যে শিক্ষা দিতেন তাহা উচ্চ শিক্ষা নহে —কিন্তু জাতীয় শিক্ষা, কারণ তাহাও প্রত্যেকে ছাত্রকে তাহার কৌলিক কার্য্যের উপযোগী করিত; কৃষক হলচালনা করিয়া শস্য উৎপাদন করিত; রাখাল মাঠে গোচারণ করিত; লোকশিক্ষার যে অবৈতনিক ও সাধারণ ব্যবস্থা ছিল, তাহা সার্ব্বজনীন—সে সকলের মধ্যে কথকতা অন্যতম। লোকশিক্ষার অন্যতম উপায় কথকতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদীপিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্-নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাট্‌না কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে—ধর্ম্ম নিত্য, যে—ধর্ম্ম দৈব, যে—আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে—পরের জন্য জীবন, যে—ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে—পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে—জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে—অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে—লোকহিত পরম কার্য্য।" তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে।" এই রুচি যতদিন সংশোধিত না হইবে, ততদিন আমাদিগের দেশপ্রেম ও জাতীয়তার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না।"

মোগলদিগের প্রাধান্য দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। ঔরঙ্গজেবের সময় একদিকে বিলাস, অন্যদিকে পরধর্ম্মবিদ্বেষ প্রবল হইয়া সে প্রাধান্য-বিনাশের কারণ হয়। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন এবং অভিযানকালে সব নদী সন্তরণে পার হইতেন। একবার দুইদিনে ১ শত ৬০ মাইল পথ অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করিবার কালে তিনি দুই স্থানে গঙ্গা ঐরূপে পার হইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে বিলাসী ওমরাহগণ সূক্ষ্ম মসলিনের বেশ পরিধান করিয়া পাল্কীতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন। আর ঔরঙ্গজেব পরধর্ম্মবিদ্বেষহেতু

যে সব অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই সকলে হিন্দুস্থানে হিন্দুরা তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। মোগল শাসনের পতনকালের অবস্থা নবীনচন্দ্রের কথায়—

"মোগল গৌরব-রবি আরঙ্গ্‌জিব সনে
অস্তমিত ; নহে দূর দিল্লীর পতন।"

বাঙ্গালা তখন নানারূপে উপদ্রুত—বিপন্ন। ক্রমে শাসকের অযোগ্যতা ও অত্যাচারের সহিত যখন অনাবৃষ্টিজনিত অন্নকষ্ট যোগদান করিত, তখন যাহা ঘটিত, তাহার বর্ণনা 'আনন্দমঠে' এইরূপ দেখা যায়—"কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা ? কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়—কাঁটা খায়—উইমাটি খায়—বনের লতা খায় ? কোন্ দেশে মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই—" ইত্যাদি।

যখন সেই শোচনীয় অবস্থার উপশম হইল, তখন পর্ব্বতের উপত্যকায় শীতকাল যে বৎসর দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, সে বৎসর যেমন তুষার বিগলিত হইলেই কুসুমের পর কুসুম বিকশিত হয়, তেমনই বাঙ্গালায় প্রতিভা-বিকাশ লক্ষিত হইল।

দেশে অশান্তির উপদ্রব প্রশমিত হইতে না হইতে—নূতন শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে না হইতে অপরিচিত সভ্যতার সহিত পরিচয় হইতে না হইতে—"যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়," বাঙ্গালায় সেইরূপ অভ্যুদয় হয়। এই যে Renaissance—জাতির সমধিক উদ্দীপ্তি এ "রোশনাই"য়ে যাহাদিগের মশালের আলোক দীপ্ততম, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি বাঙ্গালার অন্যতম যুগাবতার।

সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার বিষয় ছিল এবং তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যেমন আপনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তেমনই—কেবল বাঙ্গালীকে নহে—সভ্য মানবমাত্রকেই ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রতিভা কোন বিশেষ জাতির, এমন কথা বলা যায় না ; তিনি জগতের ; তাঁহার কৃত কার্য্যের ফলসম্ভোগে জগতের সকলেরই সমান অধিকার। তিনি যে সাহিত্যসৃষ্টি করেন, তাহার সকল অংশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অন্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও অন্য সংস্কারে অভ্যস্ত সাধারণ লোকের নিকট আদৃত নাও হইতে পারে কিন্তু অনেক অংশই সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। ইহা বুঝিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কপাল-কুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইংরাজীতে অনুবাদের অনুমতি নিঃসঙ্কোচে

দিয়াছিলেন, কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'র ইংরেজী অনুবাদ স্বয়ং করিয়াও প্রকাশ করিতে দেন নাই। 'দেবী চৌধুরাণী'র ইংরেজী অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত বিলাতে মুদ্রিত করিবার সব ব্যবস্থা করার পর বঙ্কিমচন্দ্র তাহার জন্য যে ব্যয় হইয়াছিল তাহা পাঠাইয়া উহার প্রচার নিষেধ করেন; কারণ, "ব্রজেশ্বরের তিন বিবাহ—ইংরেজ উহার কারণ বুঝিতে পারিবে না।"

জগতে সভ্যতা-বিস্তারের ফলে একের কৃত কর্ম অন্যের অজ্ঞাত থাকে না। ইহা সভ্যতার ফল—মানুষের পরম লাভ। সেই জন্যই আজ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ একাধিক য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; এই সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির এক প্রান্তে, বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে সকল সুদূর সাগরপারে ভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত, ভিন্ন দীক্ষায় দীক্ষিত ভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত বহু নর-নারীর চিত্তবিনোদনের ও শিক্ষালাভের উপায় হইতেছে—জগতে বাঙ্গালীকে বরেণ্য করিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ভগীরথের মত সাধনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাবগঙ্গা আনিয়াছিলেন। আমাদিগের দুর্ভাগ্য তাঁহার একাগ্র সাধনার ইতিহাস আমাদিগের অপরিজ্ঞাত। তাঁহার দৌহিত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত রচনা করিবেন, তাঁহার সেই নির্দ্দেশ পালিত হয় নাই। তিনি আপনার জীবনের কার্য্য, চাকরী ও সাহিত্যসেবা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া উভয় ভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের বিবরণ স্বয়ং ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তাই তাঁহার একাগ্র সাধনার বিবরণ সাধারণের সম্পত্তি হইতে পায় নাই। তিনি কিরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কি উপায়ে কোন্ প্রলোভন পদাঘাতে দূর করিয়াছিলেন—কি কৌশলে বিষম বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছিলেন—তাহা জানিতে স্বতঃই আমাদিগের কৌতূহলোদ্রেক হয়। কিন্তু সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। এদিকে যে সকল বন্ধুবান্ধব বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনের বিচিত্র বিবরণ কতকাংশে অবগত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সহকর্ম্মী, সুহৃদ বা শিষ্য ছিলেন, তাঁহারাও একে একে অন্তর্হিত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত নাই—ইহা বাঙ্গালীর আক্ষেপের বিষয়।

এই আক্ষেপে আমরা কেবল ইহা মনে করিয়াই সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিতে পারি যে, সাধনায় সাধকেরই অধিকার, তাহা সর্ব্বজনবোধ্যও নহে, সকলের নিকট

তাহার মর্য্যাদাও থাকে না। মানুষ অনেক সময় অতি সামান্য ঘটনায় সাধনার পথের সন্ধান লাভ করে। কে বলিতে পারে, কাহার কোন্ কথায় বা কার্য্যে সিদ্ধার্থ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে বৌদ্ধ মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? কোন প্রসিদ্ধ চিত্রকর আপনার চিত্রকীর্ত্তির পরিবেষ্টনে বাস করিয়া আনন্দ-সম্ভোগের আশায় চিত্র অঙ্কিত করেন না। কোন ভাস্কর আপনার রচিত মূর্ত্তির দর্শনানন্দের জন্য মূর্ত্তি রচনা করেন না। তাঁহাদিগের মনে তাঁহাদিগের ভাবের ভাবুক বহুজনের অবস্থিতি অনুভব করিয়া তাঁহারা কাজ করেন। তেমনই কোন সাহিত্যিক আপনার রচনাপাঠে আপনি আনন্দলাভের জন্য সাহিত্য-সাধনা করেন না। তাহা অপরের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র কি ভাবিয়া—কি কারণে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা না জানিলেও আমরা তাঁহার সাধনার সিদ্ধিফল লাভ করিয়াছি। তিনি যে বহু বিচার বিবেচনার পর এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং অপরকেও সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি ইতিহাস প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনায় তিনি বাঙ্গালা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, দত্ত পরিবারের বিখ্যাত লেখকদিগের ইংরেজী রচনা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে, কিন্তু মধুসূদনের বাঙ্গালা রচনা বাঙ্গালা সাহিত্য যতদিন থাকিবে ততদিন কখন বিলীন হইবে না। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসের সমালোচনায় তিনি বলিয়াছিলেন—তিনি ঐ একখানি পুস্তক লিখিয়াই যশস্বী হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং, তাঁহার সমসাময়িক ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মত ইংরেজীতে পুস্তকরচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর মতপরিবর্ত্তন করেন—বাঙ্গালাকেই তাঁহার রচনার বাহন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুতে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা গুণগ্রাহিতায় অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—'স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশে?"

বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার বিবরণ সাধারণের জানিবার উপায় না হইলেও তাঁহার

পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে, সে সাধনা সহজসাধ্য বা সাধারণ নহে। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে দৈন্য ছিল তাহা গদ্য রচনায় সপ্রকাশ। রামমোহন রায় তাঁহার গদ্য রচনায় তাহা বিচার-বিতর্কে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহা সরল করিয়া আনিয়াছিলেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয় তাহা পরিশোধিত সলিলের মত স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তখনও তাহা পরিশোধিত সলিলেরই মত স্বাদহীন ছিল। তখনও সে ভাষা সহজে সর্ব্ববিধ ভাবের প্রকাশোপযোগী হইয়া উঠে নাই। আজ যে সেই ভাষা আনন্দে উচ্ছ্বসিত বেদনায় বিকম্পিত; লজ্জায় সঙ্কুচিত, ঘৃণায় বিকুঞ্চিত, ক্রোধে উত্তেজিত, অনুরাগে উচ্ছ্বসিত, আবেগে আন্দোলিত, দ্বিধায় বিচলিত হয়—আজ যে সেই ভাষা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বিকাশে, দর্শনের বিচারে, বিজ্ঞানের সত্য-প্রচারে, ধর্ম্মের তত্ত্বপ্রকাশে সমর্থ—তাহা যে সর্ব্বভাব প্রকাশক্ষম, তাহা যে বহুজনের চেষ্টার ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই বহুজনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগণ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার মহত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামাদি পশুভাবব্যঞ্জক কার্য্য সমাজ হইতে তিরোহিত হয়। ইহাই মনীষীদিগের বিশ্বাস এবং যে অবস্থায় তাহা হয়, তাহাই সভ্য মানবসমাজের কাম্য। সেই অবস্থা যে এখনও বহুদূরবর্ত্তী—তাহা যে এখনও স্বপ্নমাত্র তাহা আমরা তথাকথিত সভ্য মানবের কার্য্যে—বিশেষ বিজ্ঞানকে মৃত্যুর যানে যুক্ত করায়—বুঝিতে পারি, সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও সভ্য মানবের কল্পনা যে সেই দিনের দিকে ধাবিত হয় তাহা কবি টেনিসনের রচনায় সপ্রকাশ—

> "Till the war-drum throbb'd no longer,
> and the battle-flags were furl'd
> In the Parliament of man, the Federation
> of the world.
> There the common sense of most
> Shall hold a fretful realm in awe,
> And the kindly earth shall slumber,
> lapt in universal law."

সাহিত্য শান্তির ফল ও শান্তির সহায়। তাই সভ্যতার উন্নতস্তরে তাহা বিকশিত ও অভিব্যক্ত হয়। সেই জন্যই ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্তর হুগো বলিয়াছেন—জগতের ভবিষ্যতে তরবারি নাই—লেখনী বিদ্যমান।

সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত ও তৃপ্ত হয়েন নাই, পরন্তু শিক্ষাদানও করিয়া গিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন নূতন নূতন রচনার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তেমনই—নিপুণ কৃষক যেমন ক্ষেতে সমধিক শস্য উৎপাদনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তৃণগুল্ম উৎপাটিত করিয়া ফেলে, তেমনই—নির্ম্মমভাবে সমালোচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আবর্জ্জনার উদ্ভব ও পুষ্টি অসম্ভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে' উৎকৃষ্ট পুস্তকের প্রশংসায় কার্পণ্য দেখা যায় না। ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু' সমালোচনায় লিখিত হইয়াছিল—"বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গালার প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।" রাজনারায়ণ বসুর "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতায়" তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সব ভারতসন্তান" উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা শেষ করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র ভৃঙ্গার শূন্য করিয়া তাহার উপর প্রশংসার গঙ্গোদক বর্ষিত হইয়াছিল—"রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক; হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-নর্ম্মদা-গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।" আবার 'বঙ্গদর্শনে' একখানি নাটকের সমালোচনায় লিখিত হইয়াছিল—"উড়িষ্যা হইতে সর্ব্বপ্রথমে এই নাটক প্রকাশিত হইতেছে, বিশেষতঃ রচয়িতার এই প্রথমোদ্যম বলিয়া আমরা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিলাম না। প্রথম হউক, শেষ হউক, নিকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া আদর পাইবার অধিকার কাহারও নাই।" 'বঙ্গদর্শনে' আর একখানি নাটকের ('তারাবাই') সমালোচনায় দেখিতে পাই—"বীররস-প্রধানা নায়িকা তারাবাই বলিতেছেন—নায়ককে বলিতেছেন—"গুলঞ্চর পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যেন আমি তার মতন অনন্ত বাহুশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, নারীজীবনের সার পতিরূপ সারাল নিমতরুকে চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করি।' এমন পিত্তনাশক উপমা কস্মিন্‌কালে দেখি নাই।'' 'বঙ্গদর্শনে' কোন কোন পুস্তকের

বিস্তৃত সমালোচনা হইত—তাহা লেখককে তাঁহার ক্রটি বুঝাইবার ও গুণের অনুশীলনে উৎসাহদানের জন্য।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সাহায্যে বাঙ্গালীকে কেবল বিশুদ্ধ আনন্দলাভের উপায় প্রদান করেন নাই, পরন্তু চিত্তবৃত্তির পূর্ণ-বিকাশের পথ—সমুন্নত মনুষ্যত্বের আদর্শও দেখাইয়া দিয়াছেন। সাহিত্যের সাহায্যে তিনি বাঙ্গালীকে অনুশীলনতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। তাঁহার অনুশীলনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য—তাহা আধ্যাত্মিকতার সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। এই স্থানেই তাঁহার সহিত য়ুরোপীয়দিগের অনুশীলনতত্ত্বের প্রভেদ। য়ুরোপের অনুশীলনতত্ত্ব আধ্যাত্মিকতা হইতে মনীষাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে বলিয়াই তাহা অনেক ক্ষেত্রে কল্যাণকর হইতে পারে নাই। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুদ্ধে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রথম জার্ম্মান যুদ্ধের সময় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, জার্ম্মানী যদি জয়ী হয়, তবে বৃটেনের ও সেই সঙ্গে সভ্যজগতের বিষম অনিষ্ট সাধিত হইবে।—"We shall be vassals not to the best Germany, not to the Germany of sweet songs and inspiring noble thought—not to the Germany of science consecrated to the service of man, not to the Germany of a virile philosophy that helped to break the shackles of superstition in Europe—not to that Germany but to a Germany that talked through the rancorous voice of Krupp's artillery, a Germany that has harnessed science to the chariot of destruction and of death, the Germany of a philosophy of force, violence and brutality, a Germany that would quench every spark of freedom either in its own land or any other in rivers of blood."

প্রতীচীর অনুশীলনতত্ত্বের দৌর্ব্বল্যের কারণ, তাহা আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন—তাহা মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণার বশবর্ত্তী, তাহা ইহকাল-সর্ব্বস্বতার অনুগামী। সাহিত্যের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র জড়ত্বাবিষ্ট জাতির নিকট প্রমাণ করিয়াছেন—জড়ত্ব অভিশাপ—কর্ম্মেই মানুষের মহত্ত্ব। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝাইয়াছেন, কর্ম্মের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

যিনি প্রকৃত প্রতিভার অধিকারী তিনি যে কার্য্যেই আপনার শক্তি আন্তরিক ভাবে প্রযুক্ত করুন না কেন—সঙ্গে সঙ্গে আরও নানা কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া

পারেন না। কারণ তাঁহাকে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র বাধাবিঘ্নমুক্ত—কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হয়। সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা দিকে নানা কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃত সকল কার্য্যের সমালোচনা বা তাঁহার জীবনের সকল শিক্ষার আলোচনা এই রচনার উদ্দিষ্ট নহে। বর্ত্তমান রচনায় আমরা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিবার চেষ্টাই করিব। আমরা তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার প্রকৃতি-নির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়া তাহার গতি-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। তাঁহার কৃত কার্য্যের প্রধান শিক্ষা কি তাহাই বুঝিতে ও বুঝাইতে প্রয়াস করিব। তাঁহার রচনার সাহায্যেই আমরা তাহা করিব এবং তাহাই আমরা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন) চব্বিশ পরগণা জিলার এলাকায় নৈহাটীর উপকণ্ঠে কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই গ্রাম গঙ্গা হইতে অদূরবর্ত্তী এবং সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রের নিকটে অবস্থিত। সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ভট্টপল্লী দীর্ঘকাল হিন্দুর গৌরবদীপ প্রজ্বলিত রাখিয়াছে এবং সেই দীপশিখার আলোকে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করিয়াছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে যে সকল মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং যাঁহারা তথায় কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকের নাম—"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে।" অল্পদূরে গঙ্গার কূলে রামপ্রসাদ সেনের সাধনস্থান। গঙ্গার পরপারে হুগলী—মুসলমান শাসনের শেষ সময়ে য়ুরোপীয় বণিকদিগের অবস্থিতির জন্য উল্লেখযোগ্য। হুগলীর নিকটেই ব্যাণ্ডেল নামক স্থানের গির্জ্জা এদেশে খৃষ্টানদিগের অতি পুরাতন ধর্ম্মমন্দির। এই হুগলীতে যে কলেজ আছে, তাহা পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল—পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার, হুগলীর ও কৃষ্ণনগরের কলেজগুলি অন্যান্য কলেজের অগ্রণী। আর অদূরে এদেশে ইংরেজ শাসনের সূতিকাগার ও সর্ব্বপ্রধান স্থান কলিকাতা। নৈহাটীর নিকটেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শেষজীবন গঙ্গাতীরে যাপন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেকালে সুশিক্ষিত ছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বগ্রামে তাঁহার সম্মান ছিল। এই পরিবারের গৃহদেবতার মন্দির এখনও বিদ্যমান। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর হিন্দুগৃহে সর্ব্বাগ্রে কুলদেবতার সেবার ব্যবস্থা হইত। চট্টোপাধ্যায় পরিবারেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও এই কুলদেবতাকে কুলের কল্যাণকেন্দ্র বলিয়া মনে করিতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগের কুলদেবতা রাধাবল্লভের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"ইনি আমাদের বংশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন, আমাদের সকল কথা শুনেন, সব আবদার রক্ষা করেন, রোগে, শোকে, বিপদে আমরা

উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি। উঁনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।"

যে সময় চট্টোপাধ্যায় পরিবার কাঁটালপাড়া গ্রামে বাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখনও বাঙ্গালা পল্লীপ্রাণ। বাস্তবিক এ দেশ এখনও তাহাই—বাঙ্গালার নগর-গুলি বিস্তারপ্রাপ্ত পল্লীগ্রাম; আর বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে বা ধর্ম্মাধিকরণের স্থান অর্থাৎ জিলার বা মহকুমার 'সদর' বলিয়া গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর যে স্থানে শাসকের বাস ছিল, তথায় সহরের উদ্ভব হইত। বর্ত্তমানে নানা কারণে লোক পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগরে বাস করিতেছে, ফলে পল্লীগ্রাম ভ্রষ্টশ্রী হইতেছে। পূর্ব্বে তাহা ছিল না। যাদবচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালার লোক পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিতে আরম্ভ করে নাই। পল্লীগ্রামের সমাজে গ্রামবাসীদিগের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল—সে স্থান ত্যাগ করিলে তাহারা নূতন স্থানে আর কোন নির্দ্দিষ্ট সামাজিক স্থান পাইত না। ইহা পূর্ব্বে অন্যান্য দেশেও দেখা যাইত—কৃষক যে স্থানের সমাজভুক্ত সে স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক রাজস্ব দিলেও অন্য স্থানে যাইত না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যে বৃটেনের কৃষক এইরূপ গ্রামত্যাগ-বিমুখ ছিল, তাহা ঔপন্যাসিক জর্জ্জ ইলিয়টের পুস্তক পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার উড়িয্যার কৃষকের এই গ্রামত্যাগ-বিমুখতার কারণ-প্রসঙ্গে স্থানীয় বন্ধনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"Such ties attain their maximum strength in India. They have struck their roots deep in the religion, the superstitions and the necessities of the people. The whole social system of the Hindus is one continuous chain, from which, if a link drops out, it finds nothing to attach itself to, and no recognised place to fill."

এদেশে গ্রাম্যসমাজ নামক যে ব্যবস্থা ধনিকের স্বার্থের সহিত ধনসাম্যবাদের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছিল সেই সমাজ-ব্যবস্থাও যে বাঙ্গালীর স্বগ্রামানুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাঁটাল-পাড়ার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন নাই।

যাদবচন্দ্রের চারি পুত্রই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয়। যাদবচন্দ্রের রসিকতার পরিচায়ক একটি প্রচলিত গল্পের উল্লেখ করিব। চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাঁটালপাড়ায় অবস্থানকালে

তিনি একদিন কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। নৈহাটী ষ্টেশনে তিনি যখন ট্রেনে উঠিবেন সেই সময় তিনি যে কামরায় প্রবেশোদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে কয়জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্য একজন যুবক যাত্রী ছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরা তাঁহাদিগের চাকরীর, বদলীর, উপরওয়ালার কথার এত অধিক আলোচনা করিতেছিলেন যে যুবক যাত্রীটি তাহাতে বিরক্ত হইয়াছিল। সে যাদবচন্দ্রকে বলে, "মহাশয়, এ কামরায় উঠিবেন না—ইহা ডেপুটী বাবুদিগের কামরা।" যাদবচন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন, "বটে! এখন বল, ডেপুটী বাবুদিগের বাবাদিগের কামরা কোন্‌টি।" তখন তাঁহার চারিপুত্রই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। যাদবচন্দ্র পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ছাপাখানার ও 'বঙ্গদর্শনে'র হিসাবাদিও পরীক্ষা করিতেন।

যাদবচন্দ্রের চারিপুত্রই সাহিত্যরসিক ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত সঞ্জীবচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যে স্থায়ী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান যেমন সূক্ষ্ম ও পরিমার্জ্জিত ছিল, তাঁহার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা তেমনিই প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার 'জাল প্রতাপচাঁদ' এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ; তাহাতে ইতিহাস কোথায় উপন্যাসে পরিণতি পাইয়াছে এবং উপন্যাস কিরূপে ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা স্থির কথা দুষ্কর। তিনি অধিক লিখেন নাই; কিন্তু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার কয়টী রচনাসংগ্রহ পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা যে তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত দানে ধন্য হইতে পারি নাই তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত রচনাসংগ্রহে চন্দ্রনাথবাবুর সমালোচনা অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

"তাঁহার প্রতিভায় ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভাল গৃহিণীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে; যতটুকু আছে, তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়; সেস্থলে অনেক জিনিষ ফেলাছড়া যায় অথচ অল্প জিনিষই কাজে আসে। তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই; তাহার কারণ, সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নহে।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র—দুই ভ্রাতার সাহিত্যিক প্রতিভায় প্রভেদ সুস্পষ্ট ; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ধনী ও সুগৃহিনী, সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা ধনী কিন্তু সুগৃহিনী নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সেই গৃহিনীপনার জন্যই সর্ব্ববিধ অপচয়ের বিরোধী ছিল এবং সকল বিষয় সুবিন্যস্ত ও ব্যবহারযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। সে প্রতিভা যেমন যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহাকেই সুস্পষ্ট করিয়াছে, যেমন দুর্ব্বোধ্যকে সুবোধ্য ও জটিলকে সরল করিয়াছে, তেমনই তাহা যে অপচয় করে নাই সেই জন্যই তাহা কখন অভাব অনুভব করে নাই।

বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠকালেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ছয় বৎসর তখন তিনি মেদিনীপুরে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন ; তাহার পর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে আসেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পরবৎসর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উপাধিধারীদ্বয়ের তিনি অন্যতর।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বাঙ্গালা সরকার তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। এই কার্য্যেও বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় তিনি জলদস্যুবহুল খুলনা মহকুমায় (বর্ত্তমানে খুলনা আর যশোহর জিলার একটি মহকুমা নহে—স্বতন্ত্র জিলায় পরিণত হইয়াছে) অকুতোভয়ে দস্যু শাসন করিয়া লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ করেন। কার্য্যব্যপদেশে বাঙ্গালার নানাস্থানে কালাতিবাহিত করিয়া কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালা সরকারের সহকারী 'সেক্রেটারী'ও হইয়াছিলেন। তিনি যে সময় ঐ পদ লাভ করেন, তখন ঐ পদে সিভিল সার্ভিসে ইংরেজ চাকরীয়াদিগেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেইজন্য একজন বাঙ্গালীর ঐ পদ প্রাপ্তি বিশেষ যোগ্যতার পরিচায়ক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চাকরীতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকার তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' ও 'সি. আই. ই' উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান যে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবকদিগের প্রীতিপ্রদ হয় নাই, তাহা ১২৯৯ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য' পত্রে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "উপাধি-উৎপাত" প্রবন্ধে বুঝা গিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"সেদিনকার উপাধি-সত্র মনে পড়ে। বেলভেডিয়ারের (এই গৃহই তখন বাঙ্গালার ছোট লাটের বাসজন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল) সভাগৃহে দরবার বসিয়াছে। চোপদারেরা আসাসোটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মহারাজা বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, নবাব বাহাদুর, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর খিলাতের আশায় বসিয়া আছেন। বঙ্গাধিপ বক্তৃতা করিলেন, উপাধিধারীদিগের সুখ্যাতি করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। লোকের দৃষ্টি সেই সমবেত মণ্ডলীর মধ্যে একজনের উপর পড়িল। তিনি আর কেহ নহেন—রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। অত রাজা মহারাজা নবাব থাকিতে, একজন রায় বাহাদুরের প্রতি যে সকলের নজর পড়িল, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। রাজ-প্রসাদে কেহ ধন্য হয় না। নিজগুণে মানুষ ধন্য হয়, একথা আমরাও উপাধিলোভী জাতি জানি। যদি কখন আমাদের জাতীয় গৌরব হয়, যদি কখন আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অপর জাতিকে দেখাইবার উপযুক্ত রত্ন সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃ-ভূমিকে লোকে স্বর্ণগর্ভা বলিবে। ততদিনে রাজা মহারাজা নবাবের দল যে কোথায় বিস্মৃতি-সাগরে তলাইয়া ডুবিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে? এই কথা বুঝিতে পারিয়া সকলে বলিয়াছেন যে, রায় বাহাদুর উপাধি দিয়া বঙ্কিমবাবুর প্রতি অবমাননা প্রকাশ করা হইল।"

নগেন্দ্রনাথবাবু সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। বিতণ্ডাপ্রিয়, গর্ব্বিত পাদরি হেষ্টী ছদ্মনামধারী বঙ্কিমবাবুর (ইংরেজী) রচনা ও তর্ককৌশলে বিস্মিত হইয়া, তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। তখন বঙ্কিমবাবু সদর্পে বলিয়াছিলেন যে, তিনি সে সম্মান প্রার্থী নহেন, স্বজাতির সুখ্যাতিই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সম্মান।"

মনের দুঃখে নগেন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছিলেন,—

"মনে হয়, যেন বাদ সাধিয়া রাজপুরুষেরা বঙ্কিমবাবুকে এই উপাধি দিয়াছেন। যেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই লোকটাকে পাকড়াও করিলে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না, উপাধি-সম্মান লইয়া কেহ বিদ্রূপ করিতে পারিবে না। 'লোক-রহস্য' যাঁহার তীব্র ব্যঙ্গময়ী লেখনীপ্রসূত, যিনি 'ইংরাজ স্তোত্রের' রচয়িতা, বিধি-বিড়ম্বনায় তিনিই কি না আজ রায় বাহাদুর। যাঁহার তেজস্বিনী, রসময়ী প্রতিভায় বঙ্গদেশ অদ্যাবধি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে,

যিনি দুর্গোৎসব হইলে অভাগিনী বঙ্গভূমির কলঙ্ক মোচনের দিন গণনা করেন, সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জননী জন্মভূমির বন্দনা করিয়া যিনি বাঙ্গালীর চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি এ অত্যাচার কেন? * * * যাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে কিছু লুক্কায়িত থাকে না, বাগ-দেবীর কৃপায় যাঁহার লেখনী অমৃতনিঃস্যন্দিনী, যিনি মিথ্যা সম্মান উপাধি অন্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করেন, যাঁহার প্রণীত 'রায় মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' সে ঘৃণার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, ইংরাজের কৌশলে তিনি স্বয়ং ধরা পড়িলেন।"

নগেন্দ্রনাথবাবুর এই আক্ষেপ তখন অনেক সাহিত্যিকের মনে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে 'সাহিত্য'-সম্পাদক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে উপাধিপ্রার্থী হন নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকার তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তির জন্য তাঁহাকে উপাধি দিলে তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যিক-দিগের বিক্ষুব্ধ হইবার কারণ থাকিতে পারিত; কিন্তু সরকার তাঁহাদিগের এক জন কর্ম্মচারীকে তাঁহার বিদায়কালে উপাধি দিয়াছিলেন। 'সাহিত্য' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—

"বঙ্কিমবাবু যে উপাধিবিভ্রাটে পড়িয়াছেন, তাহার জন্য আমরা দোষী। এ দেশে যদি সাহিত্যের আদর থাকিত, যদি স্বদেশীয় প্রতিভার প্রতি আমাদের ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে বঙ্কিমবাবুকে ডেপুটিগিরিতে জীবন কাটাইতে দেখিতাম না। যাঁহার লেখনীতে 'বিষবৃক্ষের' সৃষ্টি, সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিয়া তাঁহার কলম ভোঁতা হইত না, যে প্রতিভায় কপালকুণ্ডলা ভ্রমর প্রভৃতির জন্ম, সেই প্রতিভা রায়-রচনায় অপব্যয়িত হইত না। * * * আমাদের সঙ্গে বঙ্কিম-বাবুর * সম্বন্ধ—তিনি রাজা, আমরা প্রজা।"

১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ) বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। বিবাহের অল্প দিন পরে প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না—তিন কন্যা ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে দৃঢ়তার ও চক্ষুতে প্রতিভাদীপ্তির বিকাশ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। রবীন্দ্রনাথ যেদিন বহু যশস্বী লোকের সমাগম-পুষ্ট এক সম্মেলনে তাঁহাকে প্রথম প্রত্যক্ষ করেন, সে দিনের স্মৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুক প্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ" ছিলেন এবং তাঁহাকে "দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে

সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল।" "আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন।" তাঁহাকে দেখিবামাত্র যুবক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য কৌতূহলী হ'ন। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্ব্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। * * * প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের যে মুখের সহিত আজ লোক অধিক পরিচিত, তাহা গুম্ফশূন্য। ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'বালক' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং একবৎসর পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার প্রকাশিত রচনার সংখ্যা ৬৯ ছিল। উহাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "মুখচেনা" নাম দিয়া কয়টি মনোজ্ঞ সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটিতে তাঁহার অঙ্কিত রাজনারায়ণ বসুর ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতির প্রতিলিপি দিয়া তিনি মানুষের মুখ দেখিয়া প্রকৃতি-নির্দ্ধারণ-কৌশল বর্ণনা করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"বঙ্কিমবাবুর উপরিভাগের কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ-শক্তি, সমালোচন-শক্তি ও হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইঁহার নীচের দিককার কপাল বেশ উঁচু—ইহাতে ছোটখাট জিনিষ খুব ইঁহার নজরে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে ইঁহার বেশি ঝোঁক প্রকাশ পায়। তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলেও ইনি বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিবেন। বিশ্লেষণ-শক্তি, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অধিক পরিমাণে থাকায় তাঁহার উপন্যাসে মানব চরিত্রের ও বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।** বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে সুরুচি, অভিনিবেশ, মানবচরিত্রজ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এতখানি কাজ সত্ত্বেও উপর্য্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন, সে কেবল তাঁর নাকের জোরে।** বঙ্কিমবাবুর ঠোঁট খুব সরু—ইহাতে কার্য্যকরী বুদ্ধি—সূক্ষ্ম রুচি ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর চোখে বহির্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায়।** বঙ্কিমবাবুর চেহারায় নেপোলিয়নের মুখের কিছু আভাস পাওয়া যায়। নেতার লক্ষণ ইঁহার মুখে জাজ্জ্বল্যমান। ইঁহার খড়্গ:নাসা, চাপা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ চোখ লইয়া

ইনি যদি কাহারও উপর গিয়া পড়েন তবে সে হতভাগ্য বজ্রাঘাতের মর্ম্ম বুঝিতে পারে।”

আমরা দূর হইতে ও নিকট হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবার সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়াছিলাম। আমাদিগের এক পরম আত্মীয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল—উভয়েই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, উভয়েই কোমতের মতের আলোচনা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বন্ধুর গৃহে আসিলে ভৃত্য আমাদিগকে সংবাদ দিত—“‘দুর্গেশনন্দিনী’ এসেছেন।” আমরা দূর হইতে দেখিতাম, বঙ্কিমচন্দ্র নবাব আবদুল লতিফ প্রভৃতি তাঁহাদিগের বন্ধুর সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন—কথায় কথায় হাস্যে কক্ষ পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু সেই প্রফুল্ল হাস্যের মধ্যেও তাঁহার চক্ষুর দীপ্তি লক্ষ্য করিতাম। তাহার পরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে “সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেণিং”—(বর্ত্তমান “ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট”) প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সাহিত্য বিভাগের সভাপতি হইলেন। আমরা রবিবারে তাঁহার গৃহে যাইতাম—তিনি আমাদিগকে সাহিত্য ও অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তখন তাঁহার অধ্যয়নের বিপুলতায় যেমন বিস্মিত হইতাম, তেমনই তাঁহার সেই দীপ্ত দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইতাম। এই প্রতিষ্ঠানেই তিনি বেদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠান্তে তিনি যখন গোলদীঘির পার্শ্ব দিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কতগুলি প্রবন্ধে তাঁহার বক্তব্য শেষ হইবে? তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বক্তব্য অল্পে নিঃশেষ হয় না—তবে তিনি কতগুলি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহা শ্রোতাগণের ধৈর্য্যের উপর নির্ভর করিবে। তখন জানিতাম না, তিনি আর আমাদিগকে উপদেশ দিবেন না—অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইতে হইবে।

আমরা হেমচন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম। তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন, যে প্রতিভা একদিকে ‘বৃত্রসংহার’ আর একদিকে ‘ভারত সঙ্গীত’ রচনা করিয়াছিল, তাহা তখন তৈলহীন দীপের শিখার মত ক্ষুণ্ণদীপ্তি। দেখিয়া মনে হইয়াছিল, ম্যাক্সমূলার যখন হায়েনের শেষ জীবনে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, সে সময়ের কথায় তিনি লিখিয়াছিলেন—I have seen him, that is all I can say, as Saul saw Samuel, and wished he had not seen him. However we travel far to see the ruins of Pompeii and Herculaneum, of Nineveh and Memphis, and the ruins of a mind such as Heine's

are certainly as sad and as grand as the crumbling pillars and ruined temples shrouded under the lava of Visuvius."

বঙ্কিমচন্দ্র যখন মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন, তখন বয়স যেমন তাঁহার মুখে গাম্ভীর্য্যের লেপে তাহা সমধিক শ্রদ্ধাকর্ষণকারী করিয়াছিল, তেমনই তাঁহার প্রতিভাকেও নূতন কার্য্যের অভিমুখগামী করিয়াছিল। তিনি তখনও স্বদেশের পূর্ব্ব-গৌরবের আলোকে দেশবাসীকে কর্ত্তব্যজ্ঞানের সন্ধান দিতেছিলেন। জীবনে যেমন সাহিত্যে তেমনই তিনি অনাচারের ও অত্যাচারের বিরোধী ছিলেন—তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতেন। তাই প্রথমে সাম্যবাদ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁহার রচনা আগ্নেয়গিরির গৈরিকস্রাবের মত হইয়াছিল। তিনি জমিদারের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রজার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি যখন কার্য্যোপলক্ষে বহরমপুরে ছিলেন, তখন একটা ইংরেজ সৈনিকের উদ্ধত ব্যবহারের জন্য তিনি তাহাকে সমুচিত শিক্ষাদানচেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর কাপুরুষ অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন; বুঝাইয়াছিলেন, অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষের শৌর্য্যবীর্য্যের অবনতি ঘটে এবং অনুশীলনের দ্বারা সে অবনতি হইতে উদ্ধারলাভ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর সম্বন্ধে দুই জন ইংরেজের মত আমরা উদ্ধৃত করিতে পারি। প্রথম—পাদরী হিবর। তিনি তাঁহার পত্নীর বর্ণিত একটি ঘটনার—অশ্বপালদিগের ভীতির—উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমি নানা লোকের নিকট শুনিয়াছি, বাঙ্গালীদিগকে ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং সেইজন্য ও তাহাদিগের খর্ব্বতাহেতু তাহাদিগকে ইংরেজের সেনাদলে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু যে ক্ষুদ্র সেনাদল লইয়া ক্লাইব বিস্ময়কর কাজ করিয়াছিলেন, সে দলে অধিকাংশ সৈনিকই বাঙ্গালা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ও শিক্ষায় মানুষের এমনই হয় বটে। (So much are all men the creatures of circumstances and training)". দ্বিতীয় হাণ্টার। তিনি তাঁহার উড়িষ্যার বিবরণে বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রাবিমুখতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"কিন্তু তাহারা পূর্ব্বে এবিষয়ে যেরূপ ছিল, উন্নত সভ্যতায় আবার সেইরূপ হইতে পারে। এক সময় লাসাগ্রাস ও পম্পীল্ল যে রণবিমুখ আর্ম্মেনীয়দিগকে জয় করিতেও লজ্জানুভব করিয়াছিলেন, তাহা পারস্তের প্রবল শক্তিশালী সাম্রাজ্য

ধ্বংস করিয়াছিল। যাঁহারা জাতির পরিবর্ত্তনের সহিত পরিচিত, তাঁহারা স্বীকার করিবেন—কোন জাতির সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া কেবল ধৈর্য্যহীনতার পরিচায়ক। সমুদ্রযাত্রায়, সাহস ও অন্যান্য জাতীয়গুণে বাঙ্গালীদিগের যে নূতন অভ্যুদয় হইবে—এ বিশ্বাস আমার আছে (In maritime courage as in other national virtues, I firmly believe that the inhabitants of Bengal have a new career before them.")

সুবিধা ও শিক্ষা পাইলে যে বাঙ্গালী বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই; ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে জার্ম্মান যুদ্ধ হয় তাহাতেও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল—চন্দননগর হইতে যে বাঙ্গালী যুবকরা ফরাসী সেনাদলে যোগ দিয়াছিল, তাহারা গোলন্দাজরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র লাঠির কথা বলিয়াছেন।—

"হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিতহস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে; যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালীর আব্রু পর্দ্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল! তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। * * * হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে!"

তখন লাঠি নহিলে মাটী (অর্থাৎ সম্পত্তি) রক্ষা করা দুষ্কর ছিল। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, তখন কোন কোন স্থলে স্ত্রীলোকরাও লাঠি ব্যবহার করিতে জানিত—তবে সে সমাজের যে স্তরে দৈহিক বলেরই চর্চ্চা ছিল, সেই স্তরে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'আর্য্যাবর্ত্তে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাহার দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জিলার কালনা মহকুমায় মহম্মদ আমিনপুর পরগণায় উটরো বা আবাদী দুর্গাপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। তথায় বৈকুণ্ঠ সর্দ্দার গ্রামের একজন খোদকস্ত প্রজা ও চৌকীদার ছিল। "তখন চৌকীদারী একটা

'সত্যিকার' কার্য্য ছিল।" বৈকুণ্ঠের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার পুত্রের মৃত্যু হয়—সংসারে ছিল—তাহার বিধবা দ্রবময়ী আর তাহার শিশু পৌত্র। ! স্বামীর মৃত্যুতে দ্রবময়ী বিব্রত হইল—ভরণপোষণের উপায় কি? দ্রবময়ী যে স্বামীর অসুস্থতায় সময় সময় গ্রামের চৌকীদারী করিত, তাহা গ্রামের লোক জানিত। তাহারাই তাহাকে স্বামীর কাজের জন্য আবেদন করিতে বলিল। সে একজন প্রতিবেশীর সহিত কালনায় যাইয়া আবেদন-পত্র দিলে, কর্ত্তৃপক্ষীয়রা যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সে লাঠি খেলা জানে তখন তাহাকে পৌত্রসহ বর্দ্ধমানে পুলিশের 'বড় সাহেবের' কাছে যাইতে বলিলেন। তথায় কাচারীর মাঠে পরীক্ষা হইল।—"দ্রবময়ী এতক্ষণ একটি গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল; আস্তে আস্তে দর্শক-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করিল, কোলের নাতিটিকে প্রতিবেশীর সঙ্গে বসাইয়া দিল, কোমরের ফাড়ে কাপড় বাঁধিয়া 'সাহেবদের' সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল * * * তাহার পর মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সাহেবকে অতি বিনীত স্বরে বলিল—"হুজুর! একলা ত লাঠি খেলা হয় না! কে আমার সঙ্গে খেলিবে আসুক।" এক-জন কনষ্টেবল খেলিতে আসিল—সর্দ্দারনীর লাঠি তাহার পাগড়ী স্পর্শ করিল। তাহার পর দুই দিক হইতে দুই জনে আক্রমণ করিতে আসিল; দ্রব দুই গাছা লাঠি দুই হাতে লইয়া, তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। সে তাহার স্বামীর চাকরী পাইয়াছিল। অক্ষয়বাবু লিখিয়াছিলেন—সেই কথা "আমি আজ লিখিবার সময়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি।"

শিক্ষা ও সংযম ব্যতীত যে বাহুবল ফলোপযোগী হয় না, তাই বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসের প্রতিপাদ্য ছিল।

তাঁহার মৃত্যুর অতি অল্পদিন পূর্ব্বে 'রাজসিংহ' ও তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে "কৃষ্ণচরিত্র" সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দুই খানিই অপূর্ব্ব রচনা। রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন—"ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।" আমরা পূর্ব্বে তাহারই আলোচনা করিয়াছি। 'রাজসিংহ' কিরূপ ইতিহাস অধ্যয়নের ফল, তাহা বুঝিলেই স্বীকার করিতে হইবে—যখন মৃত্যু তাঁহাকে লইয়া যায়, তখনও তাঁহার প্রতিভা প্রোজ্জ্বল। আর 'কৃষ্ণচরিত্র' হিন্দু পুরাণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমৃতোদ্ধার। পুরাণ সাহিত্য সত্য সত্যই সাগরের মত—তাহা আয়ত্ত করিয়া প্রক্ষিপ্ত বিচার করিয়া যে প্রতিভাবান এই মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক নত

হয়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১৩০৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'প্রদীপ' পত্রে "বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের অল্পদিন পরে তিনি যখন তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেন—তিনি বলিয়াছিলেন অবসর লইয়া খুব লিখিব"—তখন তিনি মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"এখন গঙ্গার চড়ায় হরিনাম লিখিতে পারিলেই আমার হয়।" কিন্তু ঐ উক্তি তাঁহার প্রতিভার ম্লানত্বের পরিচায়কও নহে, তাঁহার লিখিতে অনিচ্ছার পরিচায়কও নহে, তিনি যে কেবল পুরাতনের মেরামত ও চূণকাম করিতেছিলেন, তাহাও নহে। তাহার পরিচয়ও শ্রীশচন্দ্রবাবুর ঐ প্রবন্ধেই আছে। তিনি উপসংহারে লিখিয়াছিলেন:—

"আমি বিদায় হইবার পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'আবার কিছু লিখব ভাবছি —কি লিখি বলত?' আমি একটু হাসিয়া উপন্যাস লিখিতে বলিলাম। বঙ্কিম-বাবু বুঝিলেন যে তাঁর ধর্ম্মালোচনার চেয়ে কাব্যালোচনার আমি তখনও পক্ষপাতী; হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'আমিও তাই স্থির করেছি, এবার একটা বৈদিক কালের স্ত্রীচরিত্র আঁকিব, ঐ দেখ খাতা বেঁধেছি।' জানি না সে খাতায় তাঁহার অমর লেখনী স্পর্শ হইয়াছিল কি না।"

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি যখন তরুণ তখন হিন্দুর পৌত্তলিকতার তত্ত্বোদঘাটনে পাদ্রী হেষ্টীর উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহা যেমন তাঁহার দীর্ঘদিনের আলোচনার ও প্রতিভার পরিচায়ক, তাঁহার বেদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধও যে তাহাই হইত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই এবং তিনি যে দুইটি মাত্র প্রবন্ধ লিখিবার পর লোকান্তরিত হইয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধদ্বয়েও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যে উপন্যাসে তিনি বৈদিক স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা ঐ বেদাধ্যয়নের ফল হইতে, তাহা আমাদিগের অতিরিক্ত লাভ বা উপরি পাওনা হইত।

তিনি যে জীবনের সায়াহ্নে আবার ইংরেজীতে রচনা করিতেছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ও সার্থকতা ছিল। যেমন "বাঙ্গালাভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', তেমনই বেদের আলোচনার এক সীমায় প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ, আর এক সীমায় এ দেশের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ। প্রাচীনপন্থী হিন্দুপণ্ডিতগণ বেদকে অপৌরুষেয় মনে করেন এবং তাহার অধ্যয়ন ব্যতীত বিশ্লেষণ অন্যায় মনে করেন। আর প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ হিন্দু সভ্যতার সম্বন্ধে যে মত লইয়া বেদ অধ্যয়ন

করেন, তাহাতে তাহা অসভ্য জাতির মানসিক ভাবের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই মনে করেন না। ম্যাক্সমূলর বৈদিক হিন্দুদিগকে "অসভ্য" বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাঁহার তাহা বলিবার কারণ, বেদে এমন সকল প্রথাদির উল্লেখ আছে যে, সে সকল সভ্য সমাজে বর্জ্জিত। অবশ্য সভ্যতার যে আদর্শ প্রতীচ্য জাতিসকল অভ্রান্ত ও সমুন্নত মনে করেন, তাহাই যে সমুন্নত তাহা না-ও হইতে পারে এবং খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপ যে সকল যুদ্ধে রক্তস্নাত হইয়াছে, সেই সকলে সেই আদর্শের মহত্ত্ব সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের উদ্ভব অনিবার্য্য। বেদ যে অসভ্য জাতির মানসিক ভাবের অভিব্যক্তি নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া হিন্দুর গৌরব প্রতীচীর পণ্ডিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই যে স্থলে তাঁহার উদ্দিষ্ট সে স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব একান্তই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বেদের মত দুর্ব্বোধ্য সাহিত্য সম্যক আহৃত করিয়া তাহার আলোচনা কিরূপ প্রতিভার পক্ষে সম্ভব—কিরূপ প্রমাণসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। যখন মৃত্যুর ছায়া তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল, তখন তিনি যে সেই অসাধারণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যায়, তখনও তাঁহার প্রতিভা অপরিম্লান এবং তাঁহার শ্রমশক্তি অক্ষুণ্ণ। এমন কথাও বলা অসঙ্গত হয় না যে, তখন তাঁহার প্রতিভা অনুশীলন ফলে যেরূপ তীক্ষ্ণ হইয়াছিল তাহাতে তাহা সেই দুষ্কর কার্য্যের উপযুক্ত হইয়াছিল এবং তিনি শ্রমকাতরতা অনুভব করেন নাই। ম্যাক্সমূলার কার্য্যে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে বাধ্য হইয়া কার্য্যত্যাগ কিরূপ কষ্টকর, তাহা লিখিয়াছেন—"To a man accustomed to work enforced rest is quite as irritating and depressing as *travaux forces.*" তাই বিশ্রাম লাভের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া তিনি তাঁহার *Auld Lang Syne* দুই খণ্ড রচনা করিয়াছিলেন। রাজনীতি চর্চ্চার "অপরাধে" কারারুদ্ধ হইয়া লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ভাগবদ্গীতার ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বেদের আলোচনা ফল লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতীচীর পণ্ডিতগণের ভ্রান্তির অপনোদনী চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তিনি "জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে, নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া" অস্তমিত হইয়াছিলেন।

তিনি যদি "গঙ্গার চড়ায় হরিনাম" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে সে ভারতে আর্য্য-সভ্যতার ভাবমন্দাকিনীর চড়ায় হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার পরিচয়। উপন্যাসে তাহার আরম্ভ, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রবন্ধসমূহে ও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় তাহার পরিপুষ্টি, 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' তাহার পরিণতি। বেদের আলোচনায় তিনি সেই পরিণতিরই এই প্রসার-বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুর দর্শন ও পুরাণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি বেদের অধ্যয়নে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাই এই সকল প্রবন্ধে উপহার দিতেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৩০১ বঙ্গাব্দে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন—"চাকরী আমার জীবনের অভিশাপ, আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণস্বরূপা।" বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক জীবন আমাদিগের আলোচনা-সীমার বহির্ভূত। সুতরাং আমরা তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে শ্রীশবাবুর উদ্ধৃত এই উক্তির কোন আলোচনা করিব না। তবে তিনি 'আনন্দমঠের' প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়, অনেক সময় নয়।" তিনি যে প্রথমে লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর সহায়" এবং পরে লিখিয়াছেন, "অনেক সময় নয়"—তাহাতেই তাঁহার মতের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও বাঙ্গালার সমাজে পূর্ব্ব-ব্যবস্থা ছিল। এখন তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; পরিবর্ত্তন এত দ্রুত হইয়াছে ও হইতেছে যে, তাহার সহিত সমাজ-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না। সেইজন্য, বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরার একবিংশতিতম পরিচ্ছেদে যেমন "সে কালে যেমন ছিল" তাহার কথায় বলিয়াছেন,—"যাহার লোপ পাইয়াছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায়, এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম", তেমনই আমরা সে কালের বাঙ্গালায় হিন্দু মহিলাদিগের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মমতের প্রচারে ও সমাজ-সংস্কারে কেশবচন্দ্র সেনের সহকর্ম্মী ও সহায় ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বে আমেরিকায় এ দেশের ধর্ম্মমত

প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, এবং তথায় যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে "বাঙ্গালীর স্ত্রীস্বাধীনতা" সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন—"গার্হস্থ্য জীবনই পূর্ব্বে হিন্দু মহিলাদিগের জীবনের আদর্শ ছিল—তাঁহারা তাহারই অনুশীলন করিতেন। (The ancient model for the woman's life was her absolute domesticity)। পত্নী বা বিধবা, বালিকা বা পিতামহী তিনি সমস্ত জীবন পরিবারের কার্য্যেই সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিতেন এবং তাহার বাহিরে কোন দায়িত্ব স্বীকার করিতেন না। প্রতাপচন্দ্র বলিয়াছিলেন, ইহার ফলে, সে কালের হিন্দু মহিলারা সুগৃহিণী ছিলেন এবং গার্হস্থ্য জীবনে তাঁহাদিগের প্রভাব পুরুষদিগের প্রভাবের তুলনায় অধিক ছিল ; তাঁহারা রন্ধনে পটু, আর্থিক ব্যাপারে চতুরা, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্যে নিপুণা, তর্কে ক্ষমতাশালিনী হইতেন এবং গৃহে ও পল্লীতে তাঁহাদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইত। হিন্দু মহিলাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাদিগের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল। পুরুষদিগের কার্য্যে কখন কখন হয়ত ত্রুটি লক্ষিত হইত, কিন্তু হিন্দু গৃহের ধর্ম্মনিষ্ঠা, নিয়মানুগত্য ও নৈতিক আদর্শের অনুগমন সম্বন্ধে কোন সন্দেহজনক বিধিনিয়মের ব্যতিক্রম ব্যতীত কিছুই ছিল না। মহিলারাই যে গৃহের শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতেন, তাহাই তাহার কারণ। "আমি বহুদিন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আচার-ব্যবহার বর্জ্জন করিয়াছি ; কিন্তু হিন্দু পরিবারের সরলতার, নিয়ম-নিষ্ঠার, আরামের ও সদয় ভাবের স্মৃতি কখনও আমার মন হইতে অপনীত হইবে না ; আর আমি যখনই সেই সরল অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ করি, তখনই হিন্দু মহিলাদিগের প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমার মনে পড়ে (Whenever I recall those experiences the genial faces of the Hindu ladies present themselves in the mind's eye). হিন্দু মহিলারা মনে করিতেন, গৃহই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র এবং সেই জন্যই সে কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ত্তব্য তাঁহারা যে নিষ্ঠা সহকারে সুসম্পন্ন করিতেন, তাহাতে সংসার ধর্ম্মের পবিত্র পরিবেষ্টনবেষ্টিত, নিষ্ঠায় মধুর, সেবায় স্নিগ্ধ, ত্যাগপূত হইত। তাঁহারা কল্যাণরূপিণীই ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি চাকরীকে তাঁহার জীবনের অভিশাপ বলিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণ দ্বিবিধ হইতে পারে। প্রথম—তাঁহার মত স্বাধীনচেতার পক্ষে চাকরীর নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ কখনই প্রীতিপদ হইতে পারে না। দ্বিতীয়—তিনি মনে করিয়াছিলেন, চাকরী গ্রহণ না করিলে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আরও অধিক কার্য্য

করিতে পারিতেন। সাহিত্যসেবা তাঁহার এতই আকাঙ্ক্ষিত ছিল যে, তিনি তাহাতেই সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবার বাসনা মনে পোষণ করিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, চাকরীতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি সুবিধা হইয়াছিল, এমন কি চাকরী মুখ্যভাবে না হইলেও গৌণভাবে, তাঁহাকে সাহিত্য-সেবায় সাহায্য করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্য-সেবা আরম্ভ করেন, তখনও বাঙ্গালীর সাহিত্য-সেবা আর্থিক হিসাবে লাভজনক হয় নাই। কাজেই চাকরীর আয় না থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে হয়ত সাহিত্য-সেবার পথ বিঘ্ন-প্রস্তর-কণ্টকিত হইত। বৃটেনেও সাহিত্য-সেবা বহুদিন ধনীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হইত। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে জনশন যখন তাঁহার অভিধানের পরিকল্পনা করেন, তখন লর্ড চেষ্টারফিল্ড সাহিত্যিকদিগের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। চেষ্টার-ফিল্ডের নিকট সেই পরিকল্পনার বিষয় জানাইলে তিনি উৎসাহপ্রদ পত্র লিখিলেন। জনশন কাজ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যতদিন অভিধান প্রণয়নের কাজ চলিতে লাগিল, ততদিন চেষ্টারফিল্ড আর কোন সংবাদই লইলেন না। পুস্তক শেষ হইয়া আসিতেছে জানিয়া যাহাতে তাহা তাঁহাকে উৎসর্গ করা হয় সেইরূপ ইচ্ছায় উহা ও উহার সঙ্কলনের প্রশংসা করিয়া দুইটি প্রবন্ধ লিখিলেন। জনশন কিন্তু তাঁহাকে যে পত্র লিখিলেন, তাহা স্বাধীনচিত্ততার বিকাশ, গাম্ভীর্য্যে সংযত কিন্তু তীব্র ভাবপ্রকাশে ইংরেজী সাহিত্যে অতুলনীয় রচনার মধ্যে গণ্য। কার্লাইল বলিয়াছেন, সেই পত্রে চেষ্টারফিল্ডকে ও সমগ্র জগৎকে জানাইয়া দেওয়া হইল, ইংরেজী সাহিত্য আর পৃষ্ঠপোষকের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী থাকিবে না—(It was the farfamed blast of doom, proclaiming into the ear of Lord Chesterfield and, through him, to the listening world, that patronage should be no more.) মধুসূদনের মৃত্যুতে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

> "হায় মা ভারতী চিরদিন তোর
> কেন এ কুখ্যাতি ভবে ?
> যে জন সেবিবে ও পদ যুগল
> সেই যে দরিদ্র হবে !"

বঙ্কিমচন্দ্রকে যে কখন সাহিত্যসেবার জন্ম কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়

নাই, তাঁহার চাকরীই তাহার কারণ বলা যায়। তিনি আপনার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা যেসব রচনায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিয়াছি, 'বঙ্গদর্শনের লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ রচনার জন্য পারিশ্রমিক লইতেন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পারিশ্রমিকের জন্য ক্যানিং লাইব্রেরীর অধিকারী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্র দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রে যে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরী গ্রহণে কোন অনিষ্ট সংঘটন হয় নাই; চাকরীর আয় থাকায় তাঁহাকে অর্থের জন্য ইংরেজীতে যাহাকে pot boiler বলে, সেরূপ তুচ্ছ উপন্যাসাদি লিখিতে হয় নাই এবং উদ্দাম প্রতিভার উচ্ছৃঙ্খল রচনা উদ্গীরণ সংযত হইয়াছিল। গেটে বলিয়াছেন, সকল সাহিত্য-সেবীর একটি নিয়মিত কাজ থাকা ভাল। বাঙ্গালায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে হেমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি অন্য অর্থকর ব্যবসায়ের অবসর কালে সাহিত্যসেবা করিয়া আপনারা ধন্য হইয়াছিলেন, আর বাঙ্গালা ভাষাকে সৌন্দর্য্য সম্পদসম্পন্ন করিয়া বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র সাহিত্য-সেবার আগ্রহে অবলম্বিত ব্যবহারাজীবের ব্যবসা উপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং অর্থাভাবে পিষ্ঠ হইয়াছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুতে নবীনচন্দ্র বঙ্গভূমিকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"অযত্নে, মা, অনাদরে বঙ্গকবিকুলেশ্বরে
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা দিয়াছ বিদায়!"

হেমচন্দ্রের কথায় তাঁহার সুহৃদ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলিয়াছিলেন:—

" 'বৃত্রসংহার' সুরু হইলে তাঁহার ওকালতীতে শৈথিল্য পড়িয়া গেল। আমি জানি, তাঁহাকে তিনশত টাকা ফি দিয়া আলিপুরে লইয়া যাইবার জন্য মক্কেল আসিয়া তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইতে পারিল না! হেমবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া রহিতেন। দেবী সরস্বতীর মন্দিরে অনেকে অর্ঘ্য আনিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন সত্য, কিন্তু এমন একাগ্র উপাসনা আর দেখিয়াছ কি? তাঁহার মাসিক আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।"

আবার কার্য্যব্যপদেশে তাঁহার নানা স্থানে গমনহেতু বাঙ্গালার নানা স্থানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ তাঁহার রচনায় আমরা দেখিতে পাই। তিনি কার্য্যব্যপদেশে নানা প্রকৃতির লোককে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার রচনায় গড়মান্দারণের পরিচয় পাইয়াছে; কাঁথির বালিয়াড়ি যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তাহার বর্ণনা পাইয়াছেন; তাঁহার উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রের বর্ণনা অতুলনীয়। কাঁথিতে তিনি কার্য্যব্যপদেশে যে "বাঙ্গালায়" বাস করিয়াছিলেন, তাহাই 'কপালকুণ্ডলার' কল্পনা সম্ভব করিয়াছিল। তাঁহার রচনায় সাগরকল্লোলমুখরিত বেলাভূমি হইতে শস্যশ্যামল প্রান্তর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের নানা প্রাকৃতিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই স্থানে আরও একটি কথা বলিবার আছে—যিনি যত কাজ করেন, তাঁহার কাজ করিবার অবসর তত অধিক হয়। শক্তিচর্চ্চায় শক্তি বর্দ্ধিত হয়—অভ্যাসে অভ্যাস সহজ হইয়া আইসে। কার্য্য করা যাঁহার অভ্যস্ত হয়, তিনিই সহজে কাজ করিতে পারেন। তাঁহার চাকরীর সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তক রচিত হইয়াছিল। আর সেই সময়েই তিনি 'বঙ্গদর্শন' নামক মাসিক পত্রের প্রচার করিয়া বহু নবীন লেখককে উৎসাহিত করেন এবং বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্যে নবীন শক্তির সঞ্চার করেন। 'বঙ্গদর্শন' সেকালের বাঙ্গালীর—জলপথ বহুল বাঙ্গালার—বৃহৎ তরণীর মত বাঙ্গালার ঘাটে ঘাটে জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের মূল্যবান পণ্য আনিয়া দিত, আর বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন করিত। তিনি যখন চাকরীতে বহরমপুরে সেই সময় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ আরম্ভ হয়। তখন বহরমপুরে সাহিত্যের যে পরিবেষ্টন ছিল, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। ইংরেজীতে সুপণ্ডিত লাল-বিহারী দে তখন তথায়; রামদাস সেনের বাস বহরমপুরে; গঙ্গাচরণ সরকার ও তাঁহার পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার তখন বহরমপুরে—গঙ্গাচরণবাবু বিচারক, অক্ষয়চন্দ্র উকীল হইয়াছেন; গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তথায় আইনের অধ্যাপক। তাঁহারা যে সাহিত্যালোচনায় বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা গুরুদাসবাবু বলিয়াছেন। গুরুদাসবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য শোকসভায় বলিয়াছিলেন, তিনি তখন সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার পক্ষপাতী। একদিন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেন, তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) যে ভাষা ব্যবহার করেন, সরল করিবার চেষ্টায় তাহা যেন অবিশুদ্ধ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কিছুই বলেন নাই; ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বাজারের মধ্যে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাসবাবুকে বলিলেন, "এই বিপণীশ্রেণী

আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া কি মনোরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে!” সহসা বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করায় গুরুদাসবাবু বিস্মিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেই তিনি হাসিয়া বলেন, “এখন বুঝিলেন—কোন ভাষা অধিক আদৃত হয়?”

‘বঙ্গদর্শনে’ বঙ্কিমচন্দ্রের কয়খানি উপন্যাস ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; আবার ‘বঙ্গদর্শনে’ যেমন রহস্যরচনা প্রকাশ করিয়া তিনি রহস্যের ও পরিহাসের নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করেন, তেমনই ইতিহাস চর্চ্চার নূতন পথ মুক্ত করেন। তিনি দ্বিতীয় খণ্ড ‘বিবিধ প্রবন্ধের’ “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছিলেন—

“১২৭৯ সালে আমি ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বৎসর আমি উহার সম্পাদকতা নির্বাহ করি। * * * ঐ চারিবৎসরের ‘বঙ্গদর্শন’ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে, যেমন সামান্যই হউক, একটু স্থান লাভ করিয়াছে।” ‘বঙ্গদর্শন’ বাঙ্গালা সাহিত্যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা যে সামান্য নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন ও করিবেন। তিনি ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের উদ্দেশ্য এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন—“অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ‘বঙ্গদর্শনে’ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ‘বঙ্গদর্শনের’ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।’

সেইজন্য ‘বঙ্গদর্শনের’ দ্বারা কেবল সাহিত্য সৃষ্টিই হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক সৃষ্টিও হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন কেবল সেনাপতির নৈপুণ্যে যুদ্ধ জয় হয় না—সেজন্য শিক্ষিত সেনাবল প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি শিক্ষিত নবীন লেখকদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন; এমনকি, প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনায় তৎকালে বহু কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইংরেজী রচনায় স্থায়ী যশ অর্জ্জনের দুরাশা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা রচনায় মনোনিবেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদিগের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। তিনি রমেশচন্দ্র দত্তকে যে উপদেপ দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদভাণ্ডারে প্রাচীন কবিগণের মনোজ্ঞ রচনা ব্যতীত অধিক মূল্যবান সংগ্রহ ছিল না। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ইংরেজী চর্চায় মনোযোগ দিতেন। ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সুদূরপরাহত হইয়া উঠিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যদিও অল্প বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আদর্শের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন; তথাপি সেই সময় হইতেই, ইংরেজীতে রচনায় মন দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস ইংরেজীতে রচিত হইয়া ইংরেজীতে পরিচালিত একখানি সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী রচনায় এরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে, পরিণত বয়সেও, কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালায় রচনা অপেক্ষা ইংরেজীতে রচনা সহজসাধ্য মনে হয়। সে যাহাই হউক, তিনি অল্পদিনেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় গ্রন্থরচনায় লেখকের যশঃ ত পরের কথা, সাহিত্য-রচনার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য তিনি তাঁহার প্রতিভা মাতৃভাষার সেবায় প্রযুক্ত করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তিনি বাঙ্গালার রাজনীতিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের বহু পূর্ব্বগামী। কারণ, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের পূর্ব্বে প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মিলনেও বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইত না। ঐ বৎসর মনোমোহন ঘোষের উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেই প্রথম তিনি ব্যবস্থা করেন, প্রত্যেক প্রস্তাবে একজন বক্তা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবেন। সেই ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, প্রস্তাবের বিষয় বাঙ্গালায় ব্যক্ত না করিলে সাধারণ লোক বুঝিতে পারিবে না এবং জনগণ আমাদিগের অনুগামী—ইহা উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত বিদেশী শাসকগণ আমাদিগের দাবী স্বীকার করিয়া তাহা পূর্ণ করিবেন না।

বাঙ্গালার রাজনীতিক আন্দোলনে—অর্থাৎ জনগণের জন্য উদ্দিষ্ট আন্দোলনেও বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইবার অন্ততঃ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করা প্রয়োজন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোশিয়েশন নামক প্রতিষ্ঠানে "বাঙ্গালার গণসাহিত্য" বিষয়ে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"আমরা ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বিস্ময়কর বিস্মৃতিতে অভিভূত। আমরা ভুলিয়া যাই, কেবল বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেই আমরা বাঙ্গালীজাতিকে কোন ভাবে বিচলিত বা উত্তেজিত করিতে পারি। আমরা ইংরেজী ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করি, ইংরেজীতে বক্তৃতা করি, ইংরেজীতে মনের ভাব ব্যক্ত করি। যখন আমরা তাহা করি, তখন আমাদের মনে থাকে না, দেশের জনসাধারণ

ইংরেজী বুঝে না—আমাদিগের ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দসমূহের মধ্যে একটিরও অর্থবোধ করিতে পারে না। অথচ সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে কোন নূতন ভাব প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ না করিলে হয় না, তাহা না করিলে কোন ফল হয় না। আমার বিশ্বাস, কোন উচ্চভাবের কথা বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীকে বুঝাইতে পারিলে সে ভাব তাহার হৃদয় স্পর্শ করে; তাহাতে তাহার মনে নূতন তরঙ্গের উদ্ভব হয়, তাহা প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেশব্যাপী বিরাট ভাব-তরঙ্গ তুলে। সেই নূতন ভাবে জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে, জাতির হৃদয়ে সঞ্জীবতাসঞ্চার হইবে, সমাজের কল্যাণ স্বতঃই সাধিত হইবে। কিন্তু ইংরেজীতেই ধর্ম্মমত প্রচার করিলে ও ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে, সমগ্র জাতির কোন বিরাট ভাবের সূচনা হইতে পারে না। সেই কারণে সমাজের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতির অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই সাহিত্যই জাতির সাহিত্য—জনগণের সাহিত্য হইবে।"

'বঙ্গদর্শনের' "পত্রসূচনায়" এই মত আরও দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত হইয়াছিল :—

"ইংরেজী লেখক, ইংরেজী-বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

"একথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা আমি বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরেজীতে হয়, তাহা কয়জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজী বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিনকালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

এ দেশে ইংরেজী সংবাদপত্রের আরম্ভের কথায় হাণ্টার বলিয়াছেন—কে তখন বুঝিতে পারিত, সেদিন বাজন্দার বালকরা দুর্গপ্রাকারের পারে মৃৎপ্রাচীরের উপর যে বাদ্য শিক্ষা করিতেছিল তাহাই একদিন তূর্য্যনাদে পরিণতি লাভ করিয়া সুপ্ত সেনাবলকে রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাইবে? (Who could have foreseen that those cat-callings of bugle-boys, practising their wind-pipes in some out-of-the-way angle of the ramparts, were destined to grow into clear trumpet notes, which should arouse sleeping camps to great constitutional struggles, and sound the charge of political parties in battle ?)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' প্রথম খণ্ড লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, তাঁহার তূর্য্যনাদ সুপ্ত সেনাবলকে সুপ্তোত্থিত করে নাই—তাহারা প্রস্তুত হইয়া কেবল সেই সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে যেন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখমারুতে পূর্ণ পাঞ্চজন্যের নিনাদ।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:—

"পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল অন্ধকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই সব বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! 'বঙ্গদর্শন' যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির'।—এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিম-বাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্ব্বের কথায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:—

তখন "বাঙ্গালাকে কেহই শ্রদ্ধা সহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজী পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর

ছিল। সেইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। * * * অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কাল যাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইত না।"

এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে শ্রীশূন্য কাননে যেন কুসুমরাশি বিকশিত হইল—মেঘের আবরণ অপসারিত হইল, সৌন্দর্য্যের জ্যোৎস্না সাহিত্য প্লাবিত করিয়া দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসেবায় যে সশ্রদ্ধভাব ছিল, তাহার ফলে তিনি যে সাহিত্যসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার জন্য নবীন লেখকদিগকে যেমন উৎসাহিত করিতেন, তেমনই তাহার বিশুদ্ধি রক্ষা ও উন্নতি বিধানে যত্নবান ও সতর্ক থাকিতেন। তিনি যে প্রবাহ নির্ম্মল করিতে প্রয়াসী ছিলেন যাহারা তাহাতে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিত তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। 'বঙ্গদর্শনে'র সমালোচনায় যেমন প্রতিভাবান লেখককে উৎসাহ প্রদান করা হইত, তেমনই অন্যান্য লেখকের রচনার ত্রুটি প্রদর্শিত হইত। তাহাতে সাহিত্যের ও সাহিত্যসেবীদিগের যে বিশেষ উপকার হইত, তাহা বলা বাহুল্য। সেই জন্যই 'বঙ্গদর্শন' নানাপ্রকারে বাঙ্গালা সাহিত্যের কত উপকার করিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বহু লোকের বহুদিন ব্যাপিনী চেষ্টার ফলে আজ বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান লাভ করিয়াছে—সমাদর পাইয়াছে। যে শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদত্ত না হইয়া দুর্ব্বোধ্য বিদেশী ভাষার সহায়তায় প্রদত্ত হয়, তাহার সরসতায় ও সার্থকতায় সম্পূর্ণতা থাকে না। কাজেই তাহার ফল ফলিতেও বিলম্ব ঘটে—অনেক সময় তাহা নিষ্ফল হয়। সেই বন্ধ্যাত্বের পরিচয় আমরা নানা দিকে লক্ষ্য করি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্ত্তির পাদপীঠে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা ভাষা—বাঙ্গালীর মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সে কথা বলিয়াছিলেন।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাজসাহী এসোসিয়েশনে "শিক্ষার হের-ফের" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা-প্রদানের উপযোগিতার আলোচনা করিয়া বলেন,—

"আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্ব্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর 'বঙ্গদর্শন' একটি নূতন প্রভাতের মত আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ যেন এমন একটি অপূর্ব্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোন নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার 'বঙ্গদর্শন' কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। 'বঙ্গদর্শন'কে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল। * * * * এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। * * * * 'বঙ্গদর্শন' সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাঙ্গালা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজী আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্ত্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা কিছু তাহা বাঙ্গালা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে।"

বিষয়টি লইয়া তখন আলোচনা হইয়াছিল এবং প্রবন্ধটি 'সাধনায়' প্রকাশিত হইলে লোকেন্দ্রনাথ পালিত ঐ 'সাধনায়'ই "শিক্ষা-প্রণালী" নামক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রকাশের কয়মাস পরে তিনি 'সাধনায়' ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনজন বাঙ্গালী মনীষীর পত্রাংশ প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদিগের একজন; আর দুইজন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন:—

"বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, 'পৌষমাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে, আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।' কিন্তু তখন তাঁহার 'ক্ষীণস্বর' কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং

সেনেট হৌসের মহতী সভা 'অসংখ্য বালকবলিদানরূপ মহাপুণ্য বলে' কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণস্বর যদি বা কোন কর্ণভেদ করিতে না পারে তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্য উক্ত কর্ণভেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।"

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'প্রদীপে' "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গে" এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমবাবু সিণ্ডিকেটের উপর যথেষ্ট ভক্তিমান ছিলেন না এবং চিঠিতে একটিমাত্র বিশেষণে না রাখিয়া ঢাকিয়া সে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রবিবাবু কথাটিকে কেমন উন্মুক্তভাবে সাধারণের সমক্ষে বাহির করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'ইচ্ছা করিলে এটিও ছাপিতে পারেন, আমার তাতে কোন আপত্তি নাই।' * * * বলিলেন, আনন্দমোহন বাবু তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার বিপক্ষতা করেন, মুসলমান সভ্যেরা এবং মহামহোপাধ্যায়ের দল।"

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে কেবল লাবণ্যের সঞ্চার করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, পরন্তু তাহাতে গাম্ভীর্য্য ও রসের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভার বলে ও শ্রমশীলতার ফলে এক জীবনে বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যে যে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা যে সুশিক্ষিত ও উন্নতির পথরূপ জাতির সর্ব্বকর্ম্মক্ষম ভাষার সকল গুণসম্পন্ন তাহা তাঁহার রচনায় প্রথম প্রতিপন্ন হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহাকে লোকশিক্ষার বাহন করিয়াছিলেন—মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে জাতির সাহিত্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য পুস্তক 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোযোগ, স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিবার যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার সাফল্যের জন্যই যে তিনি প্রথমে উপন্যাস উপহার লইয়া বাঙ্গালী পাঠক সমাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই মনে করা যায়।

বৃটেনে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা দরিদ্র শিশুদিগের জন্য অবৈতনিক শিক্ষাদানের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে জন পাউন্ডসের নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তিনি যখন এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তখন পল্লীর দরিদ্র ছাত্রদিগকে সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় সিদ্ধ গোল আলু লইয়া—তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য—তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতেন। এইরূপে তিনি পথিপ্রদর্শকের দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্তী "টেকচাঁদ ঠাকুর" (প্যারীচাঁদ মিত্র) তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের 'ভূমিকায়' লিখিয়াছিলেন—"অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে, সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল।"

'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল গল্পের পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সকলের অধিকাংশই "বালকভুলান কথা"। সেই সকল রচনায় কোনরূপ বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য ছিল না। যে সকল চরিত্র রচনায় স্বতঃ-বিকশিত হইত, সেই সকল শিক্ষিত লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারিত না; রচনা-নৈপুণ্যে কোন চরিত্র উজ্জ্বল বা প্রস্ফুট করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। প্রতীচীর কথা-সাহিত্য বহুদিনের অনুশীলনে—বহু যত্নে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতীচ্য আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহা দেশোপযোগী করিয়া বাঙ্গালায় উপন্যাস রচনা করিলেন। বিদেশী আদর্শ সর্ব্বতোভাবে স্বদেশের উপযোগী করা যে অসাধারণ

ক্ষমতার পরিচায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। গল্প আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সহজে পাঠ করেন এবং পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করেন। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালী পাঠকের প্রিয় করিবার চেষ্টায় প্রথমে উপন্যাস রচনা করিলেন।

সূর্য্যোদয় যেমন কেহ গোপন করিতে পারে না—তাহার আলোক চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়, তেমনই এই 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশে পাঠক সমাজে অননুভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ—

"শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তাহা হাস্যরসের উপন্যাস। পাইকপাড়ার রাজাদিগের স্বসম্পর্কীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস বিনিঃসৃত হয়, সেই প্রথম উপন্যাসের নাম—'বিজয়বল্লভ', কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগের পরম বিজ্ঞ বান্ধব শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাস বিভাগে অতুল খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন। তিনি সেই অতুল খ্যাতির সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। যেহেতু তাঁহার ন্যায় উপন্যাস-রচয়িতা বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই।"

বৃটেনে যেমন শিল্প-সমালোচক রাসকিনের রচনাফলে চিত্রকর টার্ণারের শিল্পে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের অকুণ্ঠ প্রশংসায় 'আলালের ঘরের দুলালে' বাঙ্গালী পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল—সেইজন্য বহুদিন পরে যখন পুস্তক-প্রকাশক যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদের রচনা-সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন তিনি উহা "লুপ্তরত্নোদ্ধার" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'বিজয়বল্লভ' আজ বাঙ্গালা সাহিত্যে পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী' এখনও পূর্ব্ববৎ জনপ্রিয়।

যে সময়ে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে স্মরণীয়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ—

"খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সমুজ্জ্বল কাল বলা যায় ঃ কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, ইহার মধ্যে কোন্ দশ বৎসর সমুজ্জ্বলতম, তবে

আমরা নিঃসংশয়ে বলিব, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ। এই দশ বৎসরে বাঙ্গালা সাহিত্যে যত মৌলিক, যত গুরুত্বপূর্ণ ও যত স্থায়িত্বসম্পন্ন রচনা রচিত হইয়াছিল, তত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন দশ বৎসরে রচিত হয় নাই। * * * এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পুস্তক 'সীতার বনবাস' প্রকাশ করেন; এই সময়ের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে নাটক রচনা আরম্ভ করেন এবং দীনবন্ধু মিত্র নূতন বাঙ্গালা নাটকে নবযুগ প্রবর্ত্তন করেন; এই সময়ের মধ্যে মধুসূদন তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। মনে হয় যেন এই শতাব্দীতে বাঙ্গালার সাহিত্যসেবা এই দশ বৎসরে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই কয় বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, দীনবন্ধুর, মধুসূদনের ও বঙ্কিমচন্দ্রের উৎকৃষ্ট রচনা রচিত হয়।"

স্থানান্তরে তিনি লিখিয়াছেন, তিন বৎসর পূর্ব্বে 'মেঘনাদবধ' কাব্য প্রকাশে—অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আগমনে—বাঙ্গালার সাহিত্যিক সমাজ যেমন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশে তেমনই হইলেন। পুস্তকের পরিকল্পনায় যেমন সাহসের প্রকাশ তেমনই রচনায় সৌন্দর্য্য ও নৈপুণ্য প্রকাশ। আর পুস্তকে অঙ্কিত চরিত্রগুলি যেমন বিচিত্র তেমনই স্বভাবানুগ। এই সকলে সৃষ্টি করিবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যে কখনও এইরূপ রচনার প্রচেষ্টা হয় নাই, তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় উপন্যাসে কখনও এইরূপ চরিত্র হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' প্রকাশের দুই বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনে নূতন আলোক বিকাশ হইল—নবযুগ আরম্ভ হইল।

'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে বৃটিশ সমালোচকরাও প্রশংসা-কীর্ত্তন যে করেন নাই, তাহা নহে। ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে 'ম্যাক্‌মিল্যান ম্যাগাজিন' পত্রে অধ্যাপক কাউয়েল "একখানি বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস" শিরোনামায় 'দুর্গেশনন্দিনীর' সমালোচনা করেন। তাঁহার মত এইরূপ :—

"ভারতবর্ষ কথা-সাহিত্যের উদ্ভবস্থান। মধ্য যুগে য়ুরোপে যে সকল গল্প প্রচলিত ছিল, সে সকলের অর্দ্ধাংশের মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে শত শত গুপ্তপথে সে সকল প্রতীচীর গোপন সাহিত্য আসিয়া উপনীত হইয়াছিল।"

তাহার পরে তিনি বলেন—য়ুরোপে নূতন সাহিত্য পুরাতন সাহিত্যকে ম্লান করিয়াছে; ভারতে তাহা হয় নাই। কিন্তু ভারতেও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। ছিদ্রান্বেষী সমালোচকরা অনুযোগ করিয়া আসিয়াছেন, কলিকাতায় প্রবর্ত্তিত (বিদেশী) শিক্ষা-পদ্ধতিতে কেবল "চাদর ঢাকা পুস্তক" বাহির হয়—যাহারা সে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তাহারা পরীক্ষায় কেবল প্রভূত পরিমাণ অজীর্ণ দ্রব্য প্রদান করিতে পারে—কিন্তু কোন মৌলিক ভাব দেখাইতে পারে না। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও আর কয়েকখানি পুস্তকে সেই অনুযোগ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়।

বলা বাহুল্য, এই "আর কয়খানি পুস্তকের" মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' সমালোচকের মনে ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইলে বহু বাঙ্গালী পাঠক যেমন অপূর্ব্ব রসের আস্বাদ পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন, আবার অনেকে তাহাতে ত্রুটি লক্ষ্য করিতে ব্যস্ত হইলেন। শেষোক্ত দলের মধ্যে কেবল যে সংস্কৃত পণ্ডিতগণই ছিলেন এমন নহে। রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন:—

"নূতন প্রচেষ্টাকে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। সমালোচক ও নিরাশ লেখক, তরুণ লেখক, তাঁহার রচনা প্রণালী, তাঁহার পরিকল্পনা, তাঁহার গল্প—এ সকলেরই উপরে রোষ বর্ষণ করিতে থাকেন এবং তাঁহাকে জাতীয়তাভ্রষ্ট ও য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণকারী বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু নিন্দার ও গালির অবসান হয় এবং প্রকৃত প্রতিভার সৃষ্টি সাগরের উর্ম্মিমালার মধ্যে শৈলের মত অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকে।"

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের তিন বৎসর পূর্ব্বে 'মেঘনাদবধ' কাব্য প্রকাশিত হইলে মধুসূদন দত্তকেও অল্প ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয় নাই। 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামে মধুসূদনের রচনার হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ প্রকাশিত হয়। তাহার আরম্ভ এইরূপ:—

"দ্রুহিণ-বাহন সাধু, অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে,—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত দুর্জ্জয়—
পললাসী বজ্রনখ আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুছুন্দরী সতীরে হানিল?

কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে
যাদঃ-পতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।”

রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন ঃ—

“তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) বঙ্গ ভাষায় অদ্বিতীয় উপন্যাস-রচয়িতা, তাহার আর সন্দেহ নাই। কোন কোন স্থানে তাঁহার বর্ণনা সুসঙ্গত নহে এবং কোন কোন স্থানে জাতীয় ভাবের অভাব আছে, অর্থাৎ যে বিদেশীয় ব্যক্তিরা আমাদিগের হিন্দু-জাতির রীতিনীতি অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে পারেন না,—তথাপি মানবস্বভাব বিশেষতঃ উচ্চ-প্রকৃতির স্ত্রীলোকের স্বভাব স্বভাবানুযায়ী চিত্রিত করিতে বঙ্কিমবাবুর ন্যায় আমাদিগের মধ্যে কে সমর্থ ?”

রাজনারায়ণবাবুর জাতীয় ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিন্তু তিনিও যে বিদেশীয়দিগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালায় পুস্তক রচনার কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

আর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বাঙ্গালা ভাষাকে গ্রাম্য বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রীত হয়েন নাই, পরন্তু তাঁহার রচনায় নানারূপ ত্রুটিরই অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থে লিখেন ঃ—

“ইহার (দুর্গেশনন্দিনীর) রচনায় যে একটি নূতনবিধ ভঙ্গী আছে, ইহার পূর্ব্বকালীন কোন বাঙ্গালা পুস্তকে সে ভঙ্গীটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সেটি ইংরেজী অনুকরণ হইলেও বিলক্ষণ মধুর। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গ্রন্থকার স্বয়ং বর্ণিত পাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে যে অত অধিক বাক্ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের মিষ্ট লাগে না—বরং তদ্দারা স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়াছে বোধ হয়।”

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এই সমালোচকের বিশেষ আপত্তি ছিল। তিনি লিখেন—‘হুতোম পেঁচা’ বল, ‘মৃণালিনী’ বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে

না পারিবার কারণ নহে; ঐ ভাষারই কেমন এক প্রকার ভঙ্গী আছে, যাহা একজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়।

সমালোচকরা কেহ বা তাঁহার ভাষার জন্য, কেহ বা তাঁহার রচনায় প্রচলিত আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে কথা আছে বলিয়া, আবার কেহ বা তাঁহাকে অনুকরণকারী বলিয়া নিন্দা করেন।

এই স্থানে আমরা অনুকরণের অভিযোগ সম্বন্ধে বলিব—কনওয়ে তাঁহার শিল্প সম্বন্ধীয় পুস্তকে যথার্থই বলিয়াছেন—প্রত্যেক লোক অপরের নিকট হইতে কিছু না কিছু গ্রহণ করে। আর ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস রীড বলিয়াছিলেন,—

"It is true that I milked three hundred cows into my bucket, but the butter I churned was my own."

যাঁহার স্বষ্টি করিবার প্রভূত শক্তি থাকে তাঁহার পক্ষে সমালোচনার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণে বিলম্ব হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, এক সম্প্রদায়ের লোকের নিকট যাহা কিছু নূতন তাহাই অপবিত্র সুতরাং ত্যাজ্য এবং সেই জন্যই জগতে মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রে সকল নূতন মতের প্রবর্ত্তক ও নূতন আদর্শের স্রষ্টাকেই বিরুদ্ধ মত ও আক্রমণ অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে হয়। বিরুদ্ধ সমালোচনা না হইলেও আক্রমণ যে তাঁহাকে স্পর্শ করিত না, তাহা মনে করিবার কারণ নাই; কিন্তু তিনি সে সকলে বিচলিত হইতেন না।

'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম খণ্ডে 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক সমালোচনা প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"গণ্ডার স্থূলচর্ম্মধারী বলিয়া জীব-সৃষ্টিমধ্যে তাহাকে সর্ব্বপ্রধান বলি না। বরং আমরা ইহা বলি, যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গে আঘাত লাগিলে বিশেষ ব্যথিত হয় সে-ই পরের ব্যথার ব্যথা বুঝিতে পারে। তবে আমরা একথাও বলিতেছি যে, বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ আর একটু ঘাতসহিষ্ণু হইলে ভাল হয়। মৃৎকলস ঘা সহিতে পারে না, ধাতু কলস চারিদিকে টোল পড়িলেও আপন কার্য্য করিতে থাকে। সকল স্বর্ণ ঘা সহিতে পারে না বলিয়া ফাটিয়া যায়; খাঁটি সোণা যত পিটিবে, ফাটিবে না, চটিবে না, বাড়িবে বই কমিবে না।"

প্রতিভাবান ব্যক্তিরা বুঝেন, বিরুদ্ধ মত কখন স্থায়ী হইবে না। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র কখনও সাহিত্য বিষয়ে সমালোচকদিগের আক্রমণে আত্ম-সমর্থন প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু তিনি স্বীয় রচনার ত্রুটি সংশোধনে ও রচনার

প্রসাধনে সর্বদাই তৎপর ছিলেন। তাঁহার পুস্তকগুলিতে তিনি কত পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়। রচনা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মত 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে' বিশদরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি সাহিত্য বিষয়ে তিনি কখন বিরুদ্ধ সমালোচকদিগের আক্রমণে আত্ম-সমর্থনের প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি যখন হিন্দুধর্ম্ম—যে হিন্দুধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহার স্বরূপ বিবৃত আরম্ভ করেন, তখন তিনি একবার আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। 'প্রচারের' প্রথম বৎসরে ঐ জন্য তিনি "আদি ব্রাহ্মসমাজ ও 'নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' " নামক স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে তাহা—প্রয়োজন বোধে—বলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "একটি পুরাতন কথা" নামক একটি বক্তৃতা করেন এবং উহা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার লক্ষ্য। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মত এই যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে, মিথ্যা কথা বলিবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন :—

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ব্ব সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনাভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু আলোচ্য ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্য ভাবে কেহ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্ম্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য (বক্তৃতার সময়ে শ্রোতারা এই শব্দটা কিরূপ শুনিয়াছিলেন?) লেখকগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাহার পর—"কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

রবীন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ যে অতি তীব্র তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র

কি জন্য ইহার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথায়, এইরূপ :—

"রবীন্দ্রবাবু যখন ক, খ শিখেন নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতে এইরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখনও উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে (এমন কেহ থাকিলে থাকিতেও পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।

"কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে তাহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত সুলেখক, মহৎস্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্ত্তব্য। তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পশ্চাতে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।"

এই ছায়া আদি ব্রাহ্মসমাজ। " 'নবজীবনের' পনর দিন পরে 'প্রচারের' প্রথম সংখ্যা প্রচলিত হইল। 'প্রচার' আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। 'নবজীবনে' আমি হিন্দুধর্ম্ম—যে হিন্দুধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। 'প্রচারে'ও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম্ম আদি ব্রাহ্মসমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক 'প্রচার' প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারি বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ।"

তথাপি তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার যদি মনে থাকিত যে আমি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি বলিয়া এত কথা বলিলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে রবীন্দ্রনাথের আক্রমণ প্রহত করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি, তাঁহার সহিত বিতর্কে ইংরেজ লেখক চার্লস রীড প্রতিবাদকারীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারিতেন—"Sir,—You have ventured to contradict me on a question with regard to which I am profoundly learned, when you are ignorant as dirt." রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপেক্ষা

অল্পবয়স্ক—এই পুস্তকের লেখকের ‘চৈতালী’ সমালোচনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া সংযম রক্ষা করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন—“জন্মিবামাত্র কাকা হওয়া যায়, কিন্তু জ্যেঠা হওয়া যায় না ; যদিও জ্যেঠামী করিবার ক্ষমতা অনেকের অল্প বয়সে হয়।” কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এইরূপ ভিত্তিহীন কিন্তু অশিষ্ট আক্রমণেও বঙ্কিমচন্দ্র সংযম ত্যাগ করেন নাই ; পরন্তু প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলিয়াছিলেন—“মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্রবাবু, বোধ হয়, তাহা স্বীকার করিবেন। সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্রবাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরষা করি, এই জন্য বলিলাম। তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালীর উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভায় উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।”

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি পাঠ করিলে কবি গোল্ডস্মিথের কথা মনে পড়ে—

সমুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ বিরাজে যেমন—
মধ্যপথে ঝঞ্ঝাবাত করিয়া বর্জন ;
বক্ষোদেশে মেঘমালা যদিও সঞ্চরে—
অম্লান রবির কর শোভে শিরোপরে।

‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’ প্রকাশিত হইলে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রে উহার দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক ঐ উপন্যাসের বিরাট দেহত্বের জন্য উহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ; কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় বৃহদাকার পুস্তক প্রকাশিত হয় না—ইহার কারণ কি ? ঐ সমালোচনা প্রবন্ধে তিনি বলেন, বাঙ্গালার গুণসম্পন্ন উপন্যাসের সংখ্যা দুই বা তিনের অধিক নহে—যথা টেকচাঁদ ঠাকুরের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের ‘দুর্গেশনন্দিনী’ ও ‘কপালকুণ্ডলা’। টেকচাঁদ ঠাকুর যে মানসিক শক্তি-সম্পন্ন গ্রন্থকার, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু যাহারা তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করেন তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে—তাঁহার ভাবপ্রকাশক্ষমতায় ত্রুটি আছে। তাঁহার ভাষার প্রবাহ তাঁহার চিন্তার বা কল্পনার সহিত গতিরক্ষা

করিতে পারে না। তাঁহার ভাবের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহার ভাষার দৈন্য সপ্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা তাঁহার শক্তির উৎকর্ষ। তাঁহার রচনা-পদ্ধতি সচ্ছন্দগতি ও মধুর—অনেক স্থলে উচ্ছল—সর্ব্বত্রই তাঁহার ভাবের সহিত সামঞ্জস্য-সম্পন্ন। তাঁহার কল্পনায়ও দৈন্য নাই। তাঁহার গল্পের আখ্যানবস্তু সুচিন্তিত, বর্ণিত চরিত্র-সকল সুচিত্রিত এবং গল্পের শেষ পর্য্যন্ত ঔৎসুক্য আকৃষ্টকারী। সকল বিষয় বিবেচনা করিলে টেকচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভবত: বর্ত্তমান বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।"

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী উপন্যাস তিন খণ্ডে প্রকাশিত হওয়াই প্রথা ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম যে হইত না, তাহা নহে; কিন্তু যে উপন্যাস একখণ্ডে প্রকাশিত হইত, তাহারও পৃষ্ঠাসংখ্যা অল্প হইত না। ঐ সকল উপন্যাসে যে অবান্তর কথা থাকিত, তাহার প্রমাণ, সে সকলই আজ আর পূর্ব্ববৎ সমাদৃত নহে। কিন্তু যে সমালোচক 'বঙ্গাধীপ-পরাজয়ে'র সমালোচনা করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন—হয়ত বাঙ্গালীর মনীষা দীর্ঘ রচনা পারগ নহে, হয়ত উষ্ণপ্রধান দেশের জলবায়ু দীর্ঘকাল লোককে কোন কাজে রত রাখিবার অনুকূল নহে, হয়ত বা বাঙ্গালার লেখকরা আপনাদিগের রচনা প্রকাশে বিলম্ব সহ্য করিতে পারেন না। তিনি যে বাঙ্গালা উপন্যাসের বিস্তৃতির অভাবের কারণ-সন্ধানে মনীষা, প্রাকৃতিক প্রভাব, অধীরতা —এই সকলের বিষয় বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজের দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক। ইংরেজের আদর্শই যে শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বাসই তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। তাহা না হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন, বাঙ্গালী লেখকরা বিরাটকায় রচনাও করিয়াছেন এবং ইংলণ্ড ব্যতীত যুরোপের অন্যান্য দেশে স্বল্পায়তন উপন্যাসের অভাব নাই। উপন্যাসের আকার ঘটনা-সংস্থানের উপর নির্ভর করে। তিনিই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল যে সকল উপন্যাসে দেখা যায়, সে সকল উপন্যাসের উৎকর্ষ পুস্তকের আকারের উপর নির্ভর করে না—হীরক ক্ষুদ্র হইলেও বহুমূল্য এবং গুণগ্রাহীর নিকট আদৃত।

বাঙ্গলার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকরা যে সব বৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, 'রামায়ণ' 'মহাভারত', 'চণ্ডী', 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল', 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি যেরূপ বৃহদাকার তাহাতেই যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকরা পুস্তক বৃহদাকার করেন নাই, এমনও

কি হইতে পারে না? ইংরেজী সাহিত্যের ফরাসী ঐতিহাসিক টেন কবি টেনিসনের কবিতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে কি তাহা বলা যায় না? তিনি লিখিয়াছেন—টেনিসনের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ঘূর্ণিবাত্যার মত চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মত সকল বিষয়ে আতিশয্য দেখাইয়াছিলেন। কেহ কেহ পুরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নানাভাবে মানুষের কল্পনা ভারগ্রস্ত করিয়াছিলেন; কেহ কেহ দার্শনিকতত্ত্ব বিষয়ে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। লোক তাহার পর বিশ্রাম সন্ধান করিতেছিল। তাহাদিগের নিকট টেনিসনের রচনা অতি মধুর মনে হইয়াছিল; তাহারা যাহা ভালবাসিত সে সকল টেনিসনের রচনায় তাহারা পাইয়াছিল—কিন্তু সে সব সংস্কৃত ও সংযত—অথচ সুবিন্যস্ত। তাঁহার কবিতা নিদাঘ সন্ধ্যার মত—প্রকৃতির দৃশ্য দিবাভাগে যেমন ছিল তেমনই, কিন্তু রৌদ্রের ঔজ্জ্বল্য অন্তর্হিত, রৌদ্রতাপে ম্লান ফুলগুলি আবার সদ্য-প্রস্ফুটিত মনে হইতেছে, পশ্চিম দিকচক্রবালে সূর্য্য কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রৌদ্রতপ্ত বৃক্ষলতা ও শষ্পশ্যাম প্রান্তর রক্ত আলোকে রঞ্জিত করিতেছে। He completed an age.

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিরাট বস্তু নহে বলিয়া তাহার নিন্দা না করিয়া তাহার প্রশংসা করাই কি সঙ্গত নহে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন' পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের মত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রচনা তাঁহার উপন্যাসের মত জনপ্রিয় নহে। দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার উপন্যাসসমূহ সমাদৃত; সে সকলের অনেকগুলি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং সেইগুলির দ্বারাই তিনি বিশেষ পরিচিত থাকিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ ছিল না এবং তাঁহার প্রথম লিখিত উপন্যাসসমূহে ধর্ম্মের

কোন সম্পর্ক নাই—সে সকল সৌন্দর্য্যের জন্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। তাঁহার উপন্যাসগুলি যেভাবে একের পর অপরখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইভাবে অধ্যয়ন করিলে তাঁহার মনের ভাববিকাশ বুঝিতে পারা যায়—শিল্পে ক্রমোন্নতি বুঝা যায়। ভারতের ইতিহাসে মুসলমান যুগের অধ্যয়নের এবং কয়েক জন প্রসিদ্ধ মুসলমানের সহিত বন্ধুত্বের ফলে, মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল। ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য শিক্ষাহেতু হিন্দু ও মুসলমান কি জন্য পরস্পরকে ঘৃণা করিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসদ্বয়ে হিন্দুর মত মুসলমানের চরিত্রও চিত্রিত হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র চিত্রণ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার কোন কোন উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র নাই।"

হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। 'বঙ্গবাসী' তাঁহার কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথকে "ককনী কোকিল" ও তাঁহাকে "কলেজী কাকাতুয়া" বলিয়াছিলেন। তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কশূন্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্বে তিনি যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ। তিনি যে সময় (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে উদ্ধৃত মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন যেমন এখনও তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহ সমধিক আদৃত। কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট উপন্যাস যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রচনা অপেক্ষা অধিক আদৃত হইবেই, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায় যে, তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রচনার আদর বাঙ্গালী পাঠকসমাজে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে সকলে যেমন ক্রিয়াকাণ্ড বাহুল্যের পক্ষপাতিত্ব নাই তেমনই সে সকল প্রতীচীর জড়বাদবিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্ত্তী বহু উপন্যাসেও মুসলমান নরনারীর চিত্র চিত্রিত হইয়াছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'সীতারাম', ও 'রাজসিংহের' উল্লেখ করা যায়। হিন্দুর গার্হস্থ্য উপন্যাসসমূহে সেরূপ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

হরপ্রসাদবাবুর হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত বুঝিতে হইলে 'সীতারাম' যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিতে হয়। তাহাতে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে মুসলমান ফকির হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনে সচেষ্ট সীতারামকে বলিতেছেন :—

"বাবা, শুনিতে পাই, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, *** তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি হিন্দুরাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না *** সেই একজনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাঁহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান; উভয়েই তোমার প্রজা হইবে।*** প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।"

'রাজসিংহ' তাঁহার শেষ উপন্যাস। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "হিন্দু হইলেই ভাল হয় না; মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে।"

আজ অনেকে এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন বা এ সকল কথায় গুরুত্বারোপ করেন না। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িকভাবে অনুপ্রাণিত বলেন।

সে যাহাই হউক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে এই সকল উক্তি দেখিতে পাই এবং রাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ পাই, তাহার কারণ, তিনি কেবল পাঠকদিগের চিত্তরঞ্জনের জন্য—কেবল তাঁহাদিগকে মানসিক আনন্দ দানের জন্য উপন্যাস রচনা করেন নাই। মানসিক আনন্দ বিধান যে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঔপন্যাসিক থ্যাকারে তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' নামক উপন্যাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—ঐ পুস্তকের লেখক "আমার সন্তানদিগের যে নির্দ্দোষ হাস্যের এবং মধুর ও নির্ম্মল ভাবের উপকরণ দিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।" কিন্তু উপন্যাসের উন্নততর উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের দ্বারা সেই উদ্দেশ্যসাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—আদর্শ সৃষ্টি। পুরুষের আদর্শ, নারীর আদর্শ, জাতির আদর্শ, শাসনের আদর্শ, ধর্ম্মোপদেশের আদর্শ—তিনি এই সব আদর্শ সৃষ্টিতে অবহিত হইয়াছিলেন। যেই আদর্শ সৃষ্টির জন্য চিত্তবৃত্তির বিকাশ ও জ্ঞানের উন্নতিসাধন প্রয়োজন—সে সকল অনুশীলনসাপেক্ষ। কিরূপে অনুশীলন অভ্যাস করিতে হয়, আদর্শে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়—তাহা তাঁহার উপন্যাসে বুঝান হইয়াছে।

সংসারে আমরা সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস ও বিচরণ করি। নানা দৃশ্যের ও চরিত্রের সহিত আমাদিগের অনেকেরই পরিচয় লাভ অসম্ভব হয়। উপন্যাস সেই পরিচয়ের

প্রবর্ত্তক। উপন্যাস পাঠ করিয়া আমরা বহুবিধ চরিত্রের পরিচয় পাই এবং সহানুভূতির সহায়তায় নানা ঘটনার ও চরিত্রের পরিচয়কালে হৃদয়ের বিস্তারসাধনে ইচ্ছুক ও সমর্থ হই। মনের বিস্তার সাধিত হইলে তাহাতে মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। যতদিন বাঙ্গালী পাঠককে নূতন রচনা দ্বারা আকৃষ্ট করিবার—নূতন রচনার আস্বাদে অভ্যস্ত করিবার প্রয়োজন ছিল, ততদিন তিনি, অসাধারণ কৌশলে, শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত অন্তরালে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পত্রের চিক্কণ শ্যাম আবরণের অন্তরালে থাকিলেও—কুসুমের সৌরভ যেমন ছড়াইয়া পড়ে, সে শিক্ষা তেমনই প্রকাশ পাইয়াছে। সংসারে প্রলোভনের অন্ত নাই। মানুষ যদি প্রলোভনকে পরীক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারে তবে প্রকৃতিকে সংযত করিয়া সে সকল অতিক্রম করিতে পারে না। প্রলোভনের পিচ্ছিল পথে পদস্খলন হইলে তাহার পক্ষে পাপের পঙ্কিল প্রবাহে পতন অনিবার্য্য হয়। পাপের ফল যন্ত্রণা। কেবল পাপেরই নহে, কর্ত্তব্যচ্যুতির ফলও বেদনার কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে তাহাই বুঝাইয়াছেন। সংযমশিক্ষাই যে পরম শিক্ষা তাঁহার রচনাপাঠে পাঠক তাহাই বুঝিতে পারেন। তিনি মানুষকে নানারূপ ঘটনার প্রবাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রলোভনের আবর্ত্তের সন্নিকটে আনিয়াছেন ঃ দেখাইয়াছেন, যে সত্যসত্যই উদ্ধারলাভের চেষ্টা করিয়াছে, সে উদ্ধারলাভ করিয়াছে ; যে সে চেষ্টা করে নাই, সে ডুবিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন—সংযম সাধনা ধর্ম্ম। সেইজন্যই তাঁহার রচনায় কর্ত্তব্যচ্যুতির বেদনা ও পাপের যাতনা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের মত ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় চিত্রিত করিয়াছেন। দশকে যাঁহারা মানবের কল্যাণ কামনায় উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাই করিয়াছেন। জগতে ভাল মন্দ—সৎ ও অসৎ উভয়ই বিদ্যমান। কিন্তু যাঁহারা লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন, তাঁহারা লোককে মন্দ ও অসৎ ত্যাগ করিয়া ভাল ও সৎ গ্রহণ করিতেই উপদেশ দেন। সে উপদেশ কাব্যে, উপন্যাসে, চিত্রে স্থপতি-কীর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। লোকের মন যাহাতে মন্দ ও অসৎ বর্জ্জন করিয়া ভাল ও সতে আকৃষ্ট হয়, তাঁহারা সেইরূপে তাঁহাদিগের সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন। কবি বায়রণের কথাই তাঁহারা লোককে বলেন ঃ—

"Of two such lessons why forget
The nobler and the manlier one ?"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে পাঠককে শিক্ষা দিয়াছেন।

এইখানেই তাঁহার সহিত বহু ঔপন্যাসিকের প্রভেদ। য়ুরোপের, বিশেষ ইংলণ্ডের, সাহিত্যের অভিজ্ঞতা লইয়া প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক ও সাহিত্যিক ফ্রেডরিক হ্যারিশন রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের প্রথমভাগের সাহিত্য সমালোচনায় লিখিয়াছেন ঃ—

"ঔপন্যাসিককে জীবিত আদর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে—তাঁহার সমসাময়িক সমাজের জন্য লিখিতে হইবে। তিনি পরবর্ত্তীকালের পাঠকদিগের জন্য গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না—আবার স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতে পারেন না। কবিদিগের সমসাময়িকরা অনেক সময় তাঁহাদিগের সন্ধানলাভ করেন না। দুই তিন এমন কি পাঁচ ছয় পুরুষ পরে তাঁহাদিগের রচনার আদর হয়। সেক্সপীয়র, মিল্টন, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছে। কিন্তু ঔপন্যাসিককে তাঁহার সময়ের হইতে হয় এবং তাঁহাকে যদি লোককে আনন্দ দিতে হয় তবে, অভিনেতার মত, আপনার সময়ের লোককেই আনন্দ দিতে হয়। ফিলডিং, স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে ট্রোলোপ তাঁহাদিগের কালের এবং সেই কালের পানপাত্র পূর্ণ করিয়া দুই হস্তে ধরিয়া সাগ্রহে সেই জীবন পান করিয়াছেন। কিন্তু জর্জ্জ ইলিয়ট, জর্জ্জ মেরিডিথ ষ্টিভেনশন, হাওয়লস, জেমস—ইঁহারা যেন দর্শকের আসন হইতে অভিনয় দর্শন করেন—কিছুতেই রঙ্গমঞ্চে উপনীত হয়েন না। সাহিত্যের ইতিহাসে কোন উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক যে নিজ সময়ে অজ্ঞাতভাবে থাকিয়া কয় পুরুষ পরে সমাদৃত হইয়াছিলেন—এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।"

সেই কারণেই অসাধারণ করুণ রসের ও হাস্যের অধিকারী হইয়াও ডিকেন্স সময় সময় কৃত্রিমতার ও নাগরিক হীনতার (cockney vulgarities of wretched taste) পঙ্কে পতিত হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিকের প্রতিভার সহিত কবির আদর্শবাদপ্রিয় প্রতিভার সংমিশ্রণ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই যেমন আপনার সময়ের তেমনই পরবর্ত্তী কালের। তিনি কখন আপনার সময়ের খ্যাতির জন্য আদর্শ নত করেন নাই। সেইজন্য শীর্ণশরীরা চিত্রা নদীর তীরে প্রসাদপুরে সুসজ্জিত গৃহে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর কথায় তিনি লিখিয়াছেন—

"এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি

সেই অশোক বকুল কুঞ্জ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গ চালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যূথী জাতি মল্লিকা মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকাচ প্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব্ব মাধুরী, সেই রজত স্ফটিকাদি নির্ম্মিত পুষ্পপাত্রে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহ-শোভাচারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ, আর সেই গায়কের বিশুদ্ধ স্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেননা যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় কার্লাইলের উক্তি মনে পড়ে—"Thou shalt not prate even to thyself, these open secrets known to all."

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমন্দ্রের উপন্যাসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল', দ্বিতীয় 'আনন্দ মঠ' হইতে 'রাজসিংহ'; তিনি সে সকল ভালবাসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সৌন্দর্য্য ভালবাসায়। তিনি তাঁহার উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলিকে প্রেমানুশীলনের জন্য আদর্শ অবস্থায় স্থাপিত করেন—তাহারা সংসারের অভাব ও কার্য্যের ব্যাপকতা হইতে মুক্ত। তাহারা সৌন্দর্য্যের উপাসক। এই সৌন্দর্য্য কেবল দৈহিক সৌন্দর্য্যই নহে, কেবল নৈতিক সৌন্দর্য্যেই নিবদ্ধ নহে, কেবল প্রতিভার সৌন্দর্য্যও নহে। তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই, দুইজন একজনকে ভালবাসে এবং যে সুন্দর সে-ই তাহার প্রেমাস্পদকে লাভ করে। সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী উভয়েই নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসে। কিন্তু কে তাহাকে লাভ করিল? যে সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ। সূর্য্যমুখীর মনীষা ও নৈতিক সৌন্দর্য্য যে কুন্দনন্দিনীর দৈহিক ও ভাব-প্রবণতার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? রোহিণী ও ভ্রমর উভয়েই গোবিন্দলালকে ভালবাসিত। কিন্তু কে তাহাকে পাইয়াছিল? ভ্রমর। ভ্রমরের বর্ণের মলিনত্ব সত্ত্বেও সে যে রোহিণী অপেক্ষা সুন্দরী তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? যে রোহিণীর চরিত্রে নৈতিক হীনতা সুস্পষ্ট সে কি কখন ভ্রমরের নৈতিক সৌন্দর্য্যের, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার, পতিপ্রেমের অধিকারিণী হইতে পারে? বঙ্কিমচন্দ্রের ভালবাসার আদর্শেই তাঁহার উপন্যাস-

সমূহের ক্রমবিকাশ বুঝিতে পারা যায়। ভালবাসার এই আদর্শই মানবের সকল উন্নত মনোবৃত্তির সমবিকাশ। যাহার সেই সমবিকাশ যত সম্পূর্ণ, সে তত সুন্দর। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ হইতে ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’ বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-সর্ব্বস্ব উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। সেইগুলিতে ঐ সমবিকাশের অসম্পূর্ণতা হইতে সম্পূর্ণতা দেখা যায়।

অন্যান্য উচ্চাঙ্গের লেখকের মত বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে মানুষের প্রতি ভালবাসার উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া—ভালবাসার বিস্তার দেখাইয়াছেন। যে ভালবাসা প্রথমে মানুষে নিবদ্ধ থাকে, তাহা ক্রমে দেশপ্রেমে ও জাতিপ্রেমে পরিণত পাইয়াছিল। ‘রাজসিংহে’ দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ; ‘আনন্দমঠে’ স্বজাতিপ্রেমের বিকাশ। কিন্তু দেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেম অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের প্রেম আছে—সে দুর্ব্বলের ও দুঃখীর জন্য ভালবাসা ও সহানুভূতি। এই ভালবাসা আমরা ‘দেবী চৌধুরাণীতে’ ও ‘সীতারামে’ দেখিতে পাই। পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শের দ্বারা শিক্ষা না দিয়া উপদেশ দ্বারা দিতে আরম্ভ করেন। চিত্রাঙ্কন ত্যাগ করিয়া তিনি শিল্পের তত্ত্বে আত্মনিয়োগ করেন,—ঔপন্যাসিকের কার্য্য ত্যাগ করিয়া উপদেষ্টার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসক, সেইজন্য তাঁহার প্রচারিত হিন্দুধর্ম্ম সৌন্দর্য্যের উপাসনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়দিনের মধ্যেই হরপ্রসাদবাবুর প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। সেইজন্যই, বোধ হয়, তাঁহার উক্তির প্রথমাংশে সামান্য ত্রুটি লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ভাগের উপন্যাসগুলির নায়ক নায়িকা সকলেই অভাবের উর্দ্ধে অবস্থিত নহে। প্রমাণস্বরূপ ‘চন্দ্রশেখর’ হইতে দুইটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) “শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না—কেবল মাতা। তাহাদের কিছু ছিল না, কেবল একখানি কুটীর—আর শৈবলিনীর রূপরাশি। প্রতাপও দরিদ্র।”

(২) “চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন; ভাবিলেন, ‘হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি! এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন?”

দ্বিতীয় ভাগের উপন্যাসসমূহের কথা স্বতন্ত্র। প্রচ্ছন্ন দারিদ্র্যের অনলে

দগ্ধ হইয়াই প্রফুল্ল "দেবী চৌধুরাণী" হইবার উপযুক্ত উপকরণে পরিণত হইয়াছিল।

হরপ্রসাদবাবুর মতের শেষাংশের সহিত আমরা একমত। মানুষের ভালবাসার মত চিরাদৃত বৃত্তি আর নাই। ইহা বৈচিত্র্যে কামরূপ সমুদ্রের মত। সে কখন কি অবস্থায় কিরূপে উদ্ভূত হয়, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে বিজয়ী বীরের মত যখন মানুষের হৃদয়ে আপনার অধিকার প্রতিষ্টিত করে, তখন কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে? সমাজের ব্যবস্থায় ও ধর্ম্মের শাসনে তাহাকে সংযত করা সম্ভব—আর কিছুতেই নহে। তাহা মানুষকে অসাধ্য সাধনেও প্রণোদিত করে।

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস। উহাতে যদি প্রথম রচনার ত্রুটি থাকে, তবে এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে উহাতে বৈচিত্র্যও অসাধারণ। এই উপন্যাসে তিনটি নারী-চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ভালবাসার ত্রিবিধ রূপ দেখাইয়াছেন। বিমলা ও তিলোত্তমা হিন্দুসমাজে সমাদর-সম্মানিত স্তরে উদ্ভূত নহে—কিন্তু ভালবাসা তাহাদিগের মনে সমুজ্জ্বল ছিল এবং সেই ভালবাসাই তাহাদিগকে পাঠকের নিকট সমাদৃত করে। আয়েষা মুসলমান কন্যা। ভালবাসা তিলোত্তমায় ব্রীড়াকুণ্ঠিত—তাহা সন্ধ্যায় প্রস্ফুটিত যূথিকার মত পবিত্র ও শুভ্র। বিমলায় সেই ভালবাসা রবিকরে প্রস্ফুটিত সূর্য্যমুখীর মত। সেই ভালবাসা তাহাকে সুদিনে—সম্পদে বিলাসরঙ্গপ্রিয় করিয়াছিল, আবার সেই ভালবাসা তাহাকে দুর্দ্দিনে—বিপদে বিচলিত ও অভিভূত না করিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প করিয়াছিল—সে পতিহন্তার বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া সানন্দে এবং সাগ্রহে বলিয়াছিলেন—"(আমি) পিশাচী নহি—শয়তানী নহি—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী।" আয়েষার ভালবাসা গোলাপের মত। তাহার সৌরভে উপন্যাস সুরভিত—সে গোলাপের সৌন্দর্য্য —অসাধারণ—দিব্য সৌন্দর্য্য সংযমে ও ত্যাগে।

'কপালকুণ্ডলায়' মতিবিবি মোগল রাজধানীর লালসাকলুষিত বিলাস-সরোবরে রাজহংসীর মত ভাসিয়া স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়াও শান্তি ও সুখ পায় নাই। তবে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল জাহাঙ্গীরের মহিষী হইবে। মেহের-উন্নিসার অসতর্ক কথায়—"সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?' যখন তাহার আশা নির্ম্মূল হইল, তখন তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল;

সে নবকুমারকে লাভ করিবার দুরাশা হৃদয়ে পুষ্ট করিল। সে দুরাশার কারণ —ভালবাসা। কিন্তু তখন মনে প্রেমের বিকাশ সম্ভব হইল না। আবার ভালবাসার অভাবেই কপালকুণ্ডলা আপনার জীবন ব্যর্থ করিল—নবকুমারের জীবনও ব্যর্থ করিল। তাহাই 'কপালকুণ্ডলা'র বিয়োগবিধুরতা।

'মৃণালিনী'তে রত্নময়ীর "ঠাকুরাণি, উনি তোমার কে?" এই প্রশ্নে মৃণালিনী যখন বলিলেন, "দেবতা জানেন"—তখনই তাঁহার মনে প্রেমের কুসুমের সৌরভ ছড়াইয়া পড়িল। উভয়েই সাক্ষাৎ—"ধৈর্য্যময়ী প্রকৃতির প্রাসাদ মধ্যে।" সেই সময়ের কথায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—

"ভাষায় কি শব্দ ছিল না? তাহাদিগের মনে কি বলিবার কথা ছিল না? যদি মনে বলিবার কথা ছিল, ভাষায় শব্দ ছিল, তবে কেন তাহারা কথা কহে না? তখন চক্ষুর দেখাতেই মন উন্মত্ত—কথা কহিবে কি প্রকারে? এ সময় কেবলমাত্র প্রণয়ীর নিকটে অবস্থিতিতে এত সুখ যে, হৃদয়মধ্যে অন্য সুখের স্থান থাকে না। যে সে সুখভোগ করিতে থাকে, সে আর কথার সুখ বাসনা করে না।*** মনুষ্য ভাষায় এমন কোন্ শব্দ আছে যে, সে সময়ে প্রযুক্ত হইতে পারে?"

বার্ণস লিখিয়াছেন:—

"If heaven a draught of heavenly pleasure spare,
One cordial in this melancholy vale,
'Tis when a youthful, loving modest pair
In other's arms breathe out the tender tale,
Beneath the milk-white thorn that scents the
evening gale."

তিনিও মিলনের নীরবতার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

'বিষবৃক্ষে' কমলমণি "রমণীরত্ন"। সে রত্নের ঔজ্জ্বল্য ভালবাসায়। তাহার হৃদয় স্বামীর প্রতি প্রেমে এতই পরিপূর্ণ যে সেই ভালবাসা সূর্য্যমুখীতেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল—কুন্দনন্দিনীও তাহাতে বঞ্চিত হয় নাই। সূর্য্যমুখীর ভালবাসাই তাঁহার জীবন—সেইজন্য সেই ভালবাসার অংশ হইতে তিনি অভিমানে সেই ভালবাসার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া, ভুল করিয়াছিলেন। কুন্দনন্দিনী এ ভালবাসার গতিরোধ করিতে পারে নাই। এমন কি হীরার পাপকঙ্করকণ্টকিত জীবনপথেও একদিন তাহার বিকাশ হইয়াছিল; কিন্তু সে কেবল কাঁটাবনে "কলঙ্কের ফুল"।

'চন্দ্রশেখর' বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাতের কথা। বাল্যকাল অতীত হইলেই যখন "শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল"—তখন সে বুঝিল যে, "প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই; বুঝিল, এজন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু সে মরিবে মনে করিয়াও ডুবিতে পারিল না। সে চন্দ্রশেখরের পত্নী হইয়াও তাহার প্রতাপ-প্রেম জয় করিতে পারিল না। তাহার প্রেম বিপথগামী হইল। সে প্রতাপকে বলিয়াছিল—"তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি—এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি।" প্রতাপের তিরস্কারে সে লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিল—"আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল?" প্রতাপ তাহাকে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।" 'আর্য্যদর্শনে' কোন সমালোচক জিজ্ঞাসা করেন, প্রতাপের বলবান চরিত্রে এই দৌর্ব্বল্য কেন? কিন্তু প্রতাপ যে পাছে পদস্খলন হয় সেই ভয়ে সতর্ক থাকিতেন, তাহাই তাঁহার মহত্ত্ব ও তাহাই তাঁহার প্রকৃতিসঙ্গত। 'চন্দ্রশেখরে' দলনী অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তাহার অভিষেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভৃঙ্গার হইতে সৌন্দর্য্যের পূত সলিল বর্ষণ করিয়াছেন। সে মীর কাসেমের পত্নী—"হাজার দাসীর মধ্যে একজন।" মীর কাসেমের চরিত্রের যে বর্ণনা 'মুতাক্ষরীণে' পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, তিনি তৎকালীন ধনী ও শাসকদিগের চরিত্রদোষমুক্ত ছিলেন না। তবুও দলনী তাঁহাকে ভালবাসিত। তাহার সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ পাইয়া মীর কাসেম যখন তাহাকে বিষপানে বধের আদেশ দিলেন, তখন পরওয়ানা পাঠ করিয়া সে স্বামীর আদেশ পালনে দ্বিধানুভব করিল না। মহম্মদ তকী তাহার নিকটে অসাধু প্রস্তাব করিলে সে তকীকে পদাঘাত করিয়া বিষপান করিবার পূর্ব্বে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল—"ও রাজরাজেশ্বর! শাহান্‌শাহা! বাদশাহের বাদশাহ! এ গরীব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ! বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে কেন খাইব না? তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ, তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা। হে রাজাধিরাজ—জগতের মধ্যে অনাথার ভরসা পৃথিবীপতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—

দয়ার সাগর—কোথায় রহিলে? আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না, এই আমার দুঃখ।" প্রেমের এত উচ্চ আদর্শ কয় জন দেখাইতে পারে?

'রজনী'তে রজনীর প্রেম দৃষ্টিপথে নহে স্পর্শে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। সে বলিয়াছে—"সে স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের স্পর্শ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি।" প্রেম এমনই বটে। 'রজনীতে' প্রেম অশ্রুসিক্ত। স্কট বলিয়াছেন ঃ—

"গোলাপ সুন্দরতম ফুট-ফুট করে যবে ধীরে,—
আশা সমুজ্জ্বলতম ভীতি হ'তে মুক্তি-পথে তার;
গোলাপ মধুরতম সিক্ত যবে প্রভাত শিশিরে;
প্রণয় মধুর যবে অভিষেক করে অশ্রুধার।"

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নায়িকা ভ্রমর। ভ্রমর এক দিন স্বামীকে লিখিয়াছিল, "যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস।" এই দৃঢ়তা যে প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সে জানিত গোবিন্দলাল তাহারই—রোহিণীর নহে। তাহার এই বিশ্বাসের কারণ—"আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই।" তাহার প্রেমই জয়ী হইয়াছিল।

'আনন্দমঠ' দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস। কিন্তু ইহাতে মানবের ভালবাসার যে অভাব আছে, তাহাও নহে। শান্তি জীবানন্দকে বুঝাইয়াছিল,—"বিবাহ ইহকালের জন্য এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য।" কল্যাণী স্বামীর কথায় বলিয়াছিল, "আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন।" আবার—"মরিলে কি সম্বন্ধ যায়?" সে স্বামীর পক্ষে মৃত হইয়া আনন্দলাভ করিয়াছিল—তাহাকে মৃত বলিয়া জানেন বলিয়াই স্বামী দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন। সন্তানগণ এই ভালবাসার ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেশকে

ভালবাসিয়াছেন ; সন্তানরা মনে করিয়াছিলেন—"কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই ; কেন না এই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক।"

'দেবী চৌধুরাণীর' নায়িকা দরিদ্র কন্যা প্রফুল্ল পতিপরিত্যক্তা হইয়াও স্বামীকে ভালবাসিতে কুণ্ঠিতা নহে—সেই ভালবাসা তাহার ইহকাল ও পরকাল। যে দিন প্রফুল্লের শ্বশুর তাহাকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হইলেন, সেই দিন রোরুদ্যমানা প্রফুল্ল স্বামীর যে চুম্বন লাভ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতিই সে অক্ষয় সম্পদ বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল। তাই "রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর" গৃহস্থালীতে মন টিকিবে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে প্রফুল্ল বলিয়াছিল—

"ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্ম এই সংসার ধর্ম্ম ; ইহা অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।"

তাই সে স্বামীকে আর একবার দেখিতে পাইবে বলিয়া নিশ্চয় বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল নারীর পতিপ্রেম কিরূপে 'ঈশ্বর প্রেমে পরিণতি লাভ করে, তাহা দেবী চৌধুরাণী'তে দেখান হইয়াছে—"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। শান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে শান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিস্কাররূপে শান্ত। সেইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা।" কিন্তু কর্ত্তব্য কেবল স্ত্রীরই নহে—তাহা স্বামীরও বটে। ব্রজেশ্বর পিতৃভক্ত। ব্রজেশ্বরকেও সেই শিক্ষা লাভ করিতে হইয়াছে। তাই সে বিপদের সময় স্ত্রীকে বলিয়াছিল—"আমি তোমার স্বামী—বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা।"

'সীতারামে' স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছিল—ত্যাগের কারণ জানিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে এক দিন একান্ত প্রয়োজনে সে যখন অনন্যোপায় হইয়া স্বামীর সম্মুখীন হয়, তখন তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া স্বামী সীতারাম তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে স্ত্রী শুনিতে পায়, তাহার কোষ্ঠীর ফল—সে প্রিয় প্রাণহন্ত্রী—সেইজন্য তাহার শ্বশুরের আদেশে তাহার স্বামী তাহাকে গ্রহণ করে নাই, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্বামীকে বলে—"স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাসে থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার

চিরপ্রিয়—এ কথা লুকান আমার উচিত নহে; আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।" জয়ন্তীকে সে বলিয়াছিল—"আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।"—তাহাতে জয়ন্তী যখন বলিয়াছিল—"জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না"—তখন সে বলিয়াছিল—"না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বর চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমি আমার স্বামীবিরহ দুঃখই আমি ভালবাসি।" যে স্বামীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই বলিলেই হয়, সে তাহাকে কিরূপে ভালবাসিল, জিজ্ঞাসায় শ্রী উত্তর দিয়াছেন—"তুমি ঈশ্বর ভালবাস —কয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?···যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম।" পাছে স্বামীর বিপদের কারণ হয় এই আশঙ্কায় শ্রী সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া স্বামীর প্রসারিত বাহুর আলিঙ্গনে বদ্ধা হয় নাই। সে অকপটে স্বীকার করিয়াছিল:—

"যদি একত্রে ঘর সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষমাত্রেই দোষ-গুণ আছে। তাঁহারও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন কথান্তর, মন ভার, অকৌশলে ঘটিত। তা হইলে এ আগুন এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁহাকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘসিয়া দেয়ালে মাখাইয়া লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইতেন···ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখন মনে হয় নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তার পর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

যে শ্রী সিংহপৃষ্ঠে সিংহবাহিনীর মত, রণরঙ্গে জনতাকে বলিয়াছিল—"মার! মার! শত্রু মার!" সে-ই স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী সীতারামের উপযুক্ত স্ত্রী। কিন্তু তাহার যে অসাধারণ সংযম ছিল, সীতারামের তাহাই ছিল না। সেই সংযমের অভাবই সীতারামের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। জাতিপ্রেমও ভাসিয়া গিয়াছিল। সত্যই "রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী! রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।"

'রাজসিংহে' দিল্লী নগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালার সারভূত যে রঙ্‌মহাল "কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য" সেই রঙ্‌মহালে আপনার বিলাস গৃহে জেবউন্নিসা তাহার বিলাস লালসা পরিতৃপ্তির উপায় মীবারককে বলিয়াছিল "বাদশাজাদীর পাপ অসম্ভব"—পাপ পুণ্য যদি আল্লার "হুকুম" হয় তবে—"আল্লা এ সব হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন—কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসত্ব করিয়া, শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাজাদী করিতেন না।" কিন্তু সেই জেবউন্নিসাই—যুদ্ধের শেষে—মবারকের মৃত্যু-সংবাদে "বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিল, উদয়সাগরের প্রস্তর কঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিল—

"বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধনা।"

জেবউন্নিসা আর গর্ব্বিতা, স্নেহাভাবরূপে প্রফুল্লা থাকিতে পারে নাই—"বিনীতা দর্পশূন্যা, স্নেহশালিনী, অশ্রুময়ী" হইয়াছিল।

'ইন্দিরা', 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়'—গল্প ত্রয়ের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তিনটিই ছোট গল্প। ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য, ইংরেজীতে যাহাকে 'বুলস আই' লণ্ঠন বলে তাহার মত—চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে একটি মাত্র দ্রব্যের উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়া তাহাই দেখাইয়া দেয়। এই গল্প তিনটিতে ভালবাসার উপর আলোকপাত করা হইয়াছে—সেই আলোকে অনাবিল ভালবাসাই সমুজ্জ্বল দেখাইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাঠকদিগের চিত্তরঞ্জন—পাঠকদিগকে কেবল আনন্দদান বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি উপন্যাসের উচ্চ আদর্শ ও মহৎ উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মানুষের মহৎ চিত্তবৃত্তির বিকাশ ও জ্ঞানের বিস্তার-সাধনই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। সংসারে আমরা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করি, আমাদিগের সাধারণ ভাব আমাদিগকে সীমাবদ্ধ কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্যে রত রাখে, বহুবিধ অবস্থার ও চরিত্রের সহিত আমাদিগের অনেকেরই পরিচয়ের সুযোগ ঘটে না। উপন্যাস সেই পরিচয়ের প্রবর্ত্তক। উপন্যাস পাঠে আমরা অজ্ঞাত বহু অবস্থার ও নানারূপ মানুষের পরিচয় পাই এবং সহানুভূতির সাহায্যে নানা ঘটনার ও চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে হৃদয়ের মহত্ত্বের বিকাশ সাধনে সমুৎসুক ও সমর্থ হই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহে এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ—এই উদ্দেশ্য সপ্রকাশ। প্রথম যতদিন বাঙ্গালী পাঠককে নূতন রচনার আস্বাদে আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত করিতে হইয়াছিল, ততদিন তিনি, অসাধারণ কৌশলে, শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত পশ্চাতে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পত্রের কিঞ্চিৎশ্যাম আবরণের অন্তরালে অবস্থিত কুসুমের সৌরভ যেমন প্রকাশিত হয়, সেই শিক্ষা তেমনই প্রকাশিত হইয়াছিল। সংসারে প্রলোভনের অন্ত নাই। মানুষ তাহার প্রবল প্রবৃত্তি সংযত করিতে না পারিলে সে প্রলোভন প্রহত করিতে পারে না; আর প্রলোভনের পিচ্ছিল পথে পদস্খলন হইলে তাহার পক্ষে পাপের পঙ্কিল প্রবাহে পতন অনিবার্য্য। পাপের ফল যাতনা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসসমূহে তাহাই বুঝাইয়াছেন। সংযম-শিক্ষাই যে পরম শিক্ষা, তাঁহার উপন্যাসে তাহাই বিবিধভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি মানুষকে নানারূপ ঘটনার প্রবাহে ফেলিয়া প্রলোভনের আবর্ত্তের নিকটে আসিয়াছেন; দেখাইয়াছেন, যে সত্য সত্যই উদ্ধারলাভের চেষ্টা করে, সে উদ্ধারলাভ করে, যে চেষ্টা করে না বা যাহার সে চেষ্টায় আন্তরিকতা থাকে না সে ডুবিয়া যায়। তিনি বুঝাইয়াছেন, সংযম-সাধনাই ধর্ম্ম। সেইজন্যই তাঁহার রচনায় পাপের ফল যাতনা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখান হইয়াছে, ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় চিত্রিত হইয়াছে। জগতে যাঁহারা সমাজের কল্যাণ কামনায় উচ্চ আদর্শের

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ চিত্রই চিত্রিত করিয়াছেন। জগতে ভাল ও মন্দ উভয়ই আছে। যিনি লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি মানুষকে মন্দ পরিহার করিয়া ভাল গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেন, মানুষের হৃদয় যাহাতে হীনকে ত্যাগ করিয়া মহতে আকৃষ্ট হয়, তিনি তাহারই উপায় করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার উপন্যাসগুলিকে প্রেম-প্রধান বলিলেও বলা যায়। কিন্তু যে প্রেম শুদ্ধ, সমাজের ভিত্তি—যাহা দেশসেবার ও ঈশ্বর আরাধনার সোপান হইবে—সেই প্রেম যাহারা আবিল ও অপবিত্র করে, তাহাদিগকে তাঁহার আক্রমণ যেন তীক্ষ্ণ খড়্গের নির্ম্মম আঘাত। ধর্ম্ম সর্ব্বোচ্চ—তাহার জন্য সব বর্জ্জন করিতে হয়—ভালবাসা কোন্ ছার।

'মৃণালিনী'তে হেমচন্দ্র মনোরমাকে বলিয়াছিলেন, "স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম্ম নাই···সতীত্বের হানি কেবল কার্য্যেই ঘটে, এমন নহে; স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন। তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনে ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে।" আবার—"ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে। স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম সতীত্ব।" হেমচন্দ্র—"বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে।··· তুমি যদি ধর্ম্মে একের পত্নী, মনে অন্যের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কি না?"

সূর্য্যমুখী পতিপ্রাণা—"পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী, পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী।···পৃথিবীতে যদি আমার কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ।" সেই স্বামী যখন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিতে উদ্যত তখনও কমলমণি তাহাকে বলিল, "স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না।···স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

কমলমণি যে কেবল আপনার আদর্শে ও আপনার সংসারের আদর্শে বিচার করিয়াই ভ্রাতৃজায়াকে এই উপদেশ দিয়াছিল, তাহা নহে। যে সংস্কার এত দিন হিন্দুর সমাজ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে, হিন্দুকে স্বাতন্ত্র্যভ্রষ্ট করে নাই, সেই ধর্ম্মপূত ধর্ম্মসংযত সংস্কারই কমলমণির এইরূপ উক্তির কারণ। এই সংস্কার হিন্দুর বৈশিষ্ট্য এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী যাহারা এই সংস্কারের বশবর্ত্তী নহে, তাহাদিগের সমাজেও যে ইহার আদর নাই, তাহা নহে; আদর আছে বলিয়াই দলনী

মোহিনী। এই সংস্কারের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে না পারিয়াই সিরাজদ্দৌলা হোসেন কুলীকে হত্যা করিয়াছিল। বিবাহিতার সহিত ঘনিষ্ঠতায় আয়ার্লণ্ডের নেতা পার্ণেলের পতন হইয়াছিল। তাঁহার কথায় ওব্রায়েন সেই বিষয়ে লিখিয়াছেন—"He sinned, and he paid the penalty of his sin. For ten years this unfortunate *liaison* being like a milestone round his neck and dragged him in the end to the grave." গ্লাডষ্টোন সেই বিষয়ে বলিয়াছিলেন, "It was a terrible tragedy. I do believe firmly that if these divorce proceedings had not taken place there would be a Parliament in Ireland to-day." সীতারাম সত্যই বুঝিয়াছিলেন—"বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই?"—কিন্তু তিনি ভালবাসার স্থান যাহাকে দিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। এই বিষয়ে প্রতীচ্য মত—প্রতীচ্যের সংস্কার—যে সমাজে বিধবার বিবাহ এমন কি স্বামী-ত্যাগকারিণী বা স্বামীকর্ত্তৃক ত্যক্তার বিবাহ প্রচলিত, সে সমাজের মত ও সংস্কারও যে বৈবাহিক সম্বন্ধকে উচ্চস্থান প্রদান করে, তাহা গ্রাণ্ট আলেন প্রণীত "Wholly and solely to satisfy my own taste and my conscience." লিখিত 'The woman who did' পুস্তকে বুঝিতে পারা যায়। যে নারী স্বাধীনতার জন্য সমাজের সব সংস্কার পদদলিত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই, তাহার কন্যার তিরস্কার তাহার অপমৃত্যুর কারণ হয়—"আমাকে পৃথিবীতে আনিবার কোন অধিকার তোমার ছিল না। যদি তুমি আমাকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলে, তবে কেন আমাকে অন্য সকলের সমস্তরে স্থাপিত করিলে না?" এই উপন্যাসের সমালোচনায় 'রিভিউ অব রিভিউস' পত্রে সমালোচক বলিয়াছিলেন—"Every child has a natural right to have two legal parents bound by law to care for it......and any one who voluntarily brings a child into the world with no legal parents inflicts a wrong upon her offspring." অর্থাৎ সমাজে বাস করিতে হইলে সমাজের বিধি-নিষেধ মানিতে হইবে, না মানিলে যে দণ্ড সমাজ বিধান করিবে, তাহা গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনী সেই বিধি-নিষেধ মানে নাই: তাহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। আর প্রতাপ? প্রতাপ সে বিষয়ে অবহিত হইয়াছিল, ব্রহ্মাণ্ডজয় যে ইন্দ্রিয়-জয়ের তুল্য হইতে পারে না, সেই ইন্দ্রিয়-জয়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সে

শৈবলিনীকে ভালবাসিয়াছিল—কিন্তু পাপচিত্তে নহে—"আমার ভালবাসার নাম জীবন-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।…এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে।…আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী?" এই স্থানেই মানুষ কেবল দেবতার নিকটস্থ—কেবল দেবতার ছায়া নহে—ভীষ্মের মত সে দেবত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। তাই রামানন্দ স্বামী তাহার সম্মুখে—সেই বিরাট আদর্শের সম্মুখে—সেই ইচ্ছামৃত্যু বরণকারীর, শরশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন :—

"ইন্দ্রিয়-জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমার। যদি চিত্ত-সংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়-জয়ী হই।"

কুরুপিতামহ যখন ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মৃত্যুকালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন তিনি পানীয় জল চাহিয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে সুবাসিত বারি আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তাহা স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী নহে বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি অর্জ্জুনকে জল আনিতে বলিলে গাণ্ডীবী, ধরণী বাণদীর্ণ করিলে সেই ছিদ্রপথে গঙ্গোদক উত্থিত হইয়া তাঁহার মৃত্যুতৃষ্ণা-শুষ্ক ওষ্ঠাধর সিক্ত করিয়াছিল। রামানন্দ স্বামীর এই উত্তর কি প্রতাপের পক্ষে মৃত্যুবাণে সেই অর্জ্জুন শরবিদ্ধ ধরণীর উপহার গঙ্গোদকের মত স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছিল?

'রজনী'তে যাহারা সংযমে পটু তাহাদিগেরই একজন—লবঙ্গলতা অসংযমের দণ্ড দিবার জন্য বিধাতার অপেক্ষা না রাখিয়া আপনি দণ্ড দিয়াছিল। তাহার বয়স তখন অল্প, আদর্শে আকর্ষণ প্রবল—তাই দণ্ড কঠোর হইয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল—"যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই।"

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নারীরত্ন ভ্রমরকে যখন গোবিন্দলাল রোহিণীর জন্য ত্যাগ করিয়া গেল তখন আপনার ভালবাসায় ও ধর্ম্মে অবিচলিত বিশ্বাস লইয়া ভ্রমর বলিয়াছিল :—

"তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও—উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—

একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতা সাক্ষী! আমি যদি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।…যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

শেষে "বালকনখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ" ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল। আর ভ্রমর ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থলে স্বামীকে পাইল—ভোগের জন্য নহে, ত্যাগের জন্য, কেবল ভালবাসার জন্য।

'আনন্দমঠে' ভবানন্দ "সন্তানধর্ম্ম" ভুলিয়া রমণীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি উহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইবার পূর্ব্বে যখন মহেন্দ্রের পত্নী কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?"—তখন কল্যাণী বলিয়াছিল—"রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।" যে নারী স্বামীর ব্রতপালনে সহায় হইবার আগ্রহে—স্বামীর ধর্ম্মপত্নীর কর্ত্তব্যবোধে আপনি যে জীবিত সে সংবাদ স্বামীকে জানিতে দেয় নাই—কন্যাকেও অঙ্কে চাহে নাই, এই উক্তি তাহারই উপযুক্ত। ভবানন্দ সন্ন্যাসী হইয়াও কল্যাণীর আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই—তাহার চিত্ত "ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে"—বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাসকে জয় করিতে পারে নাই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কয়টি মাত্র বাক্যে চিরন্তন সত্য প্রকাশ করিয়াছেন—"হায়! রমণীর রূপলাবণ্য! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক!"

'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্ল শিক্ষার দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিল।

'সীতারামে'ও সেই শিক্ষা—"হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক!" সীতারাম যতদিন শ্রীকে চাহিয়াছিলেন—"যে তাঁহার উচ্চ আশার আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, ঘরে আনন্দময়ী", ততদিন তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন নাই; ততদিন শ্রীর কথাই জপমালা করিয়াছিলেন—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"—ততদিন তিনি মনে করিয়াছিলেন—যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী হইয়া সৈন্য সঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারে? কিন্তু সীতারামের চিত্তে ভোগ-লালসা প্রবল হইল। সব শেষ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বুঝিতে পারিলেন, বাঙ্গালী পাঠক কেবল চিত্তরঞ্জনের জন্যই নহে, পরন্তু শিক্ষা লাভের জন্যও উপন্যাস পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—উপন্যাস হইতে উচ্চ মনোবৃত্তির পরিপোষক আবশ্যক রস গ্রহণ করিতে পারিতেছে তখন তিনি শিক্ষাদানই উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া শিক্ষাকে প্রাধান্য দান করিলেন। সেইজন্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সুমধুর বীণার ঝঙ্কার 'আনন্দমঠে' গম্ভীর তূর্য্যনিনাদে পরিণত হইল। পরিবর্ত্তন অসাধারণ; কিন্তু তাহা কেহই অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিল না। যে লোকশিক্ষা এত দিন পশ্চাতে থাকিয়া অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল—সে সদর্পে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোক তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল—বরণ করিয়া লইল।

বাঙ্গালা দীর্ঘকাল বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত, বিদেশীর অধিকৃত; বাঙ্গালী বহু দিন হইতে "যে দেশে জন্ম—যে দেশে বাস" সে দেশকে "আমার দেশ" বলিতে পারে না। সে "নিজবাসভূমে পরবাসী।" সে দেশ যে পুণ্যভূমি, কবিকুল যে সেই দেশের গৌরবগীত গান করিয়াছেন, বীরগণ যে সেই দেশের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন—বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়া যাইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য 'আনন্দমঠ' রচনা করিলেন। রাজা যিনিই হউন, দেশ আমাদিগের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়—কেন না, দেশ আমাদিগের জননী। যে বাঙ্গালী এককালে মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ অরাজকতা দূর করিবার জন্য গোপালকে (৮১৫ খৃষ্টাব্দ) রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, সেই বাঙ্গালীর নিকট তিনি দেশের এই মাতৃভাব 'আনন্দমঠে' ফুটাইয়া তুলিলেন। "সন্তান-সম্প্রদায়" দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী—"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল এই সুজলা, সুফলা, মলয়জ সমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি।" একথা বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে শুনাইলেন—এমন ভাবে শুনাইলেন যে, তাহা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল"—তাহাতে বাঙ্গালীর "যোগনিদ্রাশেষ" হইল। কিন্তু মা'কে "মা" বলিতে শিখিতে, চিন্ময়ী মাতাকে মৃণ্ময়ীতে দর্শন করিতে আর মৃণ্ময়ী মাতার চিন্ময়ীকে উপলব্ধি করিতে, মা'র দুঃখ দূর করিতে কঠোর সাধনা প্রয়োজন। গুণ "অভ্যাস করিতে হয়।" "সন্তান-সম্প্রদায়ে"র সন্ন্যাস "অভ্যাসের জন্য"—

"কার্য্য উদ্ধার হইলে, অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে আমরা আবার গৃহী হইব।" দেশচর্চ্চা ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিবার—ব্রতরূপে পালন করিবার কথা নবীন যুগের বাঙ্গালীকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বলিলেন—বাঙ্গালীকে তিনি নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তিনি বাঙ্গালীকে নবীন ধর্ম্মের মন্ত্র দান করিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক শক্তির কথা অরবিন্দ তাঁহার অনিন্দ্য-সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"মন্ত্র যখন প্রদত্ত হইল, তখন একদিনে সমগ্র জাতি দেশ-প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। মা আপনাকে প্রতিভাত করিয়াছেন। একবার যখন জাতি মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পায় তখন তাহার আর যতক্ষণ মাতৃ-মন্দির নির্ম্মিত, তাহাতে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ও পূজা সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ—বিশ্রাম, শান্তি ও নিদ্রার সময় থাকিতে পারে না। জাতি যখন সেই মূর্ত্তি একবার দর্শন করে, তখন আর তাহাকে বিদেশীর পদতলে রক্ষা করা সম্ভব হয় না!"

'আনন্দমঠে' যে কঠোর সাধনার প্রথম উল্লেখ, 'দেবী চৌধুরাণী'তে তাহা উচ্চতর স্তরে উপনীত। 'আনন্দমঠে'র সাধনা সকাম—'দেবী চৌধুরাণী'তে তাহা নিষ্কাম। কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেয়ঃ—কর্ম্ম ব্যতীত মানুষের জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হয় না; কিন্তু কেবল কর্ত্তব্য পালন জন্য কার্য্য করিতে হইবে—তাহাতে কামনা থাকিবে না। এই নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা প্রদানই 'দেবী চৌধুরাণী'র উদ্দেশ্য। যে নারী স্বভাবতঃ স্নেহপ্রেমাদি কোমল প্রবৃত্তিপ্রবলা—সেই রমণীকে বঙ্কিমচন্দ্র এই দুষ্কর সাধনায় ব্রতী করিয়াছেন। শান্তি স্বামীর ব্রত জানিয়াও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে নাই, মিলনের বাসনা বর্জ্জন করিতে পারে নাই, কিন্তু কল্যাণী তাহা পারিয়াছিল—কেবল স্বামীকেই নহে কন্যাকেও ছাড়িয়াছিল—স্বামীর ব্রত উদ্‌যাপিত হউক। প্রফুল্ল আরও উচ্চস্তরে। নারী সংযমের দুষ্কর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলে সংসার স্বর্গ হয়! অবস্থা বিপর্য্যয় অসূর্য্যম্পশ্যা নারীকে কিরূপ সর্ব্বংসহা করিয়া তুলিতে পারে—বিপদের মধ্য দিয়া সম্পদ কিরূপে অপ্রত্যাশিত পথে আসিয়া উপস্থিত হয়, 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখাইয়াছেন—ধর্ম্ম-বলের নিকট পশুবল দাসের মত কাজ করে—সংসারে তাহারও উপযোগিতা

ও প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য উন্নত বল প্রয়োজন। সেই বল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলে—প্রকৃত পথে পরিচালিত হইলে, পশুবল অনিষ্টের কারণ না হইয়া কল্যাণকর হয়। সেক্সপীয়র 'টেম্পেষ্ট' নাটকে ইহাই দেখাইয়াছেন। কালিবন পশুবল; প্রস্পেরো তাহা নিয়ন্ত্রিত করিয়া কল্যাণকর কার্য্যে প্রযুক্ত করেন।

'সীতারামে'ও এই নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। 'সীতারামে'ও নারী তাহাতে অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির বেগ প্রশমিত—সংযত ও সংহত করিতে না পারিলে সবই নষ্ট হইয়া যায়; অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল জনবল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—সবই বাত্যাবিতাড়িত শুষ্ক পত্রের গতি প্রাপ্ত হয়—বিনষ্ট হইয়া যায়। এই 'সীতারামে' বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে আর এক শিক্ষা দিয়াছেন—মানুষ যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন অন্যের সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্য আছে; সে কর্ত্তব্য তাহাকে পালন করিতে হয়। যে সংসারী—গৃহী, সে গৃহস্থদিগের সম্বন্ধে আপনার কর্ত্তব্য পালন না করিলে ধর্ম্মে পতিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এই 'মোক্ষ লাভ' প্রয়াসীর দেশে হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ইহা আবার বুঝাইয়াছেন :—

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে, চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহলোকেও নরক ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি পরম সত্য। সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম্ম কর হে বাপু। অন্যায় করো না, অধর্ম্ম করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জ্জন করে স্ত্রী পরিবার পরিজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার মোক্ষ !!"

'সীতারামে'র শিক্ষা—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে?" মানুষ সামাজিক জীব—সে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, সে যদি সমাজ ভুলিয়া কেবল ব্যক্তিগত সুখ স্বার্থের সন্ধান করে, তবে তাহারও অমঙ্গল—সমাজের অনিষ্ট। সত্যই হিন্দুর বিবেচ্য—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে?"

এই উক্তিতে কেহ কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিচয়

পাইয়াছেন। তাঁহারা ভ্রান্ত। যিনি মাতৃমন্ত্রের ঋষি, তিনি ভেদনীতির প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না ;—ঐক্যই তাঁহার লক্ষ্য ; বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য-প্রচারক। 'আনন্দমঠে' তিনি বুঝাইয়াছেন—"সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই।" 'আনন্দমঠে'র এই কথা ও 'সীতারামে' শ্রীর উক্তি একত্র পাঠ করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সমুজ্জ্বল ও সপ্রকাশ হয়। কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র যত প্রসারিত হয় ভেদও তত বিলুপ্ত হয়। গৃহী গৃহস্থদিগের সুখের ও স্বার্থের জন্য শত্রুর আক্রমণ হইতে গৃহস্থদিগকে রক্ষা করিবে। সমাজভুক্ত মানব আপনার সমাজস্থদিগের সুখের ও স্বার্থের জন্য অপর সমাজস্থদিগের আক্রমণ হইতে স্বীয় সমাজস্থদিগকে রক্ষা করিবে। কিন্তু সে অন্যায় ও অত্যাচার প্রহত করিবে—অন্যায়ের ও অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিবে না ; পরন্তু যথাসাধ্য পরোপকার করিবে। ক্রমে যখন কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া গৃহ ও সমাজ ছাড়াইয়া দেশে ব্যাপ্তিলাভ করে, তখন সকল গৃহী ও সকল সমাজস্থ একত্র হইয়া—বৃহৎ কর্ত্তব্যের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সেই স্বার্থসঞ্জাত ভেদ ভুলিয়া—একই উদ্দেশ্যে একই সাধনায় —সমবেত চেষ্টায় একই লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এই কথা 'দেবী চৌধুরাণী'তে অন্যভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। শান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে শান্ত শ্রীকৃষ্ণ।" দেবীই বলিয়াছিল, তাহার স্বামীর জীবন রক্ষার্থ বহুলোকের জীবন নাশের অধিকার তাহার নাই। স্বামী তাহার সর্ব্বস্ব হইলেও তাহাদিগের কে? আদর্শ যত উচ্চ হয় ততই ভাল ; কিন্তু উন্নত আদর্শে উপনীত হইবার জন্য সোপান পরম্পরার প্রয়োজন। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপন্যাসত্রয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সোপান দেখাইয়াছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে পিতার আজ্ঞায় পত্নীত্যাগী ব্রজেশ্বর যখন বিপন্না পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে অসম্মত হইল,—বলিল "আমি তোমার স্বামী —বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি রক্ষা করিতে পারিব না,— তাই বলিয়া কি বিপৎকালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?"—তখন গৃহী ব্রজেশ্বর গৃহীর কর্ত্তব্য পালন করিল—বিপদে পত্নীকে রক্ষার ভার লইল, সে বিপদ বরণ করিতে প্রস্তুত হইল। 'সীতারামে' সীতারাম যখন দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধের বিষম ফল কি হইতে পারে তাহা বুঝিয়াও শ্রীকে বলিলেন, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে? আমি

তোমার কাছে স্বীকার করিলাম, গঙ্গারামের জন্য আমি যথাসাধ্য করিব।" তখন তিনি সমাজভুক্ত মানুষের কর্ত্তব্য পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহার পর 'আনন্দমঠে' মহেন্দ্র যখন দেশের জন্য "দারাসুত", "ধন-সম্পদ-ভোগ" এমন কি "জাতি" পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে সম্মত হইল, তখন সে—বাঙ্গালী—জননী জন্মভূমির জন্য আপনার কর্ত্তব্য পালনে বদ্ধপরিকর হইল—সর্ব্বস্ব পণ করিল। তখন আদর্শে উপনীত হইবার সোপানশ্রেণী সম্পূর্ণ হইল।

এই পুস্তকত্রয়ের আর এক শিক্ষা—শক্তিচর্চ্চার উপযোগিতা ও প্রয়োজন। 'রাজসিংহে'র নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"এই (খৃষ্টীয়) ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথাটা খাটে।" দৌর্ব্বল্য দুঃখের কারণ। যে সবল সে বহিঃশত্রুর ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ভবানী ঠাকুরের উক্তি—"দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম বিনা ইন্দ্রিয় জয় হয় নাই।"

এই সঙ্গে 'রাজসিংহে' রাজসিংহের রাজকর্ত্তব্য-পালনের উল্লেখ করিতে হয়। ইহাতে গ্রন্থকার বাহুবলের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন।

'রাজসিংহ' বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব রচনা। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" কোন কোন ছিদ্রান্বেষী সমালোচক বা লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসকেও আপনাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস ধরিয়া লইয়া তাঁহার রচনার ত্রুটি প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ 'দেবী চৌধুরাণী'র বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—'আনন্দমঠ' রচনাকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিক রচনার ভান করি নাই।.........পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক 'আনন্দমঠ' বা 'দেবী চৌধুরাণী'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বড়ই বাধিত হইব।" 'সীতারামে'র বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন—"সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।" তাহার পর 'রাজসিংহে'র বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন—'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।" এই "কবুল জবাব" সত্ত্বেও যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' ব্যতীত অন্য কোন

উপন্যাসে ইতিহাসবিরুদ্ধ কিছু দেখিয়া তাঁহাকে দোষী বলিতে চাহেন—যুক্তিতর্কে তাঁহাদিগকে পরাস্ত বা মতান্তরগ্রাহী করিবার আশা একান্তই সুদূর-পরাহত।

রাজসিংহের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"সেকালের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা সকলেই জানে। রাজপুতগণের কার্য্য অধিকতর হইলেও এ দেশে তেমন সুপরিচিত নহে। তাহা সুপরিচিত করিবার যথেষ্ট উপায়—ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন।...অন্ততঃ এ কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম সাপেক্ষ। ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস-লেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে সকল স্থানে উপন্যাস ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না।...যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।...উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে উপন্যাসের সাহায্যে ইতিহাসের শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের সাফল্যের কতকগুলি অন্তরায় আছে। যে সকল উপাদানে তাঁহাদিগের রচনা রচিত, সময় সময় রচনার মধ্যে সেই সকল উপাদান লক্ষিত হয়; তাঁহারা যে কৌশলে রচনা-পটে অতীতের চিত্র প্রতিফলিত করেন, অনেক সময় পাঠক সেই কৌশল বুঝিতে পারেন; তাঁহারা অনেক স্থলে বর্ত্তমান কালের মতামত অনুসারে অতীত কালের ঘটনাবলী ও চরিত্র সকলের বিচার করিবার অভ্যাস অতিক্রম করিতে পারেন না। এই সকল জলতলস্থ শৈলে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের রচনাতরী অনেক সময় আঘাত পাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সুখের বিষয়, নিপুণ কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্রের সতর্ক পরিচালনায় তাঁহার রচনাতরণী সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে সাহিত্য-সম্রাটের এই শেষ দান উপন্যাস এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। মাতৃভাষার চরণে ইহা তাঁহার শেষ অর্ঘ্য।

এই 'রাজসিংহ' এক অপূর্ব্ব রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে কেহ কেহ যে

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন নাই, এমন নহে। কিন্তু সে সকলের অধিকাংশই ঐতিহাসিক উপন্যাস পদবাচ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছি। এই উপন্যাস উল্লেখযোগ্য; কিন্তু ইহাতে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের সমধিক চেষ্টায় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই; আবার উপন্যাসের গতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় ইতিহাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। আর একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস—ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। 'রাজসিংহে'র সহিত এই পুস্তকের তুলনা হয় না। রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন, ইহাতে গ্রন্থকার "উপন্যাসবর্ণন প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অস্ত্রশস্ত্র, সেনা, দিল্লীনগর, তত্রত্য রাজভবন, সাজাহানের দুরবস্থা ও তাঁহার নির্ম্মিত ময়ূরতক্ত নামক সিংহাসন প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক পদার্থের যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন।··· বাদশাহের জন্মতিথির বিবরণ প্রভৃতি যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ইতিহাসমূলক।" কিন্তু ইতিহাসের অধ্যয়নই উপন্যাস রচনায় সাফল্যলাভের কারণ হয় না। 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' যে আজ দুষ্প্রাপ্য এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' যে বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার আরম্ভের উদাহরণ রূপে কৌতূহলী পাঠকের দ্বারা পঠিত—তাহাতেই সাহিত্যে তাহাদিগের প্রকৃত স্থান বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনা-প্রণোদিত রমেশচন্দ্র দত্তের পুস্তকগুলিতে, বিশেষ 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', জীবন-প্রভাত', 'জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাস চতুষ্টয়ে যদি ইতিহাসকে উপন্যাসে প্রাধান্য প্রদান করা না হইত, তবে এইগুলি আরও আদর লাভ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

আপনার অসাধারণ ক্ষমতা যখন অনুশীলন ফলে পরিপূর্ণ-রূপে বিকশিত হইয়াছিল, তখনই বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহারও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বাঙ্গালা সাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে বঙ্গ মহাকবিগণ, লড়াই বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না।"—তিনিই বহুদিন পরে, যুদ্ধবর্ণন-বহুল 'রাজসিংহ' পাঠ করিয়া তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

'রাজসিংহে'র ঘটনাবলী যুদ্ধেরই মত দ্রুত। কোথাও বাধা নাই,—কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্যের চিহ্নমাত্র নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"পর্ব্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মত ছুটিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয়,

তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, মনে হয় না তাহারা কোন কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছুদূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে—ক্রমেই গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই। 'রাজসিংহে'ও তাই। তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মত দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি, তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি, ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি, কতক বা নদীর স্রোত কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জ্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা কালপুরুষ-লিখিত ইতিহাসের অব্যাকুল বিরাট বিস্তার, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহা ধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা—"এই ইতিহাস ও উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়-বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্ত্তী না হয় এবিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তারিত করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুই একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই এক সঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশি করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোন কোন অতি কৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তর ভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র এবং সেই জন্যই মনোক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য লেখক

গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার শেষাংশ বিশেষভাবে উপমা তুলনার বাহুল্যে ও আড়ম্বরে ভারাক্রান্ত এবং তাহাতে ইংরেজীতে যাহাকে damning with faint praise বলে, তাহাও যেন লক্ষ্য করা যায়। 'রাজসিংহ' পাঠ শেষ করিলে মনে হয় না, ইতিহাসে কোথাও কতকাংশ বাদ পড়িয়াছে বা গ্রন্থবর্ণিত চরিত্রগুলির হৃদয়-বিশ্লেষণে কোথাও ত্রুটি হইয়াছে। ইহাতে ইতিহাসের যে অংশ উপন্যাসের জন্য প্রয়োজন তাহাই প্রদত্ত হইয়াছে এবং পাত্রপাত্রীদিগের মনোভাবের বিশ্লেষণও অসম্পূর্ণ হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উপন্যাসে হিন্দুদিগের বাহুবলই তাঁহার প্রতিপাদ্য ছিল। তাঁহার অঙ্কিত হিন্দুর বাহুবলের চিত্র সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়াছে। গ্রন্থে বাহুবল ব্যতীত অন্য প্রতিপাদ্য বিষয়ের কথা গ্রন্থকার স্বয়ং উপসংহারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—"অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক—সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিলেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক সে-ই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়াও মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন।"

এই স্থানে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য অভিন্ন। রাজার কর্ত্তব্য ন্যায়নিষ্ঠ ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া প্রজাশাসন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসসমূহে নানাপ্রকারে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। সেইজন্যই বলিতে হয়, তিনি কেবল পাঠকদিগের চিত্তরঞ্জনের জন্য, কেবল তাহাদিগের সাময়িক আনন্দবিধানের জন্য উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি উপন্যাসের উচ্চ আদর্শ ও মহান উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালার বাহিরের বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তির ও ঘটনার সহিত পরিচিত করিয়াছেন। সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম—এসকল কয়জন বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠের পূর্ব্বে অবগত ছিলেন? পরিণত বয়সে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসসমূহেও ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ-পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'মৃণালিনী' উপন্যাসত্রয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ছিল। 'চন্দ্রশেখরের' "বিজ্ঞাপনে" তিনি বাঙ্গালী পাঠককে মুতাক্ষরীণ নামক দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক পুস্তকের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি যখন 'চন্দ্রশেখর' রচনা করিয়াছিলেন, তখনও উহা একান্তই দুষ্প্রাপ্য ছিল—কারণ, তখনও তাহা পুনর্ম্মুদ্রিত হয় নাই। 'রাজসিংহে'র শেষ কথা—"ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়, উভয়ের কীর্ত্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিযাছেন—এদেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ দুঃখ, এদেশের ইতিহাস নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়-দিগের ভয়ে ভীত হইয়া, ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব', অশুভের নাম 'দুর্দ্দৈব'। এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা, বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেব-কীর্ত্তিই

বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবানুগৃহীত ; সেখানে দৈবের গুণকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য, মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তি বর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানবিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। * * * অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী, এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি, ইতিহাস সামাজিক বিকাশের এবং সামাজিক উচ্চাসনের একটি মূল। ইতিহাস-বিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতা-পিতামহের নাম জানে না ; এমন এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে।”

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগের ইতিহাস না থাকার যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রধান কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে। জগতে কোন্ প্রাচীন জাতি ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের জন্য আপনাদিগের ইতিহাস ভূর্জ্জপত্রে বা তালপত্রেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে? সেরূপ রচনা চিরস্থায়ী হয় না। সকল প্রাচীন জাতিই শিল্প ও সাহিত্য ইতিহাসের উপকরণ রাখে ; সাহিত্য লোক-পরম্পরায় স্মৃতির সাহায্যে রচিত হয়। শিল্পকীর্ত্তি সহজেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ভারতে সেরূপ উপকরণের অভাব ছিল না ; বরং তাহার প্রাচুর্য্যই ছিল। রাজনীতিক কারণে ও প্রাকৃতিক উপদ্রবে তাহার অনেকাংশ এখন নষ্ট হইলেও যাহা আছে, তাহা ইতিহাস রচনার পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। যখন কোন বহুকালব্যাপী সভ্যতা বিলুপ্ত হয়, তখনও তাহার সকল চিহ্ন পবনহিল্লোলের মত নিঃশেষ হইয়া যায় না ; পরন্তু শিল্পে ও সাহিত্যে এমন কি নিত্যব্যবহার্য্য গার্হস্থ্য দ্রব্যাদিতেও তাহার বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। আবার প্রতীচ্য-বিদ্‌গণ যে কোন অর্থে মিশরের ও রোমের, আসীরীয় ও মায়া প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার বিলোপের কথা বলেন, সে অর্থ বিবেচনা করিলে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা আজও সজীব। ভারতের ধূলি বহু রাজ্যের ধ্বংশাবশেষ সমষ্টি ; ভারতের সর্ব্বত্র ইতিহাসের উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ভারতের সাহিত্য বিরাট—বিপুল ; কত পুঁথি অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কত পুঁথি এখনও অনাবিষ্কৃত থাকিয়া আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় কত রহস্য সযত্নে রক্ষা করিতেছে ; আর যে সকল

পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সে সকলেরই সংখ্যা কত! আর কোন দেশে পূর্ব্বকালে এমন পরিপুষ্ট সাহিত্য ছিল না। আবার ভারতে স্তূপের ও মন্দিরের সংখ্যা নির্ণয় এখনও অসম্ভব বলা যায়। ইতিহাস-রচনা বিষয়ে স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের সাক্ষ্য সাহিত্যের সাক্ষ্য অপেক্ষাও অধিক আদরণীয়, অধিক প্রামাণ্য। প্রক্ষেপের ও সংশোধনের ফলে বহু ঐতিহাসিক মূল্য হ্রাস হইয়াছে। সাহিত্যে প্রক্ষেপ ও সংশোধন অর্থাৎ পরিবর্ত্তন সহজে ধরা যায় না। কিন্তু শিক্ষিত দর্শকের দৃষ্টি স্থপতির ও ভাস্করের কৃতকার্য্যে পরিবর্ত্তন সহজে লক্ষ্য করিতে পারে। পুরাতত্ত্ববিদ্ আলেকজাণ্ডার কার্নিংহাম সত্যই বলিয়াছেন, লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাবে, পুরাবস্তুসমূহই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রামাণ্য উপকরণ।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যে সকল জাতি আপনাদিগের বিবরণ ক্ষণবিধ্বংসী গ্রন্থপত্রে রক্ষা না করিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী প্রস্তরে বা প্রাসাদে রক্ষা করে, ইতিহাসের হিসাবে সে সকল জাতি ভাগ্যবান। পর্ব্বতের গাত্রে উৎকীর্ণ অনুশাসনসমূহ অক্ষয় অক্ষরে এদেশের ইতিহাস রক্ষা ও ঘোষণা করিতেছে। উড়িষ্যার গুহা-মন্দিরের কথায় হাণ্টার বলিয়াছেন, "ইতিহাসের এই সকল উপকরণ পর্ব্বতেরই মত অক্ষয়।" ভারতের সর্ব্বত্র ইতিহাসের এইরূপ উপাদান বিদ্যমান। ভারতে কোথায় মন্দির, স্তূপ, গুহা-মন্দির, অনুশাসন ছিল না? বর্ষার বারিধারা, শীতের শিশির, নিদাঘের সূর্য্যকর সে সকল নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই; ঝঞ্ঝাবাত, করকাপাত, বিজাতীয়ের ও বিধর্ম্মীর অত্যাচারও সে সকল লুপ্ত করিতে পারে নাই—কোথাও মৃত্তিকাতলে, কোথাও বনমধ্যে, কোথাও বা রূপান্তরিত হইয়া তাহারা আত্মরক্ষা করিয়াছে। সেই জন্যই তাহারা কালজয়ী। আমরা কয়টি দৃষ্টান্ত দিতেছি—বারাণসীর উপকণ্ঠে সারনাথে ও বাঙ্গালায় পাহাড়পুরে মৃত্তিকার নিম্নে যে সকল পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলে যথাক্রমে ভারতের ও বাঙ্গালার ইতিহাসে নূতন আলোক-সম্পাত হইয়াছে। আবার মহেঞ্জোদারোয় ও হরপ্পায় আবিষ্কারের ফলে কেবল ভারতীয় সভ্যতারই নহে, পরন্তু সমগ্র জগতের সভ্যতার ইতিহাসে নূতন তথ্য-সমাবেশ হইয়াছে। এ দেশে মুসলমান বিজয়ে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস হইয়াছে। বারাণসীতে ঔরঙ্গজেবের মসজিদে যেমন, গৌড়ের মুসলমান অট্টালিকায় তেমনিই হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে। মুসলমানরা কেহ কেহ হিন্দুদ্বেষী বলিয়া যে কাজ করিয়াছিলেন, ইংরেজরা তেমনই হিন্দু ও

মুসলমান কাহারও কীর্ত্তিনাশে বহুকাল দ্বিধানুভব করেন নাই। লকউড কিপলিং বলিয়াছেন, রাজপুতানায় প্রাসাদ পরিদর্শনকালে শুনিতে পাওয়া যায়, দিল্লীর মূর্ত্তিদ্বেষী দরবারের ভয়ে অনেক সময় প্রস্তরে ক্ষোদিত কারুকার্য্য আবৃত করিয়া রাখা হইত। যাযপুরে প্রাসাদ ও মন্দির ধ্বংসের জন্য হাণ্টার ইংরেজের নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন—"It was reserved for the English to put the finishing stroke of ruin to the royal and sacred edifices of Jujpur," লর্ড কার্জ্জন এ দেশে ইংরেজ কর্ত্তৃক বহু শিল্পকীর্ত্তি ধ্বংসের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এখনও এ দেশে ঐরূপ উপাদানের অভাব নাই। সেই সকল হইতে আমাদিগের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে। সে কাজ সহজ নহে, কিন্তু বাঙ্গালীর অবশ্যকর্ত্তব্য ; কারণ, জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহার অতীত ইতিহাসের মত পথনির্দ্দেশক আর নাই। সেইজন্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাসের' সমালোচনা করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বড় দুঃখে বলিয়াছেন—

—"এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধার কি অসম্ভব ? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমতাবান বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সবাকার অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্বারা আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণবাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক-শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে ভিক্ষামুষ্টি দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।"

কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার সূচনা দেখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন এবং লেখকদিগকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন, রাজকৃষ্ণবাবুর পুস্তক—"ভিক্ষামুষ্টি হউক, কিন্তু সুবর্ণের

মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বঙ্গ-ভাষায় দুর্লভ। সেইসকল কথার মধ্যে কতকগুলি নূতন এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে। ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।"

কেবল রাজাদিগের কথাও যে ইতিহাস নহে—জনগণের কথাই ইতিহাস, তাহা ভলটেয়ার বলিবার পর তাহাই ইতিহাসের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"গ্রীণলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরিজাতির ইতিহাসও আছে; কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধ-চরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়াচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শম্যান, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি: সে কেবল সাধপূরণ মাত্র।" প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য ঐ সকল পুস্তক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙ্গালার একখানি স্বল্লায়তন ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র বটব্যালকে তিনি উহা দেখিতে দিলে উমেশবাবু উহাতে মৌলিকতার ও গবেষণার অভাবসঞ্জাত ত্রুটির উল্লেখ করিলে, রমেশবাবু আর উহা প্রচার করেন নাই।

বাঙ্গালী যে গৌরবশূন্য নহে, বাঙ্গালার ইতিহাস যে জাতীয় গৌরবস্মৃতি-সুরভিত, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র পুনঃপুনঃ বুঝাইয়াছেন—"বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যবিস্তার; চৈতন্যের ধর্ম্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য আরও তো জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?"

বাস্তবিক বাঙ্গালার ইতিহাসে সার কথার অভাব নাই। বাহুবলে ও মানসিক ক্ষমতায় বাঙ্গালী এক সময়ে জয়ী হইয়াছিল। সিংহল-বিজয় এখনও

কিম্বদন্তীর সীমা লঙ্ঘন করিয়া ইতিহাসের রাজ্যে স্থানলাভ না করিলেও যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপে বাঙ্গালীর উপনিবেশ সংস্থাপনের কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। যবদ্বীপে প্রচলিত হিন্দু অব্দ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে আরব্ধ; সুতরাং তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালী যবদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। কালিদাসের কাব্যে দেখা যায়, বাঙ্গালীর কাপুরুষ অখ্যাতি ছিল না, বাঙ্গালীরা দিগ্বিজয়ে বহির্গত রঘুর সেনাবলের সহিত জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধমতের প্রচারকার্য্যে বাঙ্গালী প্রচারকগণ হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে শিল্প ও সভ্যতার বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। শিল্পে ও বাণিজ্যে বাঙ্গালী তখনও নিপুণ ছিল। গৌড়ের চিত্রিত ইষ্টক আজিও অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ইংরেজাধিকারের প্রথমাবস্থায়ও গৌড়ের অট্টালিকাদি হইতে গৃহীত প্রস্তর ও এই ইষ্টক লইবার জন্য দুই জন স্থানীয় জমিদার নিজামত দপ্তরে বার্ষিক আট হাজার টাকা খাজনা দিতেন। ঢাকার সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র য়ুরোপে ধনীদিগের আদর লাভ করিত। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে শেখভিক পারস্য উপসাগরের পথে যে রাসিয়ায় তিনখানি মালবাহী জাহাজে মালদাই বস্ত্র বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। বাঙ্গালায় কান্তনগরের মন্দিরের কারুকার্য্য ও রচনানৈপুণ্য বিস্ময়কর। বার্ণিয়ার প্রভৃতি বিদেশীয়দিগের বর্ণনায় দেখা যায় —বঙ্গদেশে ধান্য ও অন্য বহুবিধ শস্য, রেশম, কাপাস, নীল প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। বাঙ্গালায় যে ধান্য উৎপন্ন হইত, তাহাতে বাঙ্গালীর ব্যবহার্য্য অংশাতিরিক্ত ভাগ জলপথে গঙ্গাতীরে পাটনা পর্য্যন্ত ও সাগরকূলে মৌছলীপট্টমে রপ্তানী হইত। এমন কি বাঙ্গালা হইতে সিংহলে ও মালদ্বীপেও চাউল প্রেরিত হইত। বাঙ্গালা হইতে কর্ণাটে, মোকা ও বসোরার পথে আরবে, মেসোপোটেমিয়ায় (বর্ত্তমান ইরাক) এবং বন্দর আব্বাসের পথে পারস্যে (বর্ত্তমান ইরান) শর্করা প্রেরিত হইত। যে রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত, তাহার পরিমাণ বিস্ময়কর। এইসকল পণ্য কাবুলে, জাপানে ও য়ুরোপে প্রেরিত হইত। জলপথবহুল বাঙ্গালায় নানা প্রয়োজনানুসারে নানারূপ মালবাহী ও যাত্রীবাহী নৌকা নির্ম্মিত হইত। ঢাকা হইতে প্রতি বৎসর রাজস্বের অংশরূপে দিল্লীতে নৌকা প্রেরিত হইত। বাঙ্গালা সাহিত্যও প্রাচীন। বৌদ্ধ হইতে বৈষ্ণব নানা ধর্ম্মমত বঙ্গদেশে উদ্গত হইয়াছে এবং বাঙ্গালীর ও অন্যান্য জাতির ইতিহাসে স্থায়ী প্রভাব রাখিয়াছে।

বাঙ্গালীর ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস—কীর্ত্তির বিবরণ। সে ইতিহাস লিখিত হইলে বাঙ্গালী আপনার পূর্ব্ব-গৌরবের কথা জানিতে পারিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যে জাতির পূর্ব্ব-মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেন্‌হিম ও ওয়াটার্লু—ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালী মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"

যখন বাঙ্গালী বিদেশীর লিখিত স্বজাতির হীনতার কাহিনী ইতিহাস বলিয়া পাঠ করিত, তখন বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বলিলেন,—সে সকল গ্রন্থকে "আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি,—সে কেবল সাধ-পূরণ মাত্র।" এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কেহ বলেন নাই। যে সময় তিনি এই কথা বলেন, তখন বিজ্ঞবর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের যশঃ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু তিনিও তাঁহার স্বদেশবাসীকে এমনভাবে বলেন নাই—বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রয়োজন; বাঙ্গালীর উন্নতির জন্য বাঙ্গালীর ইতিহাস সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। বাঙ্গালীর জড়ত্বশাপাভিভূত জাতীয় জীবনের ইতিহাসহীন তমিস্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের তূর্য্যনিনাদে প্রথম ঘোষিত হয়—বাঙ্গালীর ইতিহাসের আলোচনা করিলে বাঙ্গালী আপনার গৌরবকথা জানিতে পারিবে, আপনার উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশ হইবে না, আপনার হৃত-সম্পদ পুনরার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে। সে বুঝিবে—"আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কৈ? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ীরীতি—এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কৈ?" বাঙ্গালীকে সেই নিদর্শন সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার শিক্ষাতীক্ষ্ণ প্রতিভা লইয়া বাঙ্গালা ভাষার সেবায়—বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ইংরেজী

শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালাকে অসার বলিয়া বিবেচনা করিত। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অনাদৃত বাঙ্গালার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন—জীবন উৎসৃষ্ট করেন। তখন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর ধারণা তিনি "বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্দরে" চিত্রিত করিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বলিতেন—"কি জান—বাঙ্গলা-ফাঙ্গলা ওসব ছোটলোকে পড়ে, ও সবের আমাদের মাঝখানে চলন নেই। ওসব কি আমাদের শোভা পায়?" বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারণা ঘুচাইয়া বাঙ্গালীকে আপনার মাতৃভাষায় অনুরাগী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে গর্ব্বিত করিয়া তুলিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে সাহিত্যের সকল বিভাগের দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইয়াছিল। বিজ্ঞানের রহস্যও তিনি বাঙ্গালী পাঠকের গোচর করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ইতিহাসের জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল। তিনি বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীদিগের জন্য সে পথও মুক্ত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। কেবল আগ্রহ জাগাইয়া—কেবল উৎসাহ দিয়াই তিনি নিবৃত্ত হয়েন নাই; পরন্তু কিরূপে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়—কিরূপে তাম্রশাসনের ও উৎকীর্ণলিপির অত্যুক্তির ফেনপুঞ্জের তলে প্রকৃত ঘটনার স্বচ্ছ প্রবাহ আবিষ্কৃত করিতে হয়, কিরূপে সত্যাসত্যের মিশ্রণ হইতে সত্য বাছিয়া লইতে হয়, কিরূপে বিশ্লেষণের ও সংগঠনের সহায়তায় ইতিহাসের উদ্ধার করিতে হয়, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' ও 'প্রচারে'—বিশেষ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ কয়টিতে ("বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার", "বাঙ্গালার কলঙ্ক", "বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ" প্রভৃতি) তিনি ইতিহাসের অনেক নূতন কথা বলিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যায় "পত্র সূচনার" পরেই—প্রথম প্রবন্ধে—"মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল।" 'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ক অপনোদিত হয়। আরম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরদিন দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন,

এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে কথাটি কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র ; চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক। এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না।* * * বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা ও চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।"

বাঙ্গালীর বাহুবলের, তেজস্বিতার ও বিজয়ের অনেক দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষেপে তাঁহার রচনার মধ্যে প্রদান করিয়াছিলেন ; সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান বাঙ্গালীর ইতিহাস লেখকের কার্য্য।

'বঙ্গদর্শনে' ও 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র কয়টি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া ঐতিহাসিক রচনার রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে' সেইগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার সময় তিনি লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল ; তাহার দর বেশী নয়। এক সময় ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য 'বঙ্গদর্শনে' বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতি দিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর

বেশী। দর বেশী হউক, বা না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনারূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ,—আমি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না।"

এইরূপ প্রগাঢ় বিনয় ও আন্তরিক আক্ষেপোক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়াছেন—"কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না।" বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধার সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় নাই। বিলম্বে হইলেও তাঁহার উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইতেছে। বাঙ্গালার ইতিহাস ব্যতীত বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে না—এ কথা বুঝিয়া বাঙ্গালী বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়াছে।

একান্ত পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালার ইতিহাস-চর্চ্চার দুর্ব্বল প্রারম্ভ মৃত মহাত্মাদিগের—বিশেষতঃ পথপ্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্রের অযথা নিন্দায় কলঙ্কিত হইয়াছে। নদীর স্রোতও যদি কোন বাধাহেতু বহুদিন রুদ্ধগতি হইয়া থাকে, তবে তাহা যেদিন বাধা অতিক্রম করিয়া বাহির হয়, সেদিন প্রমত্ত বেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়াই প্রবাহিত হয়। আমাদিগের আশা, বাঙ্গালার বহুদিন রুদ্ধগতি ইতিহাস-চর্চ্চা সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারিব। সেই অবস্থায় স্রোতের আবিলতা, বেগের আধিক্য ও বীথিবিভঙ্গের চাঞ্চল্য অতিরিক্ত হওয়া বিস্ময়কর নহে। কিন্তু সেই আধিক্যের মধ্যেই ভবিষ্যৎ স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। নহিলে বাঙ্গালায় নূতন ইতিহাস আলোচনার প্রারম্ভ মৃত মহাজনদিগের প্রতি অসম্মানের যে প্রগাঢ় কলঙ্ক কালিমায় কলুষিত, তাহা একান্ত অসহনীয় বেদনার কারণ হয়। আমরা আশা করি, যখন বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনার স্রোত আপনার প্রকৃত পথ নির্ণয় করিয়া সেই পথে প্রবাহিত হইবে, তখন আরম্ভের এই চাঞ্চল্য—এই আতিশয্য আর থাকিবে না,—তখন প্রবাহ সর্ব্ববিধ আবিলতামুক্ত ও দ্বেষহিংসার আবর্জ্জনা বর্জ্জিত হইয়া প্রবাহিত হইবে—বাঙ্গালীর উপকারসাধনই করিবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিপদের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়াছে। সম্প্রদায়-বিশেষের সন্তুষ্টিসাধন চেষ্টা কোন কোন স্থলে ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতিসাধনে লেখকদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে, দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ঐতিহাসিক যদি

সর্ব্বদা ক্রমওয়েলের সেই কথা স্মরণ না রাখেন—Paint me as I am—আমি যেরূপ আমাকে ঠিক সেইভাবেই চিত্রিত কর, তবে তাঁহার রচনা আদর লাভের উপযুক্ত হয় না। ইংরেজদের লিখিত ভারতের ইতিহাসে যে এইরূপ বিপদ আছে, তাহা ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধক্ষেত্রে (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী) শিখদিগের নিকট ইংরেজের পরাভবের কথায় বলিয়াছেন—"On the fatal field of Chilianwala, which British patriotism prefers to call a drawn battle, the British lost 2,400 officers and men, four guns and the colours of the regiments." বৃটিশের দেশপ্রেম ইহাকেও পরাভব বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। জাহাঙ্গীরের নির্ম্মম অত্যাচারের আলোচনা না করিলে যেমন শিখ সম্প্রদায়ের উদ্ভবের, তেমনই ঔরঙ্গজেবের হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের আলোচনা না করিলে মোগল সাম্রাজ্যনাশের কারণ বুঝিতে পারা যায় না। ঐতিহাসিক সত্যসন্ধ না হইলে তাঁহার রচনার মূল্য থাকে না। যে ঐতিহাসিক লেখক ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের তুষ্টিসাধনের জন্য সত্যের অপলাপ করিতে পারেন, তিনি তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যখন বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিতে শিখান—সে সময়ের অবস্থার আভাস পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। দেশ-প্রেমিক যে ভালবাসায় দেশকে ভালবাসেন—বাঙ্গালী তখন বাঙ্গালাকে সে ভালবাসায় ভালবাসিত না; তখন বাঙ্গালী বাঙ্গালাকে "সোনার বাঙ্গালা" মনে করিত না; তখনও বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জল সে পুণ্যময় বিবেচনা করিত না। বাঙ্গালাকে বাঙ্গালী তখনও বলিতে পারিত না—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।" কেবল বাঙ্গালায় নহে—সমগ্র ভারতে তখন বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে ও বিদেশী সভ্যতার আকর্ষণে হিন্দু, বিদেশী লেখকদিগের রচনায় আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের—আপনার অতি প্রাচীন সভ্যতার —আপনার পরিপুষ্ট সাহিত্যের নিন্দাবাদ শুনিত এবং শুনিয়া বিশ্বাস করিত। য়ুরোপীয়গণ অবজ্ঞাভরে বলিত, যে হিন্দু ষড়-দর্শনের রচয়িতা, সে হিন্দু কেবল অনুকরণে পটু; যে হিন্দু স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথম আদর্শ গঠিত করিয়াছিল, সে হিন্দুর পক্ষে পরাধীন থাকা ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনমাত্র নহে—পরন্তু একান্ত স্বাভাবিক; যে হিন্দু ধর্ম্মের সার সত্যের আলোচনার জন্য সাংসারিক সকল সুখ অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছে, সে হিন্দুর ধর্ম্ম কুসংস্কারের আবর্জ্জনামাত্র। হিন্দু তাহাই বিশ্বাস করিত। য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞরা বলিতেন, আলেকজাণ্ডারের বিজয়বাহিনী ভারতে আগমনের পূর্ব্বে ভারতবাসীরা প্রস্তরে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিত না,—ভারতবাসীরা চিত্রবিদ্যায় নৈপুণ্যলাভ করিতে পারে নাই। ইতিহাসের অভাবে ভারতবাসী তাহাই বিশ্বাস করিত। সুধী রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই সকল ভ্রমাত্মক উক্তির ভ্রমাপনোদনকল্পে চেষ্টা করিতেছিলেন—বিদেশীয় লেখকদিগের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু একে বিষয়টি সর্ব্বজনবোধ্য নহে, তাহাতে আবার রচনা ইংরেজীতে—বিশেষজ্ঞদিগের জন্য; সাধারণ পাঠক-সম্প্রদায় তাহার আভাসও পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার জনগণকে সেইকথা বুঝাইবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন—সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে, দেশকে ও দেশবাসীকে, দেশের ও জাতির কীর্ত্তি ভালবাসিতে শিখান। রমেশচন্দ্র দত্তের একখানি

পুস্তকের সমালোচনা করিতে যাইয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—"যে মনুষ্য জননীকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্যমধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতিমধ্যে হতভাগ্য।"

বাঙ্গালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্য তিনি নানা গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন "অশ্বত্থ, কদম্ব, আম্র, খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত" —কোকিল, দয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি বিহগের বিরামপূরিত উপবনবহুল তটযুগ মধ্যবর্ত্তী শীর্ণশরীরা চিত্রার মন্দগতি রচনায় চিরস্থায়ী করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই সমুদ্রের ভীষণ সুন্দর রূপের বর্ণনা করিয়াছেন—"সম্মুখেই সমুদ্র! অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমলকুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনারেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ; নীলজলমণ্ডল-মধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমন প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগর-তরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে।" আবার 'শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত' নিশীথে গঙ্গার ও গঙ্গাতটের বর্ণনা—"জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে সিকতাশ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল চন্দ্রকরে প্রগাঢ়-তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘনশ্যাম, —উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতিজ্ঞানে কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত; যতদূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট-দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; তন্মধ্যে তারকার মালা অনন্ত সংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে?"

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে বর্ত্তমান প্রস্তাবের লেখককে বলিয়া-ছিলেন—বহু বিদেশী পর্য্যটক কেবল স্বভাবের শোভা-সন্দর্শনের জন্য দেশ-ভ্রমণ করেন। বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের অনেকে সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ্য করেন,

বলিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালার ভূমি সাধারণতঃ অনুদ্ঘাতিনী হইলেও— বাঙ্গালায় কি সৌন্দর্য্যের অভাব আছে? গাঢ় হইতে শ্বেতাভ পর্য্যন্ত নানাবিধ হরিৎশস্যক্ষেত্র কি নয়নের সম্মুখে মনোরম শোভাময় চিত্র উপস্থাপিত করে না? যখন হরিদ্রাবর্ণ সর্ষপ কুসুম হরিৎক্ষেত্র ছাইয়া ফেলে, আর পবনহিল্লোলে সেই স্বর্ণশীর্ষ হরিৎক্ষেত্র যেন দুলিতে থাকে, তখন কি বোধ হয় না, সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ বহিতেছে? সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, একবার নদীপথে খুলনা জিলার কোন স্থানে যাইতে তিনি কূলে সুপারী বৃক্ষের যে কুঞ্জ দেখিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য্য ভুলিবার নহে।

'সীতারামে' তিনি উড়িষ্যার স্থানবিশেষের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে সমভাবে প্রযোজ্য—"চারিদিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া— হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী। তাহার উপর, মাতার অলঙ্কারস্বরূপ, তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ; সরল সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীল-সলিলা বিরূপা, নীল পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে।" টেনিশন যাহাকে "The slender coco's drooping crown of plumes" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সুপারীতে যত সুন্দর—তালবৃক্ষে—এমন কি নারিকেল বৃক্ষেও তত সুন্দর নহে।

এবরীম্যাকে তাঁহার 'ভারতে ২১ দিন' পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"Everything is steeped in repose. The bees murmur their idylls among the flowers; the doves moan their amorous complaints from the shady leafage of the pipal trees; out of the cool recesses of wells the idle cooing of the pigeons ascends into the summer laden air; the rainbow-fed chameleon slumbers on the branch; the enamelled beatle on the leaf; the little fish in the sparkling depths below the radiant kingsfisher, tremulous as sunlight, in mid-air.'

আকাশে দিবাভাগে সূর্য্যকর—রাত্রিকালে নক্ষত্রের শোভা। শরতে শ্যাম প্রান্তরে—নীল সমুদ্রে শ্বেত ফেনপুঞ্জের মত কাশ-কুসুমের শোভা; বসন্তে অশোক পলাশ প্রভৃতির কুসুমে বর্ণদীপ্তি; আবার নিদাঘে শিমুল ও মন্দারের কুসুমসুষমা;

যূথী, বেল, বকুল প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ; টগর, শেফালী প্রভৃতি ফুলের প্রাচুর্য্য—এ সব এই দেশকে সুন্দর করিয়াছে। নদীবহুল বঙ্গদেশে গঙ্গা ও পদ্মার মত বৃহৎ ও পরিপূর্ণ-প্রবাহ নদী হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্রা, ইচ্ছামতী, কপোতাক্ষী প্রভৃতি বহু নদীর প্রবাহ; আর নানা স্থানে বিস্তীর্ণ তড়াগে শ্বেত ও রক্তাভ পদ্মের পার্শ্বে শ্বেত ও লোহিত কুসুমের পুষ্প বিকাশ; সর্ব্বত্র জলচরসঞ্চারচঞ্চলিত স্নিগ্ধনীল-পরিশর বিলের জলরাশি হ্রদের মত শোভাময়। বাঙ্গালা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্যে সম্পদশালী।

এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঙ্গালী বাহুবলের ও মনীষার অনুশীলন করিয়াছিল। প্রথমের প্রকাশ—দিগ্বিজয়ে; দ্বিতীয়ের প্রকাশ—শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে। বাঙ্গালীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। বাঙ্গালার স্থাপত্য তাহার বহু মন্দিরে এখনও লক্ষিত হইবে। সেই সকল বহুচূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের কারুকার্য্য লোকের প্রশংসা আকৃষ্ট করে। বাঙ্গালায় প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য, সেইজন্য প্রস্তরে ক্ষোদিত কাজের স্থানে চিত্র-বিচিত্র ইষ্টক ব্যবহৃত হইত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার হ্যাভেলের "ভারতে শিল্প-শিক্ষা" সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ বিলাতের "শোসাইটী অব আর্টসে"র এক অধিবেশনে পঠিত হয়। তাহাতে তিনি এই ইষ্টকের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় কতকগুলি সরকারী গৃহ নির্ম্মিত হয়, এবং সে সকলের শোভা সম্পাদন জন্য ইংলণ্ড হইতে লক্ষ টাকায় কতকগুলি মৃৎমূর্ত্তি প্রভৃতি আনীত হয়। সেই মৃৎমূর্ত্তিগুলি এমন নহে যে, সেগুলিতে এ দেশের শিল্পীরা আদর্শ লাভ করিতে পারে। অথচ ঐ টাকায় বাঙ্গালায় সেই ইষ্টক-শিল্প পুনরুজ্জীবিত করিলে সরকারী গৃহগুলির সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইত। "Now Bengal is a great brick-making country, and there once existed a beautiful Art in moulded brick-work, still to be seen in old buildings in many parts of the Province. If a lac of rupees had been spent in reviving this decayed art, public buildings in Calcutta would have had far better ornament and an old industry might have been revived." বাঙ্গালার ভাস্কর্য্যেরও বৈশিষ্ট্য আছে—বাঙ্গালার কুম্ভকার যে দেব-দেবীর প্রতিমা গঠিত করে, তাহার সৌন্দর্য্য যেমন বিস্ময়কর, বাঙ্গালা দেশে প্রস্তরে ক্ষোদিত মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যও তেমনই।

সার উইলিয়ম উইলকক্স মত প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালার বহু নদী বাঙ্গালীর

দ্বারা খনিত—জলপ্রবাহপথ। এই কার্য্যে বাঙ্গালীর অসাধারণ নৈপুণ্যপরিচয় আজও বিষ্ণুপুরে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের সেচের ব্যবস্থা তাহার মন্দির অপেক্ষাও বিস্ময়কর। বার্ণিয়ার মোগল শাসনকালে এ দেশে আসিয়া বাঙ্গালার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

বাঙ্গালায় এত চাউল ও চিনি উৎপন্ন হয় যে, উভয়বিধ খাদ্য স্বদেশের প্রয়োজন নিবৃত্ত করিয়াও বিদেশে প্রেরিত হয়। শর্করা ব্যতীত বঙ্গদেশে আরও বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালায় যে পরিমাণ কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাতে বাঙ্গালাকে বস্ত্র বিষয়ে কেবল হিন্দুস্থানের বা কেবল মোগল সাম্রাজ্যের বাণিজ্যকেন্দ্রই নহে—ভারত-প্রতিবেশী দেশসমূহেরও বাণিজ্যকেন্দ্র বলা যায়। কেবল হল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা বাঙ্গালা হইতে সকল দেশে—বিশেষ জাপানে ও য়ুরোপে—যে পরিমাণ শ্বেত ও রঞ্জিত, মিহি ও মোটা—সকল প্রকার কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী করে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ীরাও এই ব্যবসা করে। রেশমী কাপড় সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। কাশীমবাজারে রেশমের কুঠীতে কেবল ডাচ-ব্যবসায়ীরাই সময় সময় সাত হইতে আট শত শ্রমিক নিযুক্ত করে। বাঙ্গালায় বিবিধ ফলের চাষ হয় এবং মোম, লাক্ষা প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় কূল হইতে বহুদিন পূর্ব্বে জলের ও পণ্য-বহন সুবিধার জন্য বনগ্রামে খনিত অসংখ্য খাল জলে প্রবাহিত।

ইহাতেই বুঝা যায়, বাঙ্গালী কেবল প্রাকৃতিক সম্পদেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া আপনার চেষ্টায় সেই সম্পদ সুপ্রযুক্ত করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। পণ্যোৎ-পাদনের সঙ্গে সঙ্গে পণ্য-বিক্রয়ের প্রয়োজনে জলযান নির্ম্মিত হইত এবং সেই সকল জলযানে বাঙ্গালী নাবিকরা বিদেশে পণ্য লইয়া যাইত।

বাঙ্গালী এই দেশের জন্য গর্বিত ছিল। "শিশু মা'র কোলে উঠিলে মা'কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে।"

বাঙ্গালীর জন্মভূমি জননী সত্য সত্যই অসামান্যা সুন্দরী। এই দেশে জাত ও বর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গালী যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার কীর্ত্তি-কথা বুঝিত এবং বুঝিয়া কুলগৌরবে গৌরবানুভব করিত।

এ দেশ "লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে।" এই দেশের পূর্ব্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপে বর্ণিত করিয়াছেন—"সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না, সর্ব্বাভরণ-

ভূষিতা, জগদ্ধাত্রী”—“ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুগুলি পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।” এ মূর্ত্তি দেখিয়া কে না ভক্তিভরে প্রণত হইবে?

মধ্যে—মুসলমান শাসনের শেষ দশায় যখন শাসক স্বার্থপরতাপ্রাবল্যে শাসিতের সুখ-দুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়াছিলেন, সে সময়ের কথা বঙ্কিমচন্দ্র “সন্তান-সম্প্রদায়ের” ভবানন্দের কথায় বলিয়াছিলেন—“কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উই মাটী খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণা-বেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল—এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়।” সে সময় দেশের দুর্দ্দশার চরম অবস্থা হইয়াছিল। দেশের সে সময়ের রূপ—“কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না—কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, সেইজন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কাল-মালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।”

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, আর বুঝিয়া বুঝাইয়াছিলেন—মুসলমান শাসনের অন্তিম দশায় যে অন্ধকার দেশ আবৃত করিয়াছিল, তাহা অচিরে অপসৃত হইবে, আবার দেশবাসীর চক্ষুতে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইবে; দেশে অশান্তির অবসান হইলে—সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিলে দেশের অন্য রূপ হইবে। “মা যা হইবেন”—তাহার বর্ণনা এই রূপ—“দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী—শত্রুবিমর্দ্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।”

এ-ই আমাদিগের দেশ—স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী জন্মভূমি। ইহার জন্য বাঁচিয়া-সুখ—মরিয়াও সুখ। দেশের এই রূপ ধ্যান করিতে করিতে কে “সন্তান

সম্প্রদায়ের সঙ্গে, আর সেই সন্তান-সম্প্রদায়ের দীপকাশ্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে উচ্চারণ করিবে না—"বন্দে মাতরম্'' ?

[illegible] যুগে যখন বাঙ্গালী "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, সেই সময়ে কবি গাহিয়াছিলেন—

'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি
রেখ-রেখ হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী ছলে
অনিলে মলয় সদা বহমান।'

দেশবাৎসল্য পরম ধর্ম্ম। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—তাঁহার সময় দেশ-বাৎসল্য বিরল ছিল। "তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশ-বাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশ-বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ-বাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ-বাৎসল্য তাঁহাদের মত চমকপ্রদ না হইলেও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্নের কয়েক ছত্র পদ্য আশা করি সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।''

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয় জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয় জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়া আদর করিতেন।

এই দেশ-বাৎসল্যের—এই পরমধর্ম্মের সাধনা সহজসাধ্য নহে। সে সাধনা কত কঠোর, সে জন্য কত ত্যাগের প্রয়োজন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' দেখাইয়াছেন। মানুষ একান্ত আপনার জনের জন্যই দুষ্কর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। জননী, ভগিনী, পত্নী, দুহিতা—ইঁহাদিগের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ

করিতে বা গৌরব বর্দ্ধিত করিতে মানুষ মরিতে ভয় করে না। দুই কালের দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমের জনসাধারণ ক্ষমতাগর্ব্ব-প্রমত্ত ভয়-জয়ী কর্ম্মচারীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই অত্যাচার নিবারণের উপায় সন্ধান পাইতেছিল না। শেষে এপিয়াস ক্লডিয়াস যখন দরিদ্র ভার্জ্জিনিয়াসের দুহিতার অপমান করিতে উদ্যত হইল এবং পিতা অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য কন্যা ভার্জ্জিনিয়াকে স্বহস্তে নিহত করিল, তখন কন্যাহন্তা পিতা ভার্জ্জিনিয়াসের ও সেই কন্যার বাক্‌দত্ত পতি আইসিলিয়াসের চেষ্টায় দেশে যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হইল, তাহাতেই রোমের জনসাধারণের দৌর্ব্বল্য ও দুর্দ্দশা ভস্মীভূত হইয়া গেল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা আয়ার্লণ্ডের দুঃখ বিমোচনকল্পে চেষ্টিত হইয়া স্বার্থত্যাগের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, চার্লস ষ্টুয়ার্ট পার্ণেল তাঁহাদিগের অন্যতম নেতা ছিলেন। পার্ণেল যখন বিদ্যার্থী সেই সময় কতকগুলি বন্দীর সন্ধানে আসিয়া পুলিস তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে এবং তাঁহার জননীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। সেই কথা শুনিয়া বিদেশী শাসক ইংরেজের প্রতি পার্ণেলের রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সেই ঘটনায় তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য স্থির হইয়া যায়—আয়ার্লণ্ডকে স্বায়ত্তশাসনশীল করিতে হইবে।

লোকচরিত্রাভিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, দেশকে একান্ত আপনার না ভাবিতে পারিলে তাহার জন্য কঠোর সাধনা সম্ভব হয় না—দুষ্কর কার্য্যে সাফল্য-লাভ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং দেশবাসীকে দেশ-বাৎসল্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের মনে—দেশ যে একান্ত আপনার সেইভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

এ জগতে মানুষের কে সর্ব্বাপেক্ষা আপনার? জগতের সহিত যখন আমাদিগের প্রথম পরিচয় হয় তখন—সেই শৈশবে—যখন আমরা সকল বিষয়ে পরনির্ভরশীল, পদে পদে অপরের সাহায্যে নির্ভর করি, যখন ক্রন্দন ব্যতীত আমাদিগের আর ভাষা থাকে না, তখন জননীই হৃদয়সুধায় আমাদিগকে রক্ষা ও পুষ্ট করেন। সেইজন্য কবি সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"নিজ-অঙ্গ-অংশ দিয়া
এই তনু নিরমিয়া
চিত হ'তে দিয়া চিত—দীপে দীপ প্রায়

আমায় সৃজেন যিনি
ধাতার স্বরূপ তিনি ;
জীব-দেহ ব্রহ্মাণ্ড সমান তুলনায়।"

এই জননীর মত একান্ত আপনার আর কে আছেন? আর কেহ নাই বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে শিখাইলেন—মাতৃভূমি মা। তিনি বাঙ্গালীকে বলিতে শিখাইলেন—"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই মা।"

মনীষী অরবিন্দ বলিয়াছেন—জাতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য—তিনি আমাদিগকে মাতৃমূর্ত্তি দিয়াছেন। মাতৃভূমির নূতন মনীষাগত ধারণা মানুষকে প্রেরণা দান করিতে পারে না; কেবল স্বাধীনতার বাঞ্ছনীয়তা মানুষকে উৎসাহ-প্রণোদনা প্রদান করিতে পারে না। আজ এ দেশে সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবাসীই স্বীকার করেন—জন্মভূমি আমাদিগের নিকট কর্ত্তব্য দাবী করিতে পারেন। কিন্তু যখন জন্মভূমির দাবীর সহিত অন্যান্য দাবীর সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন অনেকেই মাতৃভূমির দাবীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য হইলেও এ স্বাধীনতালাভের জন্য কষ্ট করিবার আগ্রহ সকলের থাকে না। আমরা অন্য অনেক পাত্রকে অধিক প্রিয় বিবেচনা করি। মাতৃভূমি যতক্ষণ আমাদিগের মানসনেত্রে ভূমিখণ্ড বা লোকসমষ্টি ব্যতীত অন্যরূপে প্রতিভাত না হয়েন—যতক্ষণ তিনি স্বর্গীয় মাতৃত্বে, শক্তিতে, অনন্ত সৌন্দর্য্যে আমাদিগের চিত্ত অধিকার না করেন, ততক্ষণ জননীর জন্য ও জননীর সেবার আগ্রহের জন্য সকল ক্ষুদ্র ভয় ও আশা দূর হইয়া যায় না—ততক্ষণ যে দেশপ্রেম অসাধ্যসাধন করে ও অভিশপ্ত জাতির উদ্ধারসাধন করে, সে দেশপ্রেম উদ্ভূত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র মা'কে সেই রূপে দেখিয়াছিলেন ও দেশ-বাসীকে দেখাইয়াছিলেন। সমগ্র জাতি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত যাঁহার সাধনা একাগ্র, তাঁহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বলিতে পারিয়াছিলেন, একদিন সমগ্র দেশে "বন্দে মাতরম্" গীত হইবে। সেকথা সত্য হইয়াছে। দেশ "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে; বাঙ্গালার একপ্রান্তে রচিত এই মন্ত্র সুদূর মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধিতোরণেও উৎকীর্ণ হইয়াছে। আজ আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃস্তুতির উদাত্ত সঙ্গীতে মুখরিত হইতেছে—

বন্দে মাতরম্ ।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে !
বাহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্ ।
শ্যামলাং, সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞবর প্লেটো বলিয়াছিলেন—"যে-ব্যক্তি তাহার (পিতৃপুরুষের) ধর্ম্মকে লোকের দৃষ্টিতে হেয় করিবার চেষ্টা করে—প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত শাস্তি।" আর বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যে মনুষ্য জননীকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্য মনুষ্যমধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতিমধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি।"

বহু যুগের ব্যবধানে মনুষ্যসমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত এই দুই জন মনীষীর কথায় আমরা কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না; কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ প্রেমকেও ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পুস্তকে বুঝাইয়াছেন—

"সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।"

দেশজননী—স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী, এই কথা তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন—ইহাই জাতিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। কেবল জন্মভূমি বলিলে মানুষের মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না; কিন্তু এই মৃন্ময়ী জননীতে যখন আমরা চিন্ময়ী মাতাকে দেখিতে পাই, তখনই স্বদেশের জন্য বাঁচিতে ইচ্ছা হয়, দেশের সেবা করিতে আগ্রহ জন্মে, মনে হয়—দেশের জন্য মরিয়াও সুখ।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকালে তাঁহার দেশপ্রেম প্রচারের জন্য আবশ্যক পরিবেষ্টন সৃষ্ট হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশপ্রেম বিস্তারলাভ করিতেছিল।

'বঙ্গদর্শনের' দ্বিতীয় ভাগে (১৮২০ বঙ্গাব্দে) অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'দশমহাবিদ্যা' প্রবন্ধে ভারতের দশ দশার সহিত দশমহাবিদ্যার সামঞ্জস্য প্রদর্শন-প্রচেষ্টায় লিখিয়াছিলেন—তন্ত্র-প্লাবনের পর ভারতমাতার এক্ষণে ধূমাবতীর দশা—"ভারত জীর্ণ, ভারত শীর্ণ, ভারত মলিন, ভারত চিন্তায় আকুল।" আজ—

"বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই; রুক্ষ কেশ, রুক্ষ গাত্র; দন্ত বিরল হইয়াছে; শোকে তাপে দৃষ্টি কুটিল হইয়াছে, যেন সকল আশ্রয়পরিচ্যুতা হইয়া পুরাতন ভগ্নযান থের গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন; হায়! সেই রথের উপর কাক

বসিতেছে। * * * * দেখ দেখি, সোনারপুরী কি হইয়াছে? ভুবনেশ্বরী এখন পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছেন।”

কিন্তু তিনি—তাঁহার গুরুস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্রেরই মত—ভবিষ্যতের অন্ধকারের পরপারে আবার আলোক লক্ষ্য করিয়াছিলেন—সেই আলোকে তিনি মা'র মহালক্ষ্মীরূপ দেখিয়াছিলেন—

‘সুবর্ণ সুবর্ণবর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥
চতুর্দ্দিস্থ চারি শ্বেত-বারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥’

ভারতমাতার যুগযুগান্তরের মলরাশি শ্বেত হস্তিগণ অমৃতবারি সিঞ্চনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান করিতেছেন। আহা কি শুভদিন! শরীর রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দে জয়ধ্বনি কর।”

সেই সময়ে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ‘হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা’ পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি বলেন—

“আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনই পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্মের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। * * * আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল-পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্ত্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।”

এই আশায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতের জয়’ উচ্চারণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছিলেন—

“মিলে সব ভারতসন্তান
এক তান মনঃপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান—
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?

ফলবতী বসুমতী
স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিদান।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়;
গাও ভারতের জয়—
কি ভয়, কি ভয়—
গাও ভারতের জয়।"

হেমচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অই দেখ সেই মাথার উপরে—
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত
পুরাকালে তা'রা যেরূপ ছিল।
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম
হিন্দু-বীরদর্প বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর-জঙ্গম
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?
সকল(ই) ত আছে, সে সাহস কই?
সে গভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই?
ভুলিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা।"

সেই মহিমার পুনরুদ্ধারসাধন করিতে—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে
স্বধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হও।"

কিরূপে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই চিন্তা করিয়াছিলেন। প্রথম উপায়—ইতিহাস অধ্যয়ন। ইতিহাসের আলোচনা করিলে আমাদিগের আপনার অক্ষমতা সম্বন্ধে, পঙ্গুত্ব সম্বন্ধে অনেক ধারণা যে মিথ্যা, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। তিনি জানিতেন, বাহুবলই বল নহে। তাই মধুসূদন দত্তের মৃত্যুতে বেদনা ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—

"আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবল একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না? ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল। সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে।'

কিন্তু তথাপি তিনি এ দেশের বাহুবলহীনতার—রণ-অপটুতার কলঙ্ক মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন—তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রযুক্ত করিয়াছেন।

'বঙ্গদর্শনের' প্রথম সংখ্যায় তিনি এই বিষয়ে ভারতের কলঙ্ক মোচন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এইজন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর-পশ্চিমে পার্ব্বত্য দ্বারে প্রবেশলাভপূর্ব্বক ভারতবর্ষাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছেন। পারসিক, যোনা, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে এবং সিন্ধুপারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছুদিনের জন্য অধিকৃত করিয়া পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই এবং কখন ছিল কিনা, সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না।"

'প্রচারের' "সূচনার" পরই তিনি "বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি আরম্ভে বলেন—

"বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা ও চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।"

এই প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"মুসলমানেরা স্পেন হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশেই হয় নাই। * * * ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল ; এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটি প্রদেশ (১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা।"

ইতিহাসে বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর শৌর্য্যবীর্য্যেরও অনেক প্রমাণ আছে। তাই তিনি বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে বলিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালার ইতিহাস নাই—"যে দেশে গৌড়-তাম্রলিপ্তি-সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে 'নৈষধ-চরিত,' 'গীত-গোবিন্দ' লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।"

আবার—

"এমন দুই একটি হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।"

সুতরাং "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই।" বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ছিল না।

"যে জাতি, মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে এবং বালীদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।"

ইহাই বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের প্রমাণ।

আর—বাঙ্গালীর প্রতিভার পরিচয়। সে সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রমাণ পুঞ্জীভূত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি তাঁহার দেশকে ভালবাসিতেন বলিয়াই দেশের যাহা গৌরবের, তাহার পরিচয় নিষ্ঠাসহকারে প্রদান করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যিনি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার ত্যাগ করেন, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না।"

বাঙ্গালী যে বাঙ্গালী—ইহাই তাহাকে গৌরব বলিয়া মনে করিতে হইবে। হিন্দু যে হিন্দু—তাহাতেই তাহার গৌরব। সে গৌরবের কথাও তিনি হিন্দুকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্পনিদর্শন দেখিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তিসকল যে ক্ষোদিয়াছিল,—সেই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিতচেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্য-স্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ন নাভি ;—

এই সব স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক প্রভৃতি এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

স্বদেশের প্রতি এই যে অনুরাগ ইহা না বুঝিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝা যায় না। তিনি দেশের দুঃখে রোদন করিয়াছেন, বলিয়াছেন—"মাতৃহীনের জীবন বৃথা।" আবার কেবল দুঃখে কাতর হইয়া হতাশায় নিশ্চেষ্ট হয়েন নাই। তিনি গীতার উক্তি স্মরণ করিয়া কাজ করিতেন—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।" তাই তিনি তাঁহার দেশবাসীকে মাতৃপূজার মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন—কিরূপে সুসন্তান হইবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হয়, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালে আমরা যাহাকে দেশ বাৎসল্য বলি, তাহার মূল কথা—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

কিন্তু কয় জন লোক ইহা বুঝে? বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"দেশ-বাৎসল্য পরম

ধর্ম্ম, কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বঙ্গদেশে ছিল না—এখন সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়।" কিন্তু আনন্দের মধ্যে আশঙ্কার যে কারণ বিদ্যমান ছিল, তাহা তিনি দূর করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন। কেবল বক্তৃতা করিয়া—ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন জাতি স্বায়ত্তশাসন লাভ করে না। তাই তিনি এ দেশের ভিক্ষানীতির নিন্দা করিয়াছেন। এই নীতির যাহারা সমর্থক, তাঁহাদিগের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুলফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা চাপা থাকিলে ভাল দেখাইত * * কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে অন্তর্লঘু ফল ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।"

এই যে ভিক্ষানীতি, ইহাকে তিনি কুক্কুর জাতীয় পলিটিক্স বলিয়াছিলেন। পলিটিক্সের আর যে রূপ, তাহা বৃষ জাতীয়।

অর্থাৎ স্বাবলম্বননিষ্ঠ হইয়া—স্ববলে বলী না হইলে, কোন জাতি তাহার স্বায়ত্ত-শাসন অর্জ্জন করিতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র পরম ভক্তিসহকারে যাহাতে আদর্শ মানবত্ব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার চরিত-কথা বিবৃত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ছিল—খণ্ড ভারত হইতে মহাভারতের সৃষ্টি। এই মহাভারতের কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রও করিয়াছিলেন। তাই—"যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই," বলিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত রচনার সহায়রূপে ইংরেজী ভাষার ব্যবহারও সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"(আমাদিগের) এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরেজীতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরেজীর দ্বারা সাধনীয়, কেন না, এখন সংস্কৃত

লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরেজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরেজী চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক।"

এই যে মহাভারত—ইহা কিরূপে রচনা করিতে হইবে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, যাঁহারা মনে করেন, শোণিতস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে সুখের পারে যাওয়া যায় না, তাঁহারা ভ্রান্ত। তিনি সেইজন্য সে পথের সন্ধান দেশবাসীকে দেন নাই। তিনি দেশকে মাতৃরূপে ধ্যান করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য ভক্তির দ্বারা সাধনায় সিদ্ধিলাভের সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 'আনন্দমঠের' উপক্রমণিকার প্রতি দৃষ্টি দিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। সে কথা আজ কে ভুলিতে পারে?—

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল; কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য, এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনের তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার, মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক। তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

"একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

"পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, কীট, পতঙ্গ, সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অনন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচিভেদ্য, অন্ধকারময় নিশীথে সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতামধ্যে শব্দ হইল—'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

"শব্দ হইয়া আবার সেই অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল; আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল,—'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না'?"

"এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, 'তোমার পণ কি' ?"

"প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবন সর্বস্ব'।"

"প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে'।"

" 'আর কি আছে ? আর কি দিব' ?"

"তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি' !"

এই ভক্তি প্রদান করিতে পারিলে, নিবেদন করিতে পারিলে, তবে মনস্কাম সিদ্ধ হয়—নহিলে নহে। ত্যাগীর ত্যাগ লইয়া দেশমাতৃকাকে ভক্তিভরে পূজা করিলে, তবে সাফল্যলাভ করা যায় ; নহিলে নহে।

সমগ্র 'আনন্দমঠের' ইহাই শিক্ষা—দেশকে ভক্তি দিতে হইবে। ইহাই ভারতের প্রকৃতিগত ভাব।

জাতিভেদে ভাবভেদ হয়—ব্যবহারভেদ হয়। প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গলেখক "ম্যাক্স ওরেল" ইংরেজ ও ফরাসী উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ এইরূপে বুঝাইয়াছেন—

"When a Frenchman is drunk he is generally socialistic, anarchical, revolutionary, and he raves at the top of his voice ; 'Down with all tyrants !' When the Englishman is in his cups, he grows conservative and jingoistic. He will call up the nations to single combat, and if Mr. Gladstone were to fall in to his hands, he would make short work of him. 'Warrloo' seems to be still the watchword of quarrelsome Anglo-Saxon drunkards."

অর্থাৎ ফরাসীস যখন মদ্যপান করে, তখন সে সাম্যবাদী, বিপ্লববাদী হয় ; চীৎকার করে—"অত্যাচারীরা বিনাশ হউক।" আর ইংরেজ মদ্যপান করিলে রক্ষণশীল ও যুদ্ধানুরাগী হয় ; সে জাতিসমূহকে স্বতন্ত্রভাবে সমরে আহ্বান করে—তখন তাহার হস্তে পতিত হইলে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরও রক্ষা থাকে না। সে তখন যুদ্ধেরই জয়গান করে।

কিন্তু ভারতবাসী স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় এবং ভক্তি তাহাকে যত মুগ্ধ ও অভিভূত করে, তত আর কিছুই নহে। এ দেশের লোকের এই ধাতুগত বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিতেন—তাহার চরিত্র তিনি যেন নখদর্পণে দেখিতেন। তিনি দেশকে মা মনে করিতেই শিখাইয়াছেন।

যাঁহারা ভারতবাসীর—বিশেষ বাঙ্গালীর স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা বিদেশী হইলেও—তাঁহার চরিত্রের যুগে যুগে অর্জ্জিত ও অনুশীলনপুষ্ট এই ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। সেইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রের সম্বন্ধে একজন ইংরেজই ইহা বলিয়াছেন।

ফরাসীসদিগের প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতের সহিত "বন্দে মাতরম্" তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র এ দেশের লোককে স্বদেশের সেবাসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সহিত কিরূপ সামঞ্জস্যসম্পন্ন। য়ুরোপের পরাধীন জাতির মুক্তিসাধনার আহ্বান বায়রণের কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে—

"Hereditary bondsmen ! know ye not.
Who would be free, themselves
must strike the blow ?"

আর আমাদিগের দেশের শিক্ষা—আত্মিকবলে বলী হইয়া তাহার দ্বারা বাহুবল নিয়ন্ত্রিত করা।

আত্মিক বলের—জাগ্রত জাতির জন্মগত অধিকার ও মুক্তিকামনালাভের বিরুদ্ধে উদ্যত হইলে বাহুবল যে অসার প্রতিপন্ন হয়, তাহা যে কখন কোন য়ুরোপীয় বুঝেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু ইহকালসর্ব্বস্ব জাতি সাধারণতঃ বাহুবলেই অধিক আস্থা স্থাপন করে। শতবর্ষাধিককাল পূর্ব্বে রিকার্ড নামক একজন ইংরেজ—এ দেশে ইংরেজের শাসন স্থায়ী করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—এ দেশ শাসনে দেশের লোকের সহযোগ অর্জ্জন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—এ দেশে ইংরেজ যদি সেই পথ অবলম্বন না করে, তবে—"The day may not be far distant when you shall feel, in disappointment and disgrace, how feeble is physical, compared with the moral power ; ** (and) may add one more page to the proofs given by history, that fleshly arms, and the instruments of war, are but a fragile tenure and 'soon to nothing brought' when opposed to the interests, and the will of an enlightened people."

কিন্তু এ শিক্ষা ইংরেজ যে গ্রহণ করে নাই, তাহার প্রমাণ, যখন জাতীয় মহা-

সমিতি—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও 'টাইমস' দম্ভভরে বলিয়াছিলেন—ইংরেজ বাহুবলে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল, বাহুবলেই তাহা রক্ষা করিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছেন—বাহুবলই শ্রেষ্ঠ বল নহে এবং ভক্তি ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। বায়রণ গ্রীকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"You have the Pyrrhic dance as yet,
Where is the Pyrrhic phalanx gone ?
Of two such lessons why forget
The nobler and the manlier one ?"

আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন—বাহুবল ও ভক্তি এতদুভয়ের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, তবে তাহার সাধনাই ত্যাগ করিবে কেন ?

প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাংবাদিক গার্ডিনার বলিয়াছেন—জাতি যখন তাহার স্বাধীনতা হারায়, তখন সে আপনার সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং মানুষের দেহে জ্বরের মত তাহার হৃদয়ে দেশাত্মবোধ দেখা দেয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখনই দেশে জাতীয় ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার নিদর্শন। আমরা পূর্ব্বে সেই সময়ের কয়জন সাহিত্যিকের রচনার উল্লেখ করিয়া তাহা বলিয়াছি। তাঁহাদিগের মধ্যে রঙ্গলালও একজন। তিনি আইরিশ কবির একটি ক্ষুদ্র কবিতা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই নিকট সুপরিচিত—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল, বল, কে পরিবে পায় রে—
কে পরিবে পায় ?"

কিন্তু ইহাতে য়ুরোপীয় কবির ভাব সপ্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি জাতীয়তার যে পাবনী ধারা ভগীরথের মত সাধনা করিয়া আনিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার—হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য হইতে উদ্গত। তাই ফরাসীসদিগের জাতীয় সঙ্গীত "মার্সেলজের" সহিত "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের তুলনা করিয়া—স্বদেশী আন্দোলনের সময়, যখন কোন কোন ইংরেজ "বন্দে মাতরম্‌কে" ইংরেজের বিরুদ্ধে রণাহ্বানের তূর্য্যনিনাদ বলিয়া ঘোষণা

করিতেছিলেন, তখনই একজন ইংরেজ—ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার সহিত সহানুভূতিহীন হইলেও লিখিয়াছিলেন—কাব্যাংশে ও রচনাপারিপাট্যে "বন্দে মাতরম্" ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত অপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত। "মার্সেলজ" বিদ্রোহোদ্দীপক ও শাসনশৃঙ্খলচ্ছেদক; "বন্দে মাতরম্" উপাসনার, প্রার্থনার পূতধারায় শ্রোতাকে স্নাত ও পবিত্র করে। "বন্দেমাতরম্" জাতির হৃদ্গত প্রার্থনা—আত্মাশক্তিকে স্বদেশের আধারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মা বলিয়া তাঁহার উপাসনা। ইহা ভক্তির উচ্ছ্বাস।

মৃন্ময়ী জননীতে চিন্ময়ী জননীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া—বঙ্কিমচন্দ্র সেই জননীকে আনন্দমঠের মন্দিরে—ভক্তির রত্নবেদীতে নিষ্ঠার পূত গঙ্গোদকে ধৌত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং স্বয়ং মনীষার পঞ্চপ্রদীপ দেশাত্মবোধের গব্য ঘৃতে পূর্ণ করিয়া সেই দীপশিখায় মা'র আরতি করিয়াছেন। তিনি যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা জাতির হৃদয়ে নূতন শক্তির সঞ্চার করিতেছে। তাই জাতি আজ তাহার জন্মগত অধিকার লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

'বঙ্গদর্শনে'র পত্র সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :

"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজীপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশল শূন্য; নয় ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র: ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?"

"ইংরাজি ভক্তদিগের এইরূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের 'ভাষায়'

যেরূপ শ্রদ্ধা তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা 'বিষয়ী লোক' তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষায় বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ-পৌর-কন্যা এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

"লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেকচার, এড্রেস, প্রোসিডিংস সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয়পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয়পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গলায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

"ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু-বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদিগের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মানমর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মানমর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।

"আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গলজন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়াও আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলি কথা আছে, যাহা

রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সেসকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সেসকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেননা, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখনও ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান এবং অনেক সুখে সুখী। যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরেজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটী বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

"এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত করিতে পারে না? যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিত-দিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিত দিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সেসকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিনকালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের রাজ্যভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে

কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোনকালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

সেই "পত্র সূচনায়"ই তিনি বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা-পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালাপাঠে বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।"

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাবপ্রকাশক করিয়া ভাষার সাহায্যে বঙ্গমধ্যে 'জ্ঞানের প্রচার'-কল্পে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রচার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার "আপামরসাধারণের পাঠোপযোগিতাসাধনে" সচেষ্ট হয়েন; কারণ, "যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না।" 'বঙ্গদর্শনে'র তৃতীয় উদ্দেশ্য—"যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামরসাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়।" কেন না, শিক্ষিতে ও জনসাধারণে যে ব্যবধান ইংরেজী শিক্ষার ফলে বিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

শরতের পূর্ণিমায় যেমন চন্দ্র মধ্যে মধ্যে পবনতাড়িত লঘু মেঘে আবৃত হয়, তেমনই পূর্বোক্ত উক্তিতে সংশয়, সন্দেহ ও আশঙ্কা এক এক বার সাফল্যের সম্ভাবনা আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, তিনি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি যুক্তিতর্কে পাঠক-সম্প্রদায়কে স্বীয় মতাবলম্বী করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই বঙ্গসাহিত্যানুরাগ ঘটনাবশে নূতন যুগের অরুণ কিরণ-বিকাশ। ঘটনার স্রোতের অনিবার্য্যগতি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীকে তখন কেন্দ্রাভিমুখগামী করিতেছিল। সেইজন্য দেখিতে দেখিতে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রবন্ধকার, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি—বহু কৃতীলেখক 'বঙ্গদর্শন'কে বার্ত্তাবহ-রূপে ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত হইলেন; দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব লাবণ্যশ্রীর সঞ্চার হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা পড়িলেন—পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন।

সেইজন্য 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার

সমালোচনা করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেসকল বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করে তাহাদিগকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরই মত তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন "আজিও নাকি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষার অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজীনবিশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা পায়।" তখন এইরূপ উক্তি করিবার সময় হইয়াছে। বাঙ্গালীকে যে বাঙ্গালা সাহিত্য আশ্রয় করিতেই হইবে, এ কথায় বঙ্কিমচন্দ্র সদর্পে বলিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"প্রবাদ আছে যে, গরীব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ 'কেলাকা ফুল'। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া 'কেলাকা ফুল' বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যে-ই 'কেলাকা ফুল' বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল-প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী মৃদু পবন-হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি-সাধন করি। ইংরেজী কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজীর সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

"মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

'সাধো আছে, মা, মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।'

"তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের

আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই ঘটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

"সেইরূপ আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটী বাঙ্গালীর কথায়, খাঁটী বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটী বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটী বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটী বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্ব্বণ' চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে 'পৌষপার্বণে' যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশসুদ্ধ জোনস্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মা'র প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষগুলি মা'র প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না, এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মত রাজনারায়ণ বসুও সাহিত্যে সময়োচিত পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবিতার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"গঙ্গার গতির সঙ্গে বাঙ্গালা কবিতার গতির উপমা দেওয়া যাইতে পারে। গঙ্গা যেমন বিষ্ণুপদ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া হিমালয় প্রদেশে যেখানে প্রকৃতি দেবী বন্য ও অসংস্কৃত, কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক পরমরমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে হিমালয়-দুহিতা পার্বতীর কীর্ত্তিস্থান দিয়া যেমন প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মুকুন্দরামের চণ্ডী মহাকাব্যে বন্য

ও অসংস্কৃত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করতঃ মহামায়ার অদ্ভুত কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। গঙ্গা যেমন বিঠুর গ্রামের সন্নিহিত হইয়া একদিকে বাল্মীকির তপোবন ও অন্য দিকে রামচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থান অযোধ্যা প্রদেশ, দুইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বাল্মীকিকে আদর্শ করিয়া লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামগুণগান করিয়া ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি করিতেছে। গঙ্গা যেমন প্রয়াগ-তীর্থে আগমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের কীর্ত্তিস্থান দিয়া প্রবাহিত যমুনার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মধ্যকালে কৃষ্ণার্জ্জুনের গুণকীর্ত্তনকারী কাশীরামদাসের মহাভারতরূপ শাখা নদী হইতে বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার স্তুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা রামেশ্বর ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবদুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ আছে। আবার ঐ গঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থল নবদ্বীপের নিকট দিয়া যেরূপ প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। ভাগীরথী যেমন একদিকে চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর ও অন্যদিকে চাণক, দক্ষিণেশ্বর, বরাহনগর, কলিকাতা—ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া ইউরোপীয় কীর্ত্তির প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা অধুনাতন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাংলা কবিদিগের গ্রন্থে ইউরোপীয় সুন্দর চিত্রাবলী কিন্তু প্রকৃতির-বিরোধী অস্বাভাবিক ভাবের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছে। গঙ্গা যেমন কলিকাতার দক্ষিণে প্রথমে প্রশস্ত হইয়া মহা-কল্লোল-সমন্বিত বেগে সমুদ্র-সমাগম যাত্রা করিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে কত বিশাল ও একাকী হইয়া সমীচীনতা লাভ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে?”

সুতরাং পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাকে আপাতঃ “বঙ্গ প্রকৃতি-বিরোধী” বলিয়া বিবেচিত ভাবের প্রভাবে পতিত হইবার সম্ভাবনা অনিবার্য্য। কিন্তু সেই নূতন সাহিত্যকে অনুকরণমাত্রে পর্য্যবসিত না করিয়া মৌলিকতা-সুন্দর করিতে হইবে। শিল্প যখন অনুকরণমাত্র হয়, তখন তাহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে; তাহা যতদিন সজীব থাকে, ততদিন তাহা নানা প্রণালী ও নানা আদর্শ গ্রহণ করিয়া সে সকল আপনার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে আপনার করিয়া লয়। ভারতীয় শিল্প অনায়াসে গ্রীক, তুরানীয়, মিসরীয়, মোগল ও ইয়ুরোপীয় আদর্শ হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে সকলকে যে রূপ দান করিয়াছে, তাহা ভারতীয়—তাহার

নিজস্ব। বার্ডউড বলিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পীর সূক্ষ্ম অঙ্গুলীর স্পর্শ "...is sufficient to transform whatever foreign work is placed for imitation in their hands 'into something .rich and strange' and characteristically Indian." শিল্পে যেমন সাহিত্যেও তেমন রচনার বিষয় মৌলিকতায় সুন্দর করিবার উপাদান আমাদিগের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য নহে পরন্তু সুলভ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য-প্রকাশ প্রসঙ্গে তাহা বুঝাইয়াছেন।—"তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয় তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।"

প্যারীচাঁদ এইরূপে দেখাইয়াছিলেন, সাহিত্যের উপাদান আমাদিগের ঘরে আছে এবং সেই ঘরের সামগ্রী লইয়া যে সাহিত্য গঠিত হইবে, তাহা পরের সামগ্রী লইয়া গঠিত সাহিত্য অপেক্ষা সুন্দর হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যেভাবে তাহা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই সকল বাঙ্গালী তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পারেন নাই। দেখিতে পাইবার কতকগুলি অন্তরায়ও ছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃত কার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশকালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন কখন প্রদীপ্ত তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেননা অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।"

প্যারীচাঁদের ভাগ্যে পুরস্কার প্রাপ্তি না ঘটিবার কারণ—তিনি যে দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সময়ের কিছু পূর্ব্বগামী—তখনও বাঙ্গালী বাঙ্গালা সাহিত্যকে মা'র প্রসাদ মনে করিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে পুরস্কার প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়, তিনি যে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া-

ছিলেন, তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে তাহার উপযোগী ছিল না; তাঁহার প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান ছিল।

তাঁহার ভাষাও তাঁহার সেই সাফল্য লাভের অন্তরায় হইয়াছিল। প্রদেশের কোন অংশে প্রচলিত ভাষা সমগ্র বঙ্গের বাঙ্গালী পাঠকের সুখবোধ্য ও সহজবোধ্য হইতে পারে না। সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়া গিয়াছেন। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাঙ্গালীকে ও সভ্যজগৎকে বুঝাইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ঘরে সাহিত্যের যে উপকরণ বিদ্যমান, তাহা লইয়া প্রকৃত প্রতিভা অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারে। যে সকল কৃতবিদ্য "নরাধম" পূর্ব্বে আপনাদিগকে "মাতৃভাষার অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজীনবিশ বলিয়া পরিচয় দিয়া "আপনাদিগের" গৌরববৃদ্ধি হইল মনে করিত, তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল, ইংরেজও বাঙ্গালীর ঘরের কথা লইয়া রচিত সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইল—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ইংরেজীতেও অনূদিত ও আদৃত হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা সম্বন্ধে তাঁহার মত বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে" এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

(১) যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

(২) টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়, লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সেদিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

(৩) যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৪) যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ক বা স্বার্থ সাধন যাহার উদ্দেশ্য সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না। সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

(৫) যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তাহার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম কয়টি ঘটিয়া উঠে না। এজন্ম সাময়িক সাহিত্য লেখকদিগের পক্ষে অবনতিকর।

(৬) যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্ত্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

(৭) বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরেজী, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্ম্মান কোটেশন বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

(৮) অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজনমতে আপনিই আসিয়া পৌছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।

(৯) যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারিবার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

(১০) সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

(১১) কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরেজী বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

(১২) যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

"বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।"

বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীরা সাহিত্য-সম্রাটের এই সকল উপদেশ সম্বন্ধে অবহিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির প্রবাহ যে ত্বরিতগামী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাহাতে সাহিত্য বহু আবর্জ্জনামুক্ত হইবে।

সরলতাই যে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস "কপালকুণ্ডলা"য় রমণীর রূপ-বর্ণনা এইরূপ—

"বর্ষাকালে বিটপীলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। ...ইনি শ্যামবর্ণা...তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী উষা, যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসন্ত-প্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচুতপল্লববিরাজী ভ্রমর শ্রেণীর তুল্য, সেই উজ্জ্বল শ্যাম-ললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমীচন্দ্রাকৃতিললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগল মনে করুন; সেই পক্কচুতোজ্জ্বলকপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন, তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম-পল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভব কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তিপ্রকাশ মাত্র,...মুখকান্তিমধ্যে দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণীকুলরাজ্ঞী।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা 'দেবী চৌধুরাণী'-তে রমণীর সৌন্দর্য্য এইরূপ :

"সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী···এ সুন্দরী কৃষাঙ্গী নহে অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে *** লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্য্যাদা নাই—কিন্তু একশত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হইতে হীরামুক্তাখচিত কাঁচুলি ঝকমক করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোণায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝকমক করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্না-পুলকিত স্থির নদীজলের মত—সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আর নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায়, কেশ পৃষ্ঠে, অঙ্গে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধিচূর্ণ-গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। একছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।"

আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস। তাহাতে নৈশনদী-রূপ বর্ণনা এইরূপ :

"সন্ধ্যাগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টিকৃত হইল। গগনমণ্ডলে পরিচারক হস্তজ্বালিত দীপমালার ন্যায় অথবা প্রভাতে উদ্যান কুসুম সমূহের ন্যায় আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতর বেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে...নদীফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহুলোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উত্থিত হইল।"

'দেবীচৌধুরাণী'তে নৈশনদীর বর্ণনা আছে। সরলতাই তাহার প্রধান সৌন্দর্য্য।

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর। একটু অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি! কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচি-ভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে। গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে। তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর তর কল কল পত পত শব্দ করিতেছে, কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রসন্ধানে ডাকিনীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন। সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার মত রচনায় অনেক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। উভয়ই রচনা-প্রসাধনপ্রিয়তার পরিচায়ক। রচনা প্রসাধনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন, "যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন।" শুনিয়াছি তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকদিগের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন জ্ঞানের—বিশেষতঃ বিজ্ঞানের প্রসার অধিক উন্মুক্ত হইয়াছে—সুতরাং লেখকদিগের রচনায় ভাবসম্পদের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাহি; কিন্তু তাঁহারা রচনার প্রসাধনে যত্নশীল নহেন। যাহা কিছু লিখিবার যোগ্য, তাহাই সযত্নে লিখিবার উপযুক্ত, এই বিশ্বাস না থাকিলে রচনা সুন্দর হয় না। মার্জ্জিত ভাষা ও ভাবের সৃষ্টি উৎকৃষ্টতর রচনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

রচনা-সংস্কারে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ যত্নবান ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকেই পাওয়া যায়। 'দুর্গেশনন্দিনী' আমূল সংশোধিত হইয়াছিল। 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উভয় গ্রন্থের উপসংহার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। 'চন্দ্রশেখর' পুস্তকাকারে প্রকাশকালে যে রূপ ধারণ করে, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশকালে তাহার সে রূপ ছিল না। 'মৃণালিনী'তে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন উল্লেখযোগ্য। 'আনন্দ মঠে'র সপ্তম সংস্করণে পরিবর্ত্তন হয়—শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা হয়। 'সীতারাম' যেরূপে 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে তাহার বহু

পরিবর্ত্তন ঘটে, পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহার আবার পরিবর্ত্তন হয়। 'রাজসিংহ', 'ইন্দিরা' নূতন সংস্করণে নূতন গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। 'লোকরহস্য', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল রচনায় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন পরিস্ফুট।

দশম পরিচ্ছেদ

সমুন্নত সাহিত্য প্রচারের প্রথম উপায়—ভাষা।

বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থলে লিখিয়াছেন—"অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর, সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়ী।" পৃথিবীর ইতিহাসে এই উক্তির যাথার্থ্য বহুবার—বহুরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। শিক্ষা সমরাপেক্ষা ফলোপধায়ী। কিন্তু সেই শিক্ষাও বাক্যবলসাপেক্ষ—ভাষার সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা-প্রচার দুষ্কর বাক্য যতক্ষণ সুপ্রযুক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহার শক্তির বিকাশ হয় না। সেইজন্যই ভাষাকে ভাবপ্রকাশের উপযোগী করিতে হয় এবং যাঁহারা কোন জাতির ভাষাকে সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম করেন, তাঁহারা সেই কার্য্যের দ্বারাই জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেন—জাতির নমস্য হয়েন।

বঙ্গদেশে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষাকে যেরূপে পুষ্ট ও সংস্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আজ সেই ভাষা জড়ত্বমুক্ত হইয়া আনন্দে উচ্ছলিত, আবেগে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুঞ্চিত, লজ্জায় বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচলিত, ক্রোধে বিকম্পিত হয়। আজ সেই ভাষা—কোথাও জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত নীলাম্বরতলে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিতবক্ষ স্রোতস্বতীর মত বহিয়া যায়; আবার কোথাও তাহা "বর্ষারাশিপ্রমথিতা" পরিপূর্ণা স্রোতস্বতীর মত বৃক্ষলতাতৃণশোভিত বেলাভূমি ভঙ্গ করিয়া কলনাদে প্রবাহিত হয়। তাহা "সাগরবৎ হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ * * ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্ম্মিমালা—আর ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ-প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতি, ইহার ছায়া"—মনোরম।

এই ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি বলিলেও বলা যায়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিক-দিগের ভাষার সহিত তাঁহার বিবিধ রচনার উপযোগী বিবিধ প্রকৃতির ভাষা লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আমরা সাধারণতঃ মনে করি, রামমোহন রায় প্রথম বাঙ্গালা গদ্য লেখক। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ যে বাঙ্গালায় গদ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ভাষার দৃষ্টান্ত এইরূপ :

"যে শাস্ত্রানুসারে পতি বর্ত্তমানে পতির শাসনে স্ত্রীকে থাকিতে হয় সেই শাস্ত্রেই লিখে, পতি মরিলে পতিকুলে তাহার অভাবে পিতৃকুলে তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক—এ ধর্ম্ম রক্ষাতে দেশাধিপতিকে নিয়ন্তা করিয়া শাস্ত্রে করিয়াছেন—তবে স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে কি তাহার অবর্ত্তমানে স্বামী প্রভৃতির শাসন ত্যাগ ও ব্যভিচারের সম্ভাবনা কদাপি নিবৃত্তি হইতে পারে না। যেহেতু অনেক অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ করিতেছি যে স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেও তাহার শাসনে স্ত্রীরা থাকিয়া স্বতন্ত্রা হইতেছে। কায়মন বাক্য জন্য দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার কারণ শাসন মাত্র হইতে পারে না কিন্তু জ্ঞানের উপদেশ ঈশ্বরের ভয় দুষ্কর্ম্ম হইতে কি স্ত্রীকে কি পুরুষকে নিবৃত্ত করায় ইহা শাস্ত্রেও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।"

রামমোহনের গদ্যরচনা কালে গদ্যবোধশক্তি-সম্পন্ন পাঠকদিগের অভাব ছিল। সেই জন্য রামমোহন বেদান্তসূত্রের বঙ্গানুবাদ করিবার সময় ভূমিকায় গদ্য বুঝিবার প্রণালী বর্ণনা প্রয়োজন মনে করেন। তিনি লিখেন :—

"এভাষায় গদ্যকে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে একদেশীয় অনেক লেখক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না। ইহা প্রত্যেক মানুষের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়।"

গদ্য বুঝিবার উপায়—

"বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিতে পূর্বের সহিত অন্বয় করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন'।—ইত্যাদি

এখানে ভাষা অসংস্কৃত, তাহাতে বিরামচিহ্নের প্রচলন নাই, ভাষায় বক্তব্য বুঝিতে গলদঘর্ম হইতে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন ভাষার সংস্কার সাধন ও তাহা সরল করেন, তেমনই ইংরেজীর অনুকরণে বিরামচিহ্ন প্রবর্ত্তন করিয়া বর্ণনা সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করেন।

ইংরেজের এ দেশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে যখন পুত্রের পিতাকে লিখিত পত্রের আদর্শে দেখা যায়—"এখানে শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা অন্যান্য বঙ্গীয় বিবরণ ছাপাইয়া পাঠশালাতে দিয়াছেন—সেই সময় 'শিশুবোধকে' পত্রের আদর্শমধ্যে "সাবিত্রী ধর্ম্মাশ্রিতা", "গুণাধিকা স্বধর্ম্মপরিপালিকা শ্রীমতী মানতী মঞ্জরী দেবী" "ঐহিকপারত্রিক নিস্তার কর্ত্তৃক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য" মহাশয়ের পাদপল্লবে যে পত্রে নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—"মহাশয় ধনভিলাষে পরদেশে চিরকাল কালযাপন করিতেছেন। যে কালে এ দাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন সে কালাহরণ করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে।" তাহা পাঠ করিলে সে সময়ের ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের ভাষার বিরুদ্ধে যিনি প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সেই কার্য্য "অক্ষয় কীর্ত্তি" বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধানুভব করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে সেই বিদ্রোহী "টেকচাঁদ ঠাকুরের" স্থাননির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার মত—অখণ্ডনীয় মত—বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন:

"একজনের কথা অপরকে বুঝান ভাষামাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল *** অন্যের তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার হইবে, এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। ***গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

"প্রাচীনকালে অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। **মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ে গদ্য লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন

অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু বলিতে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃত' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ 'শিশুমার' অর্থ জানে না; সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত; কেননা, কেহ তাহা পড়িতে পারে না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

"এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।"

আরও এক বিপদ ছিল—সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিয়াছেন :

"এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত

করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।"

'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষা যে আদর্শ ভাষা নহে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তথাপি উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন—অন্যত্র বলিয়াছেন—"'টেকচাঁদ ঠাকুর' প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন *** তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল"।

যিনি বিদ্রোহী, তাঁহার বিদ্রোহঘোষণার উদ্দেশ্যে মুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্যারীচাঁদ মিত্রকে পথিপ্রদর্শকের প্রশংসায় সম্মানিত করিয়াছিলেন।

ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ও মত অভ্রান্ত ও দৃঢ় ছিল বলিয়াই তিনি নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা অনায়াসে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া ভাষার সংস্কারসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহ' রচনাকাল পর্য্যন্ত তিনি ভাষার সংস্কারে ও প্রসাধনসাধনে বিরত হয়েন নাই। যাঁহারা 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'রাজসিংহ' পর্য্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, তিনি ভাষাকে যেমন সরল তেমনই শক্তিশালী করিতেই আপনার উদ্যম প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে ভাষা বিশুদ্ধির ও সৌন্দর্য্যের জন্য বিশেষ প্রশংসনীয়, তাহা সংস্কৃতানুসারী ভাষার অনুরাগীরা প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা "আলালী ভাষার" সহিত প্রায় এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। তাঁহার মতে 'মৃণালিনী' "পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে" পাঠ করা যায় না—কারণ উহার "ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়।"

যিনি 'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষার সহিত 'মৃণালিনীর' ভাষার প্রভেদ

বুঝিতে চাহেন না, তাঁহার মতের গুরুত্ব যেমনই কেন হউক না, সে সময়ে যে 'মৃণালিনী'তে ব্যবহৃত মার্জ্জিত ভাষাও কেহ কেহ গাম্ভীর্য্য-বিবর্জ্জিত মনে করিতেন, তাহার প্রমাণে আমরা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরে আলোচনার উল্লেখ করিতে পারি। পূর্ব্বে একস্থানে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বলিয়াছিলেন—

"আমাদের এরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে।"

যে সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভাষার গঠনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ভাষা লইয়া মতভেদ সপ্রকাশ হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন বীমস্ তাঁহার ভারতীয় ভাষায় ব্যাকরণ—'A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India' রচনা করেন। তাহার উপক্রমণিকাংশে তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমানে বাঙ্গালী লেখকরা দুই ভাগে বিভক্ত—একদল সংস্কৃতের ভক্ত, অপর দল ইংরেজীর অনুরাগী। তিনি শেষোক্ত দলের লেখকদিগের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের ও কালীপ্রসন্ন সিংহের ("হুতোম") নামোল্লেখ করিয়া শেষে বলেন:

"That the Bengalis possess the power as well as the will to establish a national literature of a very sound and good character, cannot be denied, and it is to be hoped that the ponderous highflown Sanskrit style will be laughed out of the field by Tekchand Thakur and his light armed troops so that Bengalis may write as they talk, and improve their language, not by wholesale importations from the dead Sanskrit, but by adopting and adhering to one standard universal system of spelling, and by selecting from the copious stores of their local dialects such vigorous and expressive words as may best serve to express their thoughts. If the style of any one writer were taken as a model by the rest, a standard would soon be set up, and Bengali would become a literary language."

তিনি তখনই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, জাতীয় সাহিত্য-রচনায় ক্ষমতা ও আগ্রহ বাঙ্গালীর আছে এবং সেই জাতীয় সাহিত্য উৎকৃষ্টই হইবে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যদি কোন একজন লেখকের রচনারীতি আর সকল লেখক আদর্শরূপে গ্রহণ করেন, তবে অতি শীঘ্রই একটি আদর্শ রচনা-পদ্ধতি সৃষ্ট হইবে ও বাঙ্গালা সাহিত্যিক ভাষায় পরিণতি লাভ করিবে।

ইহাই হইয়াছিল; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও রচনা-পদ্ধতি আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল।

আজ যাঁহারা ভাষায় যথেচ্ছ পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিতে আগ্রহশীল হইয়াছেন, তাঁহারা যদি ইহা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে তাঁহাদিগের সেই আগ্রহের প্রশমন হইবে, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক যে ভাষা প্রচলিত ভাষার সংস্কারের জন্য কল্পিত নহে, কেবল বিদ্রোহ-ঘোষণা, তাহা স্থায়ী হয় না। সেইজন্যই "আলালী ভাষা" স্থায়ী হয় নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বারা 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। উহাতেই 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রের প্রতিসংখ্যায় বিজ্ঞাপনে লিখিত থাকিত—"এ পত্রিকা পণ্ডিতদিগের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে না। তাঁহারা পড়্‌তে চান পড়্‌বেন, কিন্তু তাঁদের জন্য এ পত্রিকা নহে।"

আমরা বলিয়াছি, ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখনই শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (Bengali, Spoken and Written—1877), তিনি বহুবচন-জ্ঞাপন জন্য "গণ" ব্যবহারের বিরোধী—তিনি বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ মানিতে অসম্মত—তিনি সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা—একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দিবেন না—তিনি ভ্রাতা, কন্যা, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া ভাই, কাল, কাণ, সোণা প্রভৃতির ব্যবহার করাইতে প্রয়াসী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রস্তাব বাঙ্গালা ভাষার উপর "দৌরাত্ম্য" বলিয়াছিলেন। তিনি শ্যামাচরণ বাবুর প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ :—

প্রথম—সংস্কৃতমূলক যে সকল শব্দ বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইয়াছে,

দ্বিতীয়—সংস্কৃতমূলক যে সকল শব্দ বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হয় নাই,

তৃতীয়—সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কশূন্য শব্দ।

শ্যামাচরণ বাবু প্রথম শ্রেণীর শব্দের পরিবর্ত্তে অবিকৃত অর্থাৎ রূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

"এক্ষণে 'বামুণ'ও যেমন প্রচলিত, 'ব্রাহ্মণ'-ও সেইরূপ প্রচলিত। 'পাতা' যেরূপ প্রচলিত, 'পত্র' ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। 'ভাই' যেরূপ প্রচলিত, 'ভ্রাতা' ততদূর না হউক প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই, উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া 'মাতা', 'পিতা', 'ভ্রাতা', 'গৃহ', 'তাম্র' বা 'মস্তক' ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না? যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্যা হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে।"

তিনি বলেন, যে সব শব্দের রূপান্তর হয় নাই, কেবল উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, সে সব শব্দের আদিম রূপ রক্ষা করাই ভাষার স্থায়িত্বের কারণ হয়। "আমরা এমন বলি না যে, 'ঘর' প্রচলিত আছে বলিয়া 'গৃহ' শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা 'মাথা' শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া 'মস্তক' শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে 'ঘর' শব্দের পরিবর্ত্তে 'গৃহ', অকারণে 'মাথার' পরিবর্ত্তে 'মস্তক', অকারণে 'পাতার' পরিবর্ত্তে 'পত্র' এবং 'তামার' পরিবর্ত্তে 'তাম্র' ব্যবহার করা উচিত নহে। * * * আমরা 'ভ্রাতা' শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা 'ভাই' শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। 'ভ্রাতা' শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। 'ভ্রাতৃভাব' এবং 'ভাইভাব', 'ভ্রাতৃত্ব' এবং 'ভাইগিরি' এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন 'ভ্রাতৃ' শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত।"

যে স্থানে অন্য কোন ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে হয়, সে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত হইতে শব্দগ্রহণেরই পক্ষপাতী। শ্যামাচরণ বাবু বলেন, হিন্দু লেখকরা যে সংস্কৃতের অনুরাগী তাহার কারণ, সংস্কৃতের সহিত ভারতের গৌরব-যুগের স্মৃতি এবং আরবী ও পারশীর সহিত তাহার দাসত্বের স্মৃতি বিজড়িত—"**With Sanskrit are associated the days of India's greatest glory, with Persian and Arabic the days of her defeat, humiliation and bondage. The bud-**

ding patriotism of Hindus everywhere would therefore naturally eschew Persian and Arabic words as badges of slavery." কিন্তু প্রয়োজনে বাঙ্গালায় যে বহু বিদেশী শব্দ গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে:

"সম্মুখে সেপাই সব কাতার কাতার।
যোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তরবার॥
ঘড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালি ঘড়ী।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ী॥
অগ্রেতে আরজবেগী আরজী লইয়া।
ভাটে পড়ে রায়বার যশো বর্ণাইয়া॥

সংস্কৃত শব্দের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগের অন্য কারণও তিনি বিবৃত করিয়াছেন:

"হিন্দী, মারহাট্টী প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে 'কার্য্যের' স্থানে 'কজ্জ' বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও 'কার্য্যের' স্থানে 'কায্যি' বলে। 'বিদ্যুতের' স্থানে 'বিজলি'-ও বলি না, 'বিজুলি'-ও বলি না; চাষার মেয়েরাও 'বিদ্যুৎ' বলে।"

তিনি বলেন, যদি ঋণ করিতে হয় তবে চিরকালের "মহাজন" সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়াই মঙ্গল। "প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দ-ভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? * * * * অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালার বড় আদর করিতেন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহার নিকট আপনার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে "অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী" বলিয়া তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখেন নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত

কোন বিকার নাই—ইংরাজীনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে।”

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইহাই ভাষার আদর্শ। কারণ—

“সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয়, এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না—যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখনও যশ করিব না। তিনি দুই এক জনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে পরোপকারক খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই। অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যা-ধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয় জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।”

সেইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রোহী “টেকচাঁদে”র প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু, ‘আলালের ঘরের দুলালের’ ভাষা যে আদর্শ ভাষা নহে, তাহা তিনি জানিতেন এবং জানিয়া সে কথা ব্যক্ত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

“উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়; সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজনগ্রাহিতা

সংস্কৃতাদি ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুত চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতার দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

অন্যত্র তিনি ইহা আরও সুস্পষ্ট করিয়াছেন—

"হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। * * * টেকচাঁদি ভাষা হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণ রসের ইহা বিশেষ উপযোগী। * * * গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।"

এইরূপ আলোচনার ফলে তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—

"বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য বা সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিলাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—

নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজী, ফার্সী, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচরিত্রের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃত-বহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।"

যাঁহারা বিনা প্রয়োজনে সরল ভাষা বর্জ্জন করেন, তাঁহারাই নিন্দনীয়। সেই-জন্যই তিনি সংস্কৃত-ব্যবসায়ী বাঙ্গালা লেখকদিগের নিন্দা করিয়াছেন—

"অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতুরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুমসকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা। * * * গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি সাজিয়া দেয়—যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, সেই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে।"

সরল প্রচলিত ভাষাও যে মার্জ্জিত হইলে শব্দশিল্পীর হস্তে শক্তিশালী ও সুন্দর হয়, তাহা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় দেখিতে পাই।

রামরাম বসুর 'লিপিমালা' ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহা যে উদ্দেশ্যে লিখিত, তাহা সরল প্রচলিত ভাষা ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না—

"এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও ঐপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এইস্থানে এখন এস্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার

ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ভূমীর যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রথিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।"

এই ভাষায় প্রাণ ও সৌন্দর্য্য উভয়েরই একান্ত অভাব।

ডাক্তার উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার সপ্তম কথার আরম্ভ এইরূপ :

"পদ্মাবতী নাম নগরীতে মুকুটমণি নামা এক রাজা থাকেন তিনি কৃষি বাণিজ্য প্রজাপীড়া হিংসাদি বিবিধোপায় দ্বারা অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়াও ধনাশা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া এক দিবস সভামণ্ডলীস্থ পণ্ডিতামাত্য প্রভৃতিকে কহিলেন যে ধনতুল্য কোন বস্তু নহে"—ইত্যাদি।

এই ভাষার দৈন্যও সপ্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র যে স্থানে সরল প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সে স্থানে তাহাই সুন্দর ও শক্তিশালী।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন (১৩০৮ বঙ্গাব্দ), তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) তাঁহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। * * * তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ—শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিত ভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। তখন, পূর্ব্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গ ভাষার যৌবনসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।"

যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের "সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধের" প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি কি একবার ভাবিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন—যে ভাষাকে আমরা মাতৃভাষা বলিয়া জননী সম্বোধন করি, তাঁহার

সম্বন্ধে "বন্ধ্যাত্ব ঘুচানর", তাঁহার "যৌবনসৌন্দর্য্যে" লোককে আকৃষ্ট করার ও শ্রদ্ধা তাঁহার চরণে অর্পণ না করিয়া "হস্তে অর্পণের" কথায় কি সেই "সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা" ব্যক্ত হইয়াছে ?

তবে তাঁহার উক্তির ত্রুটিতে ব্যথিত হইলেও তাঁহার সহিত সকলেই স্বীকার করিবেন—বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষার সেবা করিয়া বাঙ্গালীর মহৎ ও স্থায়ী উপকার করিয়াছেন এবং তিনি বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহের ভাব প্রদর্শনের ধৃষ্টতা ঘৃণ্য মনে করিয়াছিলেন।

ভাষা-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা কিরূপ কঠোর, তাহা তাঁহার পুস্তকগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়—আর তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি সর্ব্বত্র তাঁহার মতের—রচনার ভাষা বিষয়ানুসারেই নির্দ্ধারিত হইবে—অনুসরণ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই মত অভ্রান্ত। তিনি ভাষা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়া তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনীর' আরম্ভ এইরূপ :—

"৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর। কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে এই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল ; ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।"

পরে ইহাতে ভাষা সম্বন্ধে "হইবেক"—স্থানে "হইবে" করা হইয়াছিল। কিন্তু পাঠ করিলেই বুঝা যায়, ভাষা কেবল তাহার জড়ত্বশাপমুক্ত হইতেছে—মুক্তির আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যভাব তখনও লাভ করে নাই।

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। ইহা কাব্যের সৌন্দর্য্যে ওতপ্রোত। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই, তাহাতে লোকের অপ্রীতির উদ্রেক হয় নাই।

'কপালকুণ্ডলায়' রমণীরূপ বর্ণনা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার পর 'মৃণালিনী'। এই পুস্তকে অপেক্ষাকৃত সরল ভাষাই ব্যবহৃত হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, রামগতি স্থায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, তাবার জন্ম ইহা পিতাপুত্রের একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে পাঠ করা যায় না।

'মৃণালিনীর' পর হইতে ভাষা উত্তরোত্তর সরল ও সবল হইয়াছে; তবে তাহা সর্ব্বত্রই বিষয়ভেদে ভিন্নরূপ—যে ভাবপ্রকাশের জন্য যে ভাষার প্রয়োজন তাহাই। 'দেবী চৌধুরাণীতে' সরল ভাষায় বর্ষাকালের জ্যোৎস্নামধুর রাত্রিতে ত্রিস্রোতার বর্ণনা অনিন্দ্যসুন্দর। তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'আনন্দমঠ' ইহার পূর্ববর্ত্তী রচনা। ইহার আরম্ভাংশ গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে অপরাজেয়।

'সীতারাম', 'দেবী চৌধুরাণী'-ও পরবর্ত্তী কালের রচনা। কিন্তু এই 'সীতারামে' বঙ্কিমচন্দ্র যখন স্বজাতির পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণ করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন তখন ভাষা বিষয়োচিত গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে—

"পাতর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু; এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে ক্ষোদিয়াছিল—সেই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিতচেলাঞ্চল-প্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্য-স্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পকবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভি; এই সব স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা পরিবর্ত্তিত হয়—ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত হয়। তাই বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি স্মরণ করিয়া—"দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বরগণ, গৌড়ী রীতি" এ সব স্মরণ করিয়া তিনি যখন বাঙ্গালীর পরিবার শ্মশানভূমির কথা বলিয়াছিলেন, তখন ভাষা যেন বেদনার বিকাশ—

"কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বঙ্গলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল: রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল, কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল।

গৃহময়ূরকণ্ঠে অৰ্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল; পণ্যবীথিকার দীপমালা নিভিয়া গেল; পূজাগৃহে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রাম শিলা গড়াইয়া পড়িল; যুবার সহসা বলক্ষয় হইল; যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল, কুঞ্জতীরভূমি, নদী, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে আঁধার আঁধার আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশে মেঘ ঢাকিতেছে, ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ জলে, ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে।"

শেষ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহ'-এর (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ) বিজ্ঞাপনের শেষভাগে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"এখন লেখকেরা বা ভাষাসমালোচকেরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্ব্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতের পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এবং সকল স্থানে তাঁহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে সম্বোধনে 'ভগবন্', 'প্রভো,' 'স্বামিন্', 'রাজকুমারি', 'পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। 'তথা' এবং 'তথায়' উভয়রূপই ব্যবহার করিয়াছি। 'সসৈন্যে' এবং 'সসৈন্য' দুই-ই লিখিয়াছি একটু অর্থভেদে। কিন্তু 'গোপিনী' 'সশরীরে উপস্থিত' এইরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণ-নির্দ্দেশের এ স্থান নহে। সময়ান্তরে তাহা করিব ইচ্ছা আছে।"

আমাদের দুর্ভাগ্য—তিনি আর সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সময় পায়েন নাই। বিশেষ দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষা লইয়া যেরূপ ব্যবহার চলিতেছে, তাহাকে ভাষার প্রতি অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। যখন সেই সব অত্যাচার লক্ষ্য করি, তখন 'বঙ্গদর্শনের' যুগের সাহিত্যের কথা স্মরণ করিয়া কালিদাসের সেই কথা—অজপরিত্যক্ত অযোধ্যার বর্ণনা মনে পড়ে—

"নিশাসু ভাস্বৎ কলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চরোভূদভিসারিকাণাম্‌।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ
স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥

যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশায়,
মুখর নূপুর চারু বাজিত চরণে,
আপনার পথ হেরি' মুখের উল্কায়—
তথায় শৃগাল ঘুরে আমিষান্বেষণে।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ একদিন মিল্টনকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—মিল্টনের সেই সময় জীবিত থাকা ইংলণ্ডের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। তেমনই আমরা আজ বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে বলি—আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তবে কেহ ভাষার উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে পারিতেন না। কারণ, তিনি স্রষ্টা ও শাসক—একাধারে উভয়ই ছিলেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত লিখিয়াছেন—

"ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন কর্ত্তব্য ছিল, ভাষাকে সাধারণের বোধগম্য করাও তাঁহার সেইরূপ একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার এই গুরুতর কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকে নাই। তিনি অসামান্য প্রতিভাবলে আপনার সেই সাধনায় সর্ব্বাংশে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। * * * বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নিম্নস্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চস্তরে উত্থিত হইলেও জীবনীশক্তি বিসর্জ্জন দেয় নাই। গাম্ভীর্য্যের সহিত কোমলতার, দুরূহ শব্দাবলীর সহিত সরল শব্দমালার ও ওজস্বিতার সহিত প্রাঞ্জলতার সমতা রক্ষা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় ভাষাকে স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভাষা গম্ভীর হইয়াও কোমল, সংস্কৃত শব্দাবলীতে গ্রথিত হইয়াও প্রাঞ্জল, নিত্যব্যবহার্য্য চিরপ্রচলিত কথার আশ্রয়স্থল হইয়াও গ্রাম্যতাহীন।"

এই ভাষার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র সতর্কতা সহকারে ভাষার প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সৃষ্ট বঙ্কিম-মণ্ডলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন, তাঁহাদিগের রচনার আদর্শ তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তিনি ভাষার বিশুদ্ধি নিষ্ঠাসহকারে রক্ষা করিতেন—যাহারা সে বিশুদ্ধি নষ্ট করিত, তাহারা

তাঁহার আক্রমণভয়ে পলায়ন করিত। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। * * * বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।"

আজ আমরা—যাহারা তাঁহার শিষ্য বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি—আমরা তাঁহাকে সেই প্রসন্ন চতুর্ভুজমূর্ত্তিকেই ধ্যান করি; প্রার্থনা করি, তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে সর্ব্ববিধ অনাচার ও অত্যাচারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে অভয় ও তাহার উন্নতির জন্য তাহাকে বর দান করুন; তাঁহার মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার শঙ্খ বাঙ্গালায় প্রণাদ করুক, তাঁহার চক্র বাঙ্গালার সকল অমঙ্গল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করুক; তাঁহার গদা অনাচারীকে বিনষ্ট করুক, তাঁহার পদ্ম—বাঙ্গালা ভাষায় ও সাহিত্যে অম্লান শোভা প্রদান করুক।

যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের গুরু; যিনি ভগীরথের মত সাধনা করিয়া ভাব-মন্দাকিনী-ধারায় আমাদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে বিশ্ববরেণ্য করিয়া গিয়াছেন; যিনি সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি—নানা দিক আপনার প্রতিভার আলোকে উজ্জল করিয়া এই দেশে মহাভারতের স্রষ্টা পূর্ণমানব শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন; যিনি ভারতবাসীকে জন্মভূমির দেবীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন; যিনি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মনে করিয়াছেন—হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন এবং হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না করিলে আর কেহ করিবে না বলিয়া হিন্দুকে স্বাবলম্বনের অনুশীলন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যিনি বুঝাইয়াছেন, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম অভিন্ন এবং কর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না; যিনি কর্ম্মযোগীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুযুধান কৌরব ও পাণ্ডবীয় চমূর মধ্যে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সেই কথা এ দেশের লোককে স্মরণ করিতে বলিয়াছেন—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"; যাঁহার বহু দানের মধ্যে উন্নতির পথারূঢ় "মাতৃসম মাতৃভাষা" অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান; যিনি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে সর্ব্বশাস্ত্রসার ভগবদ্গীতা অধ্যয়নের হেতু; যিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর গৌরব করিবার অনেক কারণ আছে—বাঙ্গালীকে মনে করিতে শিখাইয়াছেন—"আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই; কেন না এই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্ত-মাতৃক"; যাঁহার সৃষ্ট মহামন্ত্র "বন্দেমাতরম্" লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক সযত্নে ও শ্রদ্ধা সহকারে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধি-

তোরণে উৎকীর্ণ করাইয়াছেন; যিনি এ দেশের অধিবাসীদিগকে—তাঁহার হিন্দুস্থানে জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগকারী সমুন্নত সম্প্রদায়ের জন্মের অধিকারে ও আপনার অসামান্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বহেতু মাতৃমন্ত্রে দীক্ষাদান করিবার জন্য এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—আজ আমরা সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করি—

"বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

আমরা মনোমন্দিরে মা'র মন্দির রচনা করি—তাহাতে মা'র প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তির অর্ঘ্য তাঁহার চরণে অর্পণ করি; দেশের গগন-পবন মুখরিত করিয়া মাতৃমন্ত্র ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হউক: 'বন্দেমাতরম্'।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদি রসেরই সহিত যেন তাহার একটি সর্ব্ব উপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকে সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক, কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীরভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা হইত, সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রকারে পরিহার করা হইত।

"বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দাপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গ সাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

হাস্যরস মানুষের সকল কার্য্যে এতই স্বাভাবিক নিয়মে প্রকাশ পায় যে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না, এমন বলা যায় না এবং তাহাতে যে সময় সময় বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করে নাই, এমনও বলা যায় না। সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকে যেমন, বাঙ্গলায় সাধারণ প্রচলিত আলাপ আলোচনায়ও তেমনই তাহার ব্যবহার ছিল এবং কাশীরাম, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিরাও সে রসের ব্যবহারে কার্পণ্য করেন নাই—দাশরথি প্রভৃতির ত কথাই নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাহার বিকাশ ছিল—কাশী রামের মহাভারতে ও কৃত্তিবাসের কাব্যে যেমন অন্যান্য কাব্যেও তেমনই তাহা ছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা সুসংস্কৃত ও সর্ববিষয়ের উপযোগী ছিল না।

হাস্যরসের মত একটি প্রধান রসের এই অবস্থা যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম খণ্ডেই "রসিকতা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হয় :

"অধুনাতন বাঙ্গালী মহলে রসিকতার অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। 'তামাসা', 'ঠাট্টা', 'ইয়ারকি', 'রং', 'মজা' ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে আধিপত্য করিতেছে। বরং কথোপকথনে কিছু নিস্তার আছে। সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ লোকের কাছে, বা শোকদুঃখাদির সময়ে, বা বিষয়কর্ম্মের সময়ে, অনেকে বাঁচাইয়া বলেন। কিন্তু লেখকদিগের নিকট কিছুতেই নিস্তার নাই, 'সুসময়ে' 'অসময়ে' সৎকথায়, কুকথায় ; যেখানে সেখানে ; যখন তখন—রসিকতা করা আজি কালি কতকগুলি লেখকের ব্যবসায়।

"এমত কথা বলি না যে, সকল লেখকই রসিকতা ব্যবসায়ী। কতকগুলিন লেখক বড় বিজ্ঞ। তাঁহারা রসিকতার প্রতি বড় অপ্রসন্ন। তাঁহাদের ধারণা আছে যে, পুত্রশোকাতুরের ন্যায় অনবরত মুখবিকৃতি করিয়া রাখাই পাণ্ডিত্য। রসিকতার সংস্পর্শমাত্র দুরপনেয় কলঙ্কের কারণ। তাঁহাদের কাছে রসিকতার নাম গ্রাম্যতা। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অধিকাংশ সাপ্তাহিক-লেখক এই সম্প্রদায়ভুক্ত।"

এই প্রবন্ধের লেখক প্রচলিত রসিকতাকে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :

"প্রথম—প্রাচীন রসিকতা : কেহ কাহাকেও সম্বন্ধ নিষিদ্ধ কোন দোষারোপ করিতে পারিলেই আপনাকে রসিকতায় পারদর্শী বিবেচনা করেন।...

"ইহারই সম্প্রসারণে দ্বিতীয় প্রকারের রসিকতার সৃষ্টি। কেহ কাহাকেও যে কোন প্রকারের গালি দিলেই মনে করেন যে, আমি বিশেষ রসিকতা করিলাম।...

তৃতীয় শ্রেণীর রসিকরা রসিকচূড়ামণি। অশ্লীলতাই তাঁহাদিগের কাছে রসিকতা। কোন ক্রমে...কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেই তাঁহারা রসিকতার একশেষ করিলেন।...

"আর এক প্রকারের রসিকতা চাপল্য মাত্র। গ্রাম্য ইতর ভাষায় তাহার নাম 'ঝাঁপাইঝোড়া'। অনবরত মুখভঙ্গী, নিয়ত হস্তপদ-সঞ্চালন, রাত্রিদিবা হাসিবার ও হাসাইবার নিষ্ফল উদ্যম এই রসিকতার সামগ্রী।"

যখন বাঙ্গালায় রসিকতার ও রসিকদিগের এই অবস্থা, সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র

হাস্তরসকে নির্ম্মল, তীক্ষ্ণ ও পূত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সাফল্যের প্রমাণ তাঁহার বহু উপন্যাসে, বিবিধ রচনায়, এবং সর্ব্বোপরি 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থদ্বয়ে বিদ্যমান।

রসিকতা অন্যান্য রচনার মতই সমাজের রুচির উপর নির্ভর করে। সেক্সপীয়রের রচনায় যে অশ্লীল উক্তি ও অশ্লীল রসিকতা আছে, তাহার কারণ বুঝিতে হইলে তাঁহার সমসাময়িক সমাজের অবস্থা বুঝিতে হয়; যাঁহারা সমসাময়িক সমাজকেই তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করেন না—তাঁহারাই রসিকতাকে সে সমাজের আবেষ্টনের বাহিরে লইতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। রসিকতায় যিনি রচনার উৎকর্ষ সাধন করেন তিনি শিল্পী—লঘুভাবে জগৎ ও মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। উইলিয়ম শ্যামুয়েল লিলী খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী লেখকদিগের মধ্যে চারি জনকে রসিকতায় বিশিষ্ট আসন প্রদান করিয়াছেন—ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট ও কার্লাইল। জর্জ ইলিয়ট রচনায় করুণার ও বেদনার বিকাশ করিয়াছেন—মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আশঙ্কা ও ব্যথা বিবৃত করিয়াছেন। তাহাই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। লর্ড একটন বলিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার রচনার মূল নীতির সহিত বিজড়িত, বৌদ্ধধর্ম্মের মতে কর্ম্মফল হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই—'ধম্মপদে' লিখিত হইয়াছে—"অন্যায় হইতে অমঙ্গলের উদ্ভব অনিবার্য্য।"—"যদি কেহ মন্দভাবে ভাবিত হইয়া কোন উক্তি করে, তবে গোযানের চক্র যেমন বৃষের পদানুসরণ করে—বেদনা তেমনই তাহার অনুসরণ করে"—হেগেলের উক্তি অনুসারে ঐ মতই "the other half of crime, naturally and inevitably following it."—অপরাধের উহাই অপরার্দ্ধ—স্বাভাবিক নিয়মে—অনিবার্য্যরূপে অপরাধের অনুগামী। যে জর্জ ইলিয়টের রচনার বৈশিষ্ট্য এইরূপ তাঁহাকেও রসরচনাকারীদিগের পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। কেন ইংরেজ সমালোচক তাহা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে—বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র রচনা পাঠই যথেষ্ট। সে সব "হাসির ছলনা করি কাঁদি"—হাসির আবরণে বুকভাঙ্গা বেদনার বিকাশ। তাহার পর কার্লাইল। তাঁহাকে "ঋষিরূপী পরিহাসরসিক" বলা যায়। তিনি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি বলে অপ্রকৃতের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত দেখিয়া কালের চিহ্নের কারণ ও পরিণতি ব্যক্ত করিতেন। তিনিই য়ুরোপের ভাব লক্ষ্য করিয়া বহুকাল পূর্ব্বে

বর্তমান পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবিতা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু প্রবন্ধে সেই ক্ষমতার পরিচয় সপ্রকাশ।

বিশুদ্ধ হাস্য বহুরূপী। ইহার এক রূপ ব্যঙ্গ। ব্যঙ্গকে প্রধানতঃ দুই ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রথম, বুদ্ধিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া খেয়ালের চটুল চাপল্য প্রকাশ; দ্বিতীয়, চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া কল্পনার আত্মবিকাশ। এই ব্যঙ্গ ও পরিহাস উভয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে রবিকরদীপ্ত হীরকখণ্ডের মত শোভা পায়। সে সকল রচনায় ইহাদিগের বাহুল্যও বিস্ময়কর।

হাস্যরসের আর এক রূপ আছে। যে রূপে সে তীক্ষ্ণ বাণের মত লক্ষ্য বিদ্ধ করে। এই বিদ্রূপেও বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"...আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত সরু লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণেধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং।"

সেকালের মোটা রসিকতার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণে—লঙ্কাকাণ্ডে "অঙ্গদ রায়বারে" পাই। অঙ্গদ লঙ্কায় রাবণের সভায় উপস্থিত হইলে রাবণ যখন মায়াবলে শত শত রাবণ হইয়া বসিল, তখন অঙ্গদ ইন্দ্রজিৎকে চিনিয়া—

"অঙ্গদ বলে, শুন, পরে শুন ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসিয়াছে, সবাই কি তোর পিতা॥

*　　*　　*　　*

ধন্য নারী মন্দোদরী, ধন্য সে তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি, ভাব কেমনে রাখে॥

কোন বাপ তোর জন্ম হৈল জামদগ্ন্যের তেজে।
মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
সে সবারে কাজ নাহি, তোর যোগী বাপটি কোথা॥

এ কালের মোটা রসিকতায় যাঁহারা দক্ষ তাঁহাদিগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দীনবন্ধুর উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন। তাঁহাদিগের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অসীম বল, শিক্ষাও বিচিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন সমাজে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। তাহার বিশেষ কারণও ছিল। তাঁহার "দুনিয়ার মাঝে, বাবা, সব হ্যায় ফাঁক" ও "দুনিয়ার মাঝে, বাবা, সব ভরপুর"—কবিতায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সাকরেদী' করিয়াছিলেন। তিনি "মোটা কাজ" করিতে পারিতেন—"অধঃপতন সঙ্গীতে" তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু 'সরু কাজেই' তাঁহার অনুরাগ ছিল। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'তে দিগ্‌গজের কার্য্য অনেক সংস্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি 'সরু কাজ', ভালবাসিতেন বলিয়াই লাঠি ত্যাগ করিয়া সরু লান্‌সেট ধরিয়াছিলেন। সেই লান্‌সেট বসাইয়া তিনি সাহিত্যে অনেক অন্যায়, অত্যাচার, কুসংস্কার—অনেক দৌর্ব্বল্যদুষ্ট অঙ্গ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজও 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'পকেট কেসে' সেই সব লান্‌সেট রহিয়াছে—তাহাদিগের উপযুক্তরূপ ব্যবহারে বাঙ্গালীর, সাহিত্যের, দুষ্ট অঙ্গে অস্ত্রোপচার হইয়া সমাজ-শরীর সাহিত্য-শরীর সবল ও স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যসুন্দর করিবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, তিনি সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ মুক্ত করিয়া দিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন সেরূপ আর কোন সাহিত্যে কোন সাহিত্যরথী করিয়াছেন কি না সন্দেহ। বিজ্ঞানচর্চ্চাই যুরোপের উন্নতির প্রধান কারণ। সেইজন্য বিজ্ঞান-চর্চ্চা-বিমুখ বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানানুরাগী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি 'বঙ্গদর্শনে' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন। বিজ্ঞান শুষ্ক ও কঠোর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের যে বিশ্বাস আছে, তাহা দূর করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বাছিয়া বিজ্ঞানের সরস ও সুন্দর ভাগ দেখাইতেন। 'বিজ্ঞানরহস্য' পুস্তকে সেই সকল প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বলিয়াছি, সে সকল প্রবন্ধে কেবল বিজ্ঞানের সরস ও সুন্দর রূপ দেখান হইত, বিজ্ঞানের সর্ব্বজনবোধ্য কথাই থাকিত। তাই বাঙ্গালায় যখন বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তখন তিনি 'বিজ্ঞানরহস্যের' প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'বিজ্ঞানরহস্য' বাঙ্গালায় বিজ্ঞান সর্ব্বজনপ্রিয় করিবার চেষ্টা। সেইজন্য ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাষার ত্রুটি হেতু 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র দ্বারা যে কাজ সুসিদ্ধ হয় নাই, ভাষার সৌন্দর্য্য হেতু 'বিজ্ঞানরহস্য' সে কাজ সুসম্পন্ন করিয়াছিল। বিজ্ঞান-চর্চ্চায় তাঁহার স্বদেশীয়দিগের আগ্রহ দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহা 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম খণ্ডে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' নামক প্রবন্ধে সপ্রকাশ। মহেন্দ্রলাল সরকার 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' সংস্থাপন জন্য যে অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা উদ্ধৃত করিয়া উহার সাতটি ধারা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং এই অনুষ্ঠানের জন্য "আড়াই বৎসরে বঙ্গ সমাজ চল্লিশ সহস্র টাকা মাত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন" বলিয়া মহেন্দ্রলাল যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি করিয়া লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গধনিগণ আর কলঙ্কভার শিরে কেন বহন করেন? সকলেই অগ্রসর হউন ···একবার মুক্তহস্তে দান করিয়া সমাজ স্থাপন করিয়া স্বীয় ভ্রম দূর করুন; বঙ্গীয় যুবকগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করুন; বঙ্গের শিল্প বিজ্ঞান পুনরুদ্ধার করুন।"

'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র নানা বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সাহিত্যের যেখানে যাহা অভাব ছিল, সর্ব্বদাই তিনি আপনরা বিপুল

বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।" তাঁহার যে সকল প্রবন্ধে সাময়িক কথারই অধিক আলোচনা ছিল, সে সকল পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে সর্ব্বতোমুখী ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি পুনঃপুনঃ পাঠের উপযুক্ত। কিরূপে প্রকৃত সমালোচনায় গুণ ও দোষ বাছিয়া বাহির করিতে হয়, কিরূপে গুণের প্রশংসা ও দোষের নিন্দা করিতে হয়—পুরস্কার ও তিরস্কার দিতে হয়—এই সকল প্রবন্ধে পাঠক তাহা জানিতে পারেন। সেরূপ আলোচনা যেমন সাহিত্য-রসিকের পক্ষেই সম্ভব তেমনই তাহাতে স্রষ্টার কৌশল সপ্রকাশ।

আমরা সাধারণভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার ফল নানা রচনায় আলোচনা করিলেও সে আলোচনা অপূর্ণই রহিয়া গেল। কিন্তু আর তিনখানি পুস্তকের উল্লেখ ব্যতীত তাঁহার প্রতিভার একাংশের উল্লেখই হইবে না। 'সাম্য', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র'—এই তিনখানি পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট কীর্ত্তি এবং এগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ না করিলে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভাবোধ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

'সাম্য' সর্ব্ববিধ সামাজিক অনাচার ও অত্যাচার উচ্ছেদের মূলমন্ত্র। এই বৈষম্যপূর্ণ সংসারে, এই বৈষম্যময় সমাজে, এই বৈষম্যসঞ্জাত বিভাগ-বিভক্ত দেশে—আমাদিগের রাজনীতিক ও সামাজিক অবস্থা যখন বৈষম্যবহুল, তখন এই সাম্য-মন্ত্রের প্রচার কিরূপ দুষ্কর কার্য্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। মনুষ্যমাত্রেরই কতকগুলি সমান অধিকার থাকিবে—রাজা প্রজায় বল, জমিদার রায়তে বল, স্ত্রীপুরুষে বল, বৈষম্য কেবল স্বেচ্ছাকৃত অধিকারের ফলে হইবে। "অধিকারের সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।" বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাম্যবাদ ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালান্তর তিন দেশে তিন জন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই

মহামন্ত্রের মূল মর্ম্ম, 'মনুষ্য সকলেই সমান।' এই স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচার করিয়া তাঁহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্য জাতি দুর্দ্দশাপন্ন, অবনতির পথারূঢ় হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, 'তোমরা সকলেই সমান—পরস্পর সমান ব্যবহার কর।' তখনই দুর্দ্দশা ঘুচিয়া সুদশা হইয়াছে, অবনতি ঘুচিয়া উন্নতি হইয়াছে।" এই তিনজন সাম্যমন্ত্র প্রচারক—প্রথম, শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব—ইনি বৈষম্যপীড়িত ভারতবর্ষের 'উদ্ধার' করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট—ইনি আর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণের "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।' এই উক্তির মত বলিয়াছেন—'অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের কামনা কর, অন্যের প্রতি তুমি সেই ব্যবহার করিও।' তৃতীয় রূশো—ইনি 'কপট অপরিশুদ্ধ রাজ্যশাসন-প্রণালী-জনিত' বৈষম্যবিষ জর্জ্জরিত ফ্রান্সের দুষ্ট অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আগ্নেয়গিরির গৈরিক স্রাবের মত রচনার সম্যক্ পরিচয় দিবার স্থান এ নহে। বিশেষ তিনি এই পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। কেন তাহা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার সাম্য-তত্ত্বের তাৎপর্য্য কি তাহা বলিব :

"...সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক বৈষম্য, নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল; তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং মনুষ্য জাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের ফল। এই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না হইলে মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি নাই। মিল একস্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্ব্বতন কুব্যবাস্থর সংশোধন মাত্র। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জন্মগুণে বড় লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোট লোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ সে তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম,

দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।"

সাম্যতত্ত্ব যে হিন্দু সমাজব্যবস্থা স্রষ্টাদিগের অজ্ঞাত ছিল, তাহা মনে করিবার কারণ থাকিতে পারে না। বহু শতাব্দী পরে হ্যান্স্ এণ্ডারসন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আজও য়ুরোপে উক্ত ও পুনরুক্ত হয়—"কেহ যদি রাজহংসের ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয়, তবে সে সাধারণ হংসের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে জন্মিলে তাহাতে কিছুই আইসে যায় না।" কিন্তু এই উক্তিতেই জন্মগত অধিকারের কথা আছে। আর মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই—স্বয়ম্বর সভায় যে কর্ণের লক্ষ্যভেদার্থ উক্তি হইতে দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না"—সেই কর্ণ সদর্পে বলিয়াছিলেন—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যোঽহং সোঽহং ভরাম্যহম।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম—মমায়ত্তন্তু পৌরুষম্॥"

অর্থাৎ, যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করে, তাহা তাহার আয়ত্ত নহে, কিন্তু পৌরুষ সে অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু বিশৃঙ্খলার উপর স্থায়ী সমাজ গঠিত হয় না—সেইজন্য সমাজের ব্যবস্থা করিতে হয়। অভিজ্ঞতার ও ভূয়োদর্শনের ফলে যে হিন্দু সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহা যে এতকাল স্থায়ী হইয়াছে—কালজয়ী হইয়াছে, তাহার বিশেষ কারণ আছে। আজ কোন কোন য়ুরোপীয় স্বীকার করিতেছেন, হিন্দুরা ধনিকের ও শ্রমিকের স্বার্থে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া সমাজতন্ত্র-বাদের যে রূপ দিয়াছিলেন, তাহা অন্য কোন সমাজে দুষ্প্রাপ্য। সার জর্জ বার্ডউড বলিয়াছেন—

(১) মনুসংহিতা সমগ্র হিন্দু সমাজকে জীবন-যাত্রাপ্রণালীতে ও চিন্তায় ঐক্য দিয়াছে এবং যে শিল্পী-সম্প্রদায়ের তিন সহস্র বৎসরের অনুশীলনে শিল্প সমৃদ্ধ তাহারা সমাজে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থান জন্মমাত্র লাভ করে।

(২) হিন্দু শিল্পীদিগের শিল্পকৌশল অনেকাংশে ভারতের ভূমির অধিকার ও গ্রাম্য সমাজের ফল।

দীর্ঘকাল পরবশ্যতাহেতু সমাজে অনেক আবশ্যক পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব হয় নাই বটে, কিন্তু সেই কারণে যে সকল ত্রুটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সে সকলের সংস্কার প্রয়োজন—সংস্কারে সমস্ত সমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে—হিন্দুর বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইবে—হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইবে, তাহা মনে করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' পুস্তক পুনঃপ্রকাশিত করেন নাই—পাছে উগ্র সংস্কারকামীরা তাঁহার উক্তিতে সংস্কারের নামে সংহারের সমর্থন লাভ করিলেন মনে করেন।

কোন মত প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করিতে কিরূপ রচনার প্রয়োজন, তাহা "সাম্য" পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়!

'ধর্ম্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনুশীলন যে ধর্ম্ম, "ইহা নূতন নহে; পুরাতনের সংস্কার মাত্র।" এই গ্রন্থ মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ-প্রয়াসী করিবার প্রয়াস। ধর্ম্মের সরল ও বিশদ ব্যাখ্যা দুর্লভ কিন্তু গীতায় তাহা লাভ করা যায়। গীতায় দেখা যায়, যাহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। সেইজন্য হৃতরাজ্য ও অপমানিত হইয়াও অর্জ্জুন যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে স্বজন-নিধন অনিবার্য্য বুঝিয়া যুদ্ধে বিরত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্লৈব্যাচ্ছন্ন হইতে নিষেধ করিলেন:

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং তক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!॥"

কেন না, তোমার পক্ষে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য সুতরাং তাহাই ধর্ম্ম—"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্॥" বঙ্কিমচন্দ্রের পর আর একজন বাঙ্গালী মনীষী এই বিষয় অত্যন্ত সরল ও প্রবলভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলিয়াছেন—গৃহস্থের পক্ষে ধর্ম্মাচরণই এই কর্ত্তব্য—মোক্ষ ধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চস্তরের বটে, কিন্তু যে গৃহী তাহার পক্ষে স্বধর্ম্মাচরণই প্রয়োজন। "অহিংসা ঠিক, নির্ব্বেদ বড় কথা; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্বে' সাধারণ সংসারীর সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যের কথা ও কর্ত্তব্যের মীমাংসা এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে মনোজ্ঞভাবে মানুষের বহুধাবিভক্ত কর্ত্তব্যের আলোচনা করিয়াছেন। "সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া—এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মানুষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ-প্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্থানান্তরে বলিয়াছেন—"আমি 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম্ম। সেই মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের উপাদান, আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি।" 'ধর্ম্মতত্ত্বে' তিনি

বুঝাইয়াছেন—"এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।"

"তিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা স্ফূর্ত্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে এই "আদর্শ মনুষ্য" বলিয়াছেন। 'প্রচারে' তিনি বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণের জীবনের উদ্দেশ্য—ধর্ম্মবৃদ্ধি। ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য তিনি দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন—(১) ধর্ম্মপ্রচার (২) ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন।" ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন—মনুষ্যত্বের বিকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র" এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। একদিকে তাঁহার ভক্ত স্বদেশবাসীর বহু শতাব্দীসঞ্চিত অতিরঞ্জনের আবর্জ্জনায় ঐতিহাসিক সত্য বিশেষরূপে আচ্ছন্ন, অপরদিকে অজ্ঞ ও সহানুভূতিশূন্য বিদেশীয়দিগের অবিশ্বাস-সম্ভূত উপহাসে সত্যের পথ সংশয়সঙ্কুল; একদিকে অত্যধিক অত্যুক্তির ফেনপুঞ্জে সত্যের ক্ষীণ প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয় না,—অপর দিকে উৎকট উপহাসে পদে পদে সত্যকেও অসত্য বলিয়া সংশয় অনিবার্য্য হয়। এই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার চেষ্টায় চেষ্টিত হইলেন। যে সকল গ্রন্থ-বর্ণিত :বিষয় এক দল 'ধ্রুবসত্য' ও অপর দল 'গালগল্প' বলেন, বিশ্লেষণবলে তিনি সেই সকল গ্রন্থে বাণত বিষয়ের সত্যাসত্য বিচার করিয়া সত্যের উদ্ধার সাধনের প্রয়াস করিলেন। তিনি যে আদর্শ লইয়া ব্যস্ত—তাহার উপর উভয় পক্ষই খড়্গহস্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সব্যসাচীর মত উভয় দিকে নিশিত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে আদর্শকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিয়াছেন।

যে সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ও বিশ্লেষণ করিয়া 'কৃষ্ণচরিত্র' রচিত সে সকলের প্রত্যেক গ্রন্থই 'সমুদ্রবিশেষ'। অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেই দীর্ঘকাল কাটিয়া যায়। ইংরেজী সাহিত্যের ফরাসী ঐতিহাসিক টেন টেনিসনের পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজ কবিদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"They had carried away and hurried everything to its extremes. Some had called the gigantic legends, piled up dreams...and overloaded the human imagination with tones and fancies...others had buried themselves in metaphysics and morality had mused indefatigably on the human condition and spent their lives in the sublime and the monotonous...."

হিন্দু পুরাণ-লেখকগণের সম্বন্ধে এই কথা সমধিক প্রযোজ্য। তাঁহারা কল্পনা-

বলে কেবল "স্বর্গ মর্ত্ত ধরাতলে প্রচণ্ড" মানুষের মনকে লইয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; পরন্তু ইহকাল-পরকালের রহস্যভেদের চেষ্টাও করিয়াছেন। এইরূপ সব বিরাট গ্রন্থ হইতে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন, কখন কখন বিকৃত, প্রমাণ উদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক সত্য বিবৃত করা যে প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রতিভা এই 'কৃষ্ণচরিত্রে' রচনায় প্রযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ একখানি গ্রন্থই লেখককে অমর করিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট।

যে সকল সমালোচক 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে নানা ত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন এবং মত প্রকাশ করেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ইতিহাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই" তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে—"এই 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে প্রতিভার একটি প্রবল স্বাধীন বল অনুভব করা যায়। সেই বলটি আমাদের একটি স্থায়ী লাভ।...তাহা আমাদের ন্যায় হীনবীর্য্য ভীরুদের পক্ষে একটি প্রধান আশ্রয়দণ্ড।" তাঁহারা ইহাও স্বীকার না করিয়া পারেন না যে, 'কৃষ্ণ চরিত্র' ইতিহাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র সেজন্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই চেষ্টাই তাঁহার প্রধান গৌরব। কেবল চেষ্টা নহে; তিনি যে প্রণালীতে কাজ করিয়াছিলেন এবং মনের যে ভাবটি রক্ষা করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালী পাঠক-দিগের শিক্ষাবিধানের পক্ষে মহামূল্য।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা অতি দুরূহ ব্যাপার; কেন না, মিথ্যা ও অতিপ্রাকৃত উপন্যাসের ভস্ম অগ্নি এখানে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে পড়িয়া প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পুনঃসংস্থাপিত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। আমার যতদূর সাধ্য ততদূর আমি করিলাম।

"উপসংহারে দেখা কর্ত্তব্য যে যতটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায়, তত-টুকুতে 'কৃষ্ণচরিত্র' কিরূপ প্রতিপন্ন হইল?

"দেখিয়াছি বাল্যে দৃঢ় শারীরিক বলে আদর্শ বলবান।...

"এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্ব্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।...

"...সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ।... কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, জরাসন্ধ যুদ্ধে। তাঁহার সৈনাপত্যগুণে ক্ষুদ্র যাদব সেনা জরাসন্ধের

সংখ্যাতীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছিলেন। অগণনীয় সেনার জয়, যাদব সেনা দ্বারা অসাধ্য জানিয়া মথুরা পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্ম্মাণার্থ সাগরদ্বীপ দ্বারকার নির্ব্বাচন এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক পর্ব্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী নির্ম্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না।...

"কৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলও চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত। তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ।...

"শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মই তাহার তীব্রোজ্জ্বল প্রমাণ। এই ধর্ম্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে।...কৃষ্ণ-কথিত ধর্ম্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্ব্বলোকহিতকর সর্ব্বজনের আদরণীয় ধর্ম্ম আর কথনও পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।...

"সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্ম্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকল পরম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত।...

"কৃষ্ণের বুদ্ধি চরম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহা সর্ব্বব্যাপিনী, সর্ব্বদর্শিনী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী ইহা আমরা পুনঃপুনঃ দেখিয়াছি। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যতদূর সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় কৃষ্ণ ততদূর সর্ব্বজ্ঞ। অপূর্ব্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব যাহার উপরে আজিও মনুষ্যবুদ্ধি আর যায় নাই তাহা হইতে চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা, কি অশ্বপরিচর্য্যা পর্য্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল।...

"কৃষ্ণের কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা এবং সর্ব্বকর্ম্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধৈর্য্য ও সত্য যে অবিচলিত, এই গ্রন্থ তাহার প্রমাণপরিপূর্ণ। সর্ব্বজনে দয়া ও প্রীতিই এই ইতিহাসে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বলদৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শান্তির জন্য দৃঢ়যত্ন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সর্ব্বলোকহিতৈষী; কেবল মনুষ্যের নহে—গোবৎসাদি তির্য্যকযোনির...প্রতিও তাঁহার দয়া।...তিনি আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি; কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি, আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাহার শত্রু। তাঁহার অপরিসীম ক্ষমাও দেখিয়াছি, আর ইহাও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দেখিলে তিনি অয়োনির্ম্মিত হৃদয়ে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে দণ্ডবিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থে স্বজনের বিনাশেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।...

"এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বলিয়া (তিনি) চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।...

"উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্ব্বত্র, সর্ব্বসময়ে সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ—ধর্ম্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, আত্মনিষ্ঠ, ক্ষমাশীল,... শাস্তা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগতপস্বী।"

অনুশীলনগুণে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্তবৃত্তি এই শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ মানবের আদর্শ বলিয়াছেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে অত্যুক্তি হইতে সত্যের উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণচরিত্র অবিকৃতরূপে পুনরায় ভারতক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন। উপদেশ অপেক্ষা আদর্শ অধিক ফলপ্রদ। কৃষ্ণের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ধর্ম্মপ্রচার তিনি বক্তৃতা দ্বারা করিতেন না। আপনার জীবনের আদর্শের দ্বারা।" তিনি 'ধর্ম্মতত্ত্বে' যে অনুশীলনতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, কৃষ্ণচরিত্রে তাহার ফল দেখাইয়াছেন।

এবার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আর দুইটি রচনার কথা বলিব। উভয়ই ভগ্নাংশ; কিন্তু উভয়ই অমূল্য। প্রথম—গীতার ব্যাখ্যা; দ্বিতীয়—বৈদিক প্রবন্ধ।

আমরা দেখাইয়াছি, তিনি বলিয়াছেন—"কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্ব্বলোকহিতকর, সর্ব্বজনের আদরণীয় ধর্ম্ম আর কখনও পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।" এই ধর্ম্ম গীতায় ব্যখ্যাত, তাই আমাদিগের শিক্ষার নবীন যুগে 'গীতা' বিশেষ আদৃত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই গীতার অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালী পাঠককে সেইরূপ বুঝাইতেছিলেন। বাল গঙ্গাধর তিলকের ও অরবিন্দের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন—গীতার অমূল্য উপদেশ সমাজনীতি, রাজনীতি শাসননীতি,—সর্ব্ব বিষয়েই তুল্যরূপে প্রযোজ্য; এবং গীতার উপদেশে মানবের সকল করণীয় কার্য্যের পথ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই ব্যাখ্যায় তিনি যে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একান্ত বিরলপ্রাপ্য।

পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র বৈদিক প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধদ্বয় ইংরেজীতে রচিত; বেদ সম্বন্ধে য়ুরোপের কুসংস্কার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই সকল প্রবন্ধ ইংরেজীতে লিখিত হয়। তাহার পূর্ব্বে হিন্দুর প্রতিমাপূজা লইয়াও তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক হেষ্টির সহিত বাদানুবাদে ইংরেজীতে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধরচনার পূর্ব্বে তিনি 'প্রচারে' একটি প্রবন্ধে তাঁহার বেদাধ্যয়নের পরিচয় প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত

বৈদিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"যে বন্যার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে, সেই বন্যার আকর্ষণে তাহাকে সর্ব্বদা সংযত করিতে হইবে। এই সকল ক্ষমতাসামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল। সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদপুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন তখন বঙ্গ সাহিত্যের বড় আশার কারণ ছিল; কিন্তু মৃত্যু সে আশা সফল হইতে দিল না এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল, তাহা যে কবে সমাধা হইবে, কেহই বলিতে পারে না।" বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উচ্চশিক্ষার্থী হিন্দু মাত্রেরই বেদের সহিত পরিচয় অত্যাবশ্যক। বৈদিক প্রবন্ধে তিনি একদিকে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য—অপর দিকে তীক্ষ্ণ তর্কশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিলাম; ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কীর্ত্তি। কারণ, ভল্‌টেয়ারের মত তিনিও বলিতে পারেন—"আমার রাজদণ্ড নাই, কিন্তু লেখনী আছে।" রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য-ব্যবসায়ী, তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। বঙ্কিমের প্রতিভা যদি আমাদের পথ খনন করিয়া না দিত, তবে আমরা এত দিনে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ শেষ করিয়া বড়জোর চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠভাগে গিয়া উপনীত হইতাম। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইত না। আজ আমাদের কোন লেখা যদি বয়স্ক লোকের পাঠযোগ্য, শিক্ষিত লোকের সমাদরযোগ্য, বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদযোগ্য হইয়া থাকে, কোন রচনার একটি অংশও যদি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্থায়ী হইবার উপযোগী সুসম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে তাহা অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসাদে। এতদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম্মসংকীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহা বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শিক্ষা এই যে, প্রতিভা মানবের কর্ম্মক্ষেত্রের যে বিভাগেই প্রযুক্ত হউক না কেন, সুপ্রযুক্ত হইলেই অশেষ কল্যাণকর হয়; এবং সেই প্রতিভা অধিকাংশ স্থলে শিক্ষাতীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত একাগ্র শ্রমশীলতার—সাধনার সুচারু সম্মিলন ও সমন্বয় হইতে উদ্ভূত হয়।

পরিশিষ্ট

বিদেশে বঙ্কিমচন্দ্র

কুশাগ্রবুদ্ধি চাণক্য বলিয়াছেন—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

হিন্দুর বিশ্বাস, চরাচর রক্ষার্থ অষ্টদিকপালের সারাংশ গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান বেদব্যাস গীতার সৃষ্টি করেন। বিদ্বানকে রাজার অপেক্ষাও উচ্চস্থান প্রদান বিদ্যাবিলাস হিন্দু সমাজের পক্ষেই সম্ভব। আর নীতিশাস্ত্রকার চাণক্যের এই কথার যাথার্থ্য বর্ত্তমান কালে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, বোধ হয় তাঁর জীবিত কালে সেরূপ হয় নাই। নৃপতির ও নেতার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় থাকে বটে, কিন্তু বিদ্বানের নাম সর্ব্বত্র সমাদৃত। সঞ্জীবচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, "বিক্রমাদিত্যের এক্ষণে সিংহদ্বারের ভগ্নাংশমাত্র আছে; কিন্তু গরিব কালিদাসের 'শকুন্তলা' অদ্যাপি নবপ্রস্ফুটিত কানন-কুসুমের ন্যায় জীবন্ত, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর ও দিগন্তব্যাপী।"

হাঙ্গেরীর প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক জোকাই একস্থানে চিত্রকরের কথায় বলিয়াছেন,— "শিল্পীই প্রকৃত সুখী, নির্ব্বাসনে তাঁহার ভয় নাই; সকল দেশই তাঁহার গৃহ। বিদেশীয় ভাষায় তাঁহার অসুবিধা নাই; তাঁহার চিন্তা যে রূপে আত্মপ্রকাশ করে সে রূপ সর্ব্বজনবোধ্য।" জোকাই চিত্রশিল্পীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে সর্ব্ববিধ শিল্পী সম্বন্ধেই অন্ততঃ আংশিকরূপে তাহা বলা যায়; সাহিত্যশিল্পী সম্বন্ধেও তাহা তুল্যরূপে প্রযোজ্য। আজ বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিকে মানবের কার্য্যোপযোগী করিয়াছে; দূরত্বের ব্যবধান দূর করিয়াছে; সমগ্র মানবজাতির উদ্রিক্ত জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্যিক মাত্রেরই প্রকৃত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি আজ সর্ব্বজনগোচর করা অসাধ্য নহে। তাই বিদ্বান সর্ব্বত্র আদৃত। মধুপ যেমন সকল ফুলের মধু আহরণ করিয়া আপনার মধুচক্র পূর্ণ করে, য়ুরোপীয় সাহিত্যরসিকগণ তেমনই সকল সাহিত্যের সুন্দর সৃষ্টি আনিয়া আপনাদিগের সাহিত্যের সমৃদ্ধিবর্দ্ধনচেষ্টা করেন। সেই চেষ্টার ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আজ বিস্মৃতির বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। মুসলমান শাসনের শেষ দশায় দেশ-ব্যাপী অশান্তির প্রলয়মূর্ত্তি অন্ধকারে যে সাহিত্যের বিকাশে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, তাহা শান্তির আলোকপাতে অতি দ্রুত বিকশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা

তাহার পরিচয় পাই। এই বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহার কীর্ত্তি অতুলনীয় সেই অক্ষয়-কীর্ত্তি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বিদেশেও যেরূপ আদর লাভ করিয়াছে, তাহাতে চাণক্যের কথাই সকলের মনে পড়িবে।

কেহ কেহ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুকরণের চিহ্ন সন্ধান পাইয়া তাহাকে অবজ্ঞার যোগ্য মনে করেন। তাঁহারা ভ্রান্ত। এই অনুকরণের আভাসে বিস্মিত বা লজ্জিত হইবার কারণ নাই। সমালোচকগণ সত্যই বলিয়াছেন, যখনই কোন ভাষা আপনাকে কোন প্রাচীন ভাষার নির্দ্দিষ্ট নিয়মবন্ধনমুক্ত করিয়া নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে, তখনই প্রথম তাহাতে অনুকরণের ছায়াপাত অনিবার্য্য। পুরাতনকে পরিত্যাগ করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হওয়াই ইহার মৌলিকতা সপ্রকাশ হয়। বিশেষ পরকীয় আদর্শ নিজস্ব করিয়া লওয়াই ইহার শক্তির পরিচায়ক।

যে উপন্যাস অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষাকে সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম ও সর্ব্বজনসমাদৃত করিয়াছিলেন, সেই উপন্যাসের আদর্শ যে তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারীচাঁদ মিত্র ইংরেজী হইতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে নাটকের যেরূপ উন্নতি ও আদর হইয়াছিল, রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংলণ্ডে উপন্যাসের সেইরূপ উন্নতি ও আদর হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই ইংরেজীতে কৃতবিদ্য ও ইংরেজী রচনায় দক্ষ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ইংরেজীতে লিখিত হয়। তিনি যে তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাসত্রয়ের জন্য ইংরেজী সাহিত্যের নিকট ঋণী, সেকথা তিনি বলিয়াছেন।

১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র 'পত্রসূচনায়' তিনি লিখিয়াছিলেন—"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িকপত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন; দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ।...লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না।...আমাদিগের এমন ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।" কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি অল্পকাল মধ্যেই বঙ্গভাষাকে এরূপ সমাদৃত করিয়াছিলেন যে, যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী বঙ্গভাষাকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদিগকে 'কৃতবিদ্য নরাধম' বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সিডনী স্মিথ যেমন বলিয়াছিলেন—"আমি যতদিন পারিয়াছিলাম, ডিকেন্সের

রচনায় আকৃষ্ট হই নাই, resisted Mr. Dickens as long as I could. ; কিন্তু তিনি আমাকে পরাভূত করিয়াছেন,—তেমনই ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকরা বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া শেষে ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। যে ইংরেজের সাহিত্যে মুগ্ধ হইয়া এই পাঠকরা বাঙ্গালা সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিতেন, অল্পকাল মধ্যে সেই ইংরেজের নিকটেও বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা আদর লাভ করে। যে বৎসর 'বঙ্গদর্শনে' উদ্ধৃত উক্তি প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরই 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ' একাদশ বৎসরের মধ্যে একজন ইংরেজ মহিলা কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া ইংরেজ পাঠক সমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা' ইংরেজীতে অনূদিত হইবার এক বৎসর পরেই ক্লেম (Klemm) কর্ত্তৃক জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত হয়। ইংরেজী পাঠক সমাজে যে এই সকল পুস্তক আদৃত হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে, ইংরেজ কর্ত্তৃক অনূদিত পুস্তকগুলি অল্পদিনের মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হয়, এমন কি, বাঙ্গালীর দ্বারা ইংরেজীতে অনূদিত পুস্তকগুলিও—ভাষার ত্রুটি সত্ত্বেও —ইংরেজী পাঠক-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

এই স্থানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ''বিষবৃক্ষ'' ইংরেজীতে অনূদিত হইবার ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে, 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার নয় বৎসরের মধ্যে তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া অধ্যাপক কাওয়েল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'ম্যাকমিল্যানস ম্যাগাজিন' পত্রে তাহার দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। সেই সমালোচনা পাঠে ইংরেজ পাঠক-সমাজ প্রথম জানিতে পারেন, ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালায় একজন প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই সময় হইতেই তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার রসাস্বাদনে উৎসুক হইয়াছিলেন।

এই সমালোচনায় অধ্যাপক কাওয়েল বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষ গল্পের জন্মভূমি। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় গল্পের অর্দ্ধাংশ ভারতে উৎপন্ন হইয়া শত অদৃশ্য পথে প্রতীচীর সাহিত্যে উপনীত হইয়াছিল। য়ুরোপে প্রতিভাশালী আধুনিক লেখকদিগের রচনার প্রদীপ্ত জ্যোতিঃতে প্রাচীন রচনা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান কালে কখন কখন সেই সকল প্রাচীন 'কথা' দেখা যায় বটে, কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রাবল্যে তাহাদিগের স্বরূপ আর থাকিতে পায় না। ভারতে তাহা ঘটে নাই। ভারতে জনসাধারণের নিকট আজও পুরাতন গল্প সমাদৃত। তাই ভারতে উপন্যাস রচনা করিতে হইলে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। ভারতবর্ষে গল্প বলিলেই ব্রত

পালন ফলে নিঃসন্তান নৃপতির অতুলনীয় পুত্রলাভের কথা বলিতে হয়; রাজকুমারী মাত্রকেই স্বয়ংবর সভায় পতিনির্ব্বাচন করিতে হয়। আর সকল গল্পেই জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস হইতে সহজ সম্ভূত ঐন্দ্রজালিক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। অল্পদিন হইতে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালায়—হিন্দুলেখকগণ বিষয়-নির্ব্বাচনে এই সঙ্কীর্ণ উপকরণ-সীমা অতিক্রম করিয়া উপকথার ও অবাস্তরের পরিবর্ত্তে বাস্তব জীবনের ও ইতিহাসের ঘটনা রচনার উপকরণরূপে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে একজন কবি রাজপুতের শৌর্য্যকথা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আর আলোচ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাঙ্গালী গ্রন্থকার পৌরাণিক যুগ ত্যাগ করিয়া বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালের ঘটনা লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্রজালাদির ছায়াপাত নাই; পরন্তু মানবের মনোবৃত্তি ও প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম লইয়াই ইহা রচিত। ইতোমধ্যেই যে পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায় পুস্তকখানি পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। এই পুস্তক যে বাঙ্গালায় এক অভিনব সাহিত্যের অগ্রণী হইবে, এমন আশা করা যায়। এই পুস্তক ভারতে ইংরেজী শিক্ষার ফল। একদল লোক বলিয়া থাকেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষায় কেবল নিপুণ অনুকরণ যন্ত্র গঠিত হয়, ছাত্রগণ পরীক্ষায় অপরিপক্ক সংস্কারের পুনরাবৃত্তি মাত্র করিতে পারে—তাহাদিগের মৌলিকতা নাই। তাহাদিগকে উত্তরীয়ধারী পুস্তকমাত্র বলা যায়। আলোচ্য পুস্তকে সেই ধারণা উন্মূলিত হইবে। যে দুইজন ছাত্র প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, গ্রন্থকার তাঁহাদিগের অন্যতম। ইনি (কলিকাতা) প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ইনি কয়খানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন; তাহার মধ্যে আলোচ্য পুস্তকখানি সমাদৃত। ইহা ইংলণ্ডেও আলোচনার যোগ্য। কারণ, ইহা ইংরেজী ঐতিহাসিক উপন্যাস ভারতে রোপণ-চেষ্টার প্রথম ফল। পুস্তকের বস্তু সম্পূর্ণ দেশীয় বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক। ইহার স্থানে স্থানে প্রতীচ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থকার নিশ্চয়ই কুপারের ও স্কটের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নকলনবিস মাত্র নহেন। উপন্যাসবর্ণিত দৃশ্য ও ব্যক্তি সবই ভারতীয়। সেইজন্য উহা এত সমাদৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকে আকবরের শাসনকালের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দুস্থানে আর কোন সম্রাট আকবরের মত সুপরিচিত নহেন।··· বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা বহুদিন পাঠানের অধীন ছিল—আকবর পাঠানদিগকে জয় করেন। এই ঘটনা ভিত্তি করিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত।

ইংরেজ পাঠক-সমাজে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মিসেস মিরিয়ম নাইট 'বিষবৃক্ষে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে উইলিয়ম হার্শেল 'বিষবৃক্ষের'র অনুবাদ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মিসেস নাইট সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন জানিতে পারিয়া তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় ইংরেজী সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ 'লাইট অফ এশিয়া'র গ্রন্থকার কবি সার এডুইন আর্ণল্ড বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনার বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন—তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে 'বিষবৃক্ষে'র ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু লেখকের বর্ণনাগুণে, চরিত্রবিশ্লেষণনৈপুণ্যে ও ভারতীয় পরিবারের যথাযথ চিত্র অঙ্কনের ক্ষমতায় সে কার্য্য সত্য সত্যই সানন্দে সম্পাদিত হইয়াছিল।

ইংরেজ সমালোচক গস কুমারী তরু দত্তের ফরাসী কবিতার অনুবাদসংগ্রহ পাঠ করিয়া এইরূপ ভাবই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সার এডুইন আর্ণল্ড বলিয়াছেন—'বিষবৃক্ষে'র গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন বাঙ্গালী, তিনি বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁহার যথাযথ বর্ণনাগুণে মুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'মৃণালিনী' ও 'বিষবৃক্ষ' বিশেষ আদৃত।... বঙ্কিমচন্দ্র সমাদরের যোগ্য। তিনি প্রকৃত প্রতিভার অধিকারী। তাঁহার সৃষ্টি নাকি সাহিত্যের নবযুগে উন্নতির সূচনা করিতেছে। এই উপন্যাসে হিন্দুনারীর কোমলতার ও পতিভক্তির যে যথাযথ চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতীচীতে লোক মনে করে, ভারতবর্ষে বরবধূর সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া বাল্যকালেই তাহাদের পরিণয় সম্পন্ন হওয়ায় দাম্পত্য প্রেম ও দাম্পত্য সুখ সম্ভব নহে। কিন্তু সচরাচর ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিকাংশ হিন্দু পরিবারে শান্তি, সুখ, অবিচলিত প্রেম, সীমাহীন পতিভক্তি ও বাৎসল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতীচ্য মহিলার পক্ষে সূর্য্যমুখীর মত স্বার্থত্যাগ অসম্ভব—কিন্তু প্রাচীতে এইরূপ দৃষ্টান্ত কোনরূপেই অসম্ভব নহে।

'বিষবৃক্ষে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার এক বৎসর পরে 'কপাল-কুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এইচ. এ. ডি. ফিলিফস্ এই উপন্যাসের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকদিগের সম্বন্ধে একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করেন। এই প্রবন্ধে

তিনি বলেন, সাহিত্য হিসাবে ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় পাঠযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই; সেই সকলের মধ্যে বাঙ্গালাই সাহিত্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ। ইংরেজের শাসনকালে বাঙ্গালার বহুবিধ উন্নতির উল্লেখ করিয়া লেখক বলেন—দুই বিপরীত-মুখগামী সভ্যতার সঙ্ঘাতে যে সাহিত্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে 'বর্ণসঙ্কর' বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালা উপন্যাস বিদেশ হইতে আমদানী। কিন্তু অপদার্থ মৌলিক রচনা অপেক্ষা অপূর্ব্ব অনুকরণও শ্রেয়ঃ। এ সব সাধারণ কথা। প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে এ সব প্রযোজ্য নহে। তাঁহারা এই নিয়মের ব্যতিক্রম।...'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। তিনি ইংরেজী উপন্যাস হইতে যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রচুর মৌলিকতা থাকায় তিনি অনুকরণকারিমাত্র হয়েন নাই। তাঁহার কোন কোন উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের যথাযথ চিত্র চিত্রিত হইয়াছে।... বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে বহুভাবপ্রকাশক্ষম করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপ্রণালী সারল্য-সন্ধানী, তীক্ষ্ণ ও প্রাঞ্জল। তিনি একদিকে যেমন পূর্ব্বপ্রচলিত ভাষাড়ম্বরবহুল রচনা-পদ্ধতি বর্জ্জন করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই প্যারীচাঁদ মিত্রের সরল কিন্তু নিরাভরণ পদ্ধতিও সংস্কৃত ও সুন্দর করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার এক বৎসর পরেই তাহার জার্ম্মাণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র মিসেস মিরিয়ম নাইট কৃত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক ব্লুমহার্ট লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। আর কোন লেখক তাঁহার মত রচনা-প্রণালীর উন্নতি সাধন ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহার কৃত অপরের অসার রচনার তীব্র সমালোচনা, হিন্দু সমাজের ত্রুটি প্রদর্শন, বিকৃত হিন্দুধর্ম্মোদ্ভূত অমঙ্গলের বর্ণন—এই সকলের ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার রচনা শক্তিশালিনী। তাঁহার পুস্তকে বিস্ময়কর বর্ণনাশক্তি এবং মানবের জীবনের ও চরিত্রের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা লক্ষিত হয়।... জীবনের সায়াহ্নে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মের ও ভগবদ্গীতার সমুচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের প্রচারক হইয়াছিলেন।...হিন্দু সমাজের উন্নতিসাধন ও জীবনের সকল কার্য্যে ধর্ম্মে নির্ভর করিবার শিক্ষা প্রদান "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র উদ্দেশ্য।

য়ুরোপীয় জাতিসমূহের জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহায় বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের চেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য আজ সর্ব্বত্র সমাদৃত। ঋগ্বেদ হইতে 'চৌরপঞ্চাশিকা' পর্য্যন্ত কত সংস্কৃত পুস্তক যে য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে তাহা সহজে নির্ণয় করা দুষ্কর। ফরাসী দার্শনিক টেন যেমন ইংরেজী সাহিত্যের তেমনই জার্ম্মান কোবিদ ওয়েবার ও ইংরেজ অধ্যাপক ম্যাকডনেল প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের এবং হরোউইজ ও ফ্রেজার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

ফ্রেজার তাঁহার গ্রন্থে মুক্তকণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রতীচ্য ভাবসম্ভূত হইলেও সর্ব্বতোভাবে প্রাচ্য। বঙ্কিমচন্দ্র নব্যবঙ্গের প্রথম ও প্রধান সৃষ্টিকারী প্রতিভার অধিকারী। সৃষ্টিতে তিনি তুলসীদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। তাঁহাকে কেবল প্রতীচ্য প্রভাবের ফল বলিলে তিনি তাঁহার দেশের কাব্য-সাহিত্যে পূর্ব্বপুরুষদিগের অর্জ্জিত ও সম্ভূত যে ধনভাণ্ডার লাভ করিয়াছিলেন—তাহা অবজ্ঞা করা হয়। কিন্তু তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনে কি সুফল ফলিতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার দৃষ্টান্ত। যদি ভারতে প্রতীচ্য সভ্যতার সকল জড় চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায় তথাপি রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তরু দত্ত ও তেলাং ইঁহাদিগের নাম ভারতে ইংরেজের কালবিজয়িনী কীর্ত্তিরূপে কালরথ অনুধাবন করিয়া বিদ্যমান থাকিবে।

'কপালকুণ্ডলা'র কথায় ফ্রেজার বলেন, ইহাতে কোথাও বাহুল্য নাই, কোথাও চেষ্টার চিহ্ন লক্ষিত হয় না; যেন নিপুণ শিল্পী অকম্পিত করে অনুধারণ করিয়া অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিতেছেন। সমগ্র প্রতীচ্য সাহিত্যে 'Marriage de Loti ব্যতীত আর কোন পুস্তকের সহিত 'কপালকুণ্ডলা'র তুলনা হয় না।

ফ্রেজারের কথা—যাঁহারা ভারতবাসীর জীবনযাত্রাপদ্ধতি, চিন্তার ধারা অনুভূতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের মত শিক্ষক আর পাইবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘ আলোচনা হইতে আমরা কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

"The whole course of England's mission is clearly to note the power of the old, mark its failing strength, and graft any of its lasting principles of reality on to new ideals. Nowhere better than

in the novels of Bankim Chandra Chatterjee can the full force of this strife between old and new be traced...The English reader must not be surprised if in the novel of the greatest novelist India has seen, there is much of Eastern form, much of poetic fancy and spiritual mysticism alien to a Western craving for objective realism. Bankim Chandra Chatterjee, with all the insight of Eastern poetic genius, with all the artistic delicacy of touch so easily attained by the subtle deftness of a high caste native of India, or a Pierre Loti weaves a fine spun drama of life, fashioning his characters and painting their surroundings with the same gentle touch, as though his fingers worked amid the frail petals of same flower, or moved along the lines of fine silk, to frame therewith a texture as unsubstantial as the dreamy fancies with which all life is woven, as warp and woof."

ফ্রেজার যে কয়জন মনীষী ভারতীয়কে ভারতে ইংরেজ শাসনের কালজয়ী কীর্ত্তি বলিয়াছেন, এই সঙ্গে যে ইংরেজ প্রভৃতি সাহিত্যিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ঋণ অবশ্য স্বীকার্য্য। এক সময়ে শ্রীরামপুরে ইংরেজ খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের পালন হইয়াছিল। বাঙ্গালা পুস্তক 'লণ্ডন নগরে ছাপা' হইয়াছে। তাহার পর সেই সাহিত্যের বহু গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া ইংরেজ সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতেও চাণক্যের কথা মনে হয়:

"বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

আজ কেবল বাঙ্গালীই বাঙ্গালা গ্রন্থের পাঠক নহেন, পরন্তু প্রতিভাবান লেখকের রচনার পাঠক আজ—অনুবাদে—দুস্তর সাগরের পারে ও দুরারোহ পর্ব্বতের অপর পারে—জগতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধে ফিলিপস বলিয়াছেন, ইতিহাসের ও কবিতার তুলনায় উপন্যাসে অনেক সুবিধা আছে। উপন্যাসে বর্ণিত যুগের আচার-ব্যবহার বেশ-ভূষা জানিতে পারা যায়। এই বিষয়ে

বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকের অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে। তাঁহারা যদি বাঙ্গালার গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের বর্ণনা করেন, ভূস্বামীর সহিত প্রজার সম্বন্ধ, মোকদ্দমা, আদায়, ব্যাধি, হিন্দুবিধবার আত্মত্যাগ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয় করেন তবে তাঁহাদিগের উপন্যাস যে বিশেষ আদৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফ্রেজার বলিয়াছেন, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকের ব্যবহারোপযোগী স্তূপাকার উপকরণ এখনও অব্যবহৃত রহিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদিগের পথিপ্রদর্শক, তিনি সে সকল উপকরণের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা বলিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরেজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।" প্যারীচাঁদের দ্বারা যে কার্য্য সুসিদ্ধ হয় নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছিল। তিনিই প্রথম স্বীয় কৃত কার্য্যের দ্বারা বাঙ্গালীকে ও সমগ্র সভ্য জগৎকে বুঝাইলেন, বাঙ্গালীর ঘরে সাহিত্যের যে উপাদান বিদ্যমান, তাহা লইয়া প্রকৃত প্রতিভা অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারে এবং সে সৌন্দর্য্য বিশ্ববাসীকে আনন্দ দান করে। তিনি বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিককে ব্যবহারোপযোগী প্রভূত উপাদানের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজী উপন্যাসের সহিত এবং ইংরেজীর অনুবাদের সহায়তায় যে ফরাসী উপন্যাস সূক্ষ্ম শিল্পে বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে ইংরেজী উপন্যাসকে নিষ্প্রভ করে, তাহার সহিতও বাঙ্গালী পরিচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেই সেই পরিচয়ের সুফল ফলিতেছে। বাঙ্গালায় ছোটগল্পই এই পরিচয়ের ফল। ছোটগল্পের রচনায় বহু ইংরেজী লেখক সাফল্য লাভ করেন নাই। কিন্তু মোপাঁসা, বালজাক প্রভৃতি বহু ফরাসী লেখকের ছোটগল্প হীরকের ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল। ইংরেজী শিক্ষার ফলে সেই সকল লেখকের রচনার সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় হইয়াছে।

এ আশা অবশ্যই করা যায় যে, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত উপাদানের সদ্ব্যবহার করিয়া বিদেশের লেখকদিগের অসাধারণ সাফল্যের

কারণ সন্ধানে সমর্থ হইয়া—আমাদিগের ঘরের সামগ্রী লইয়া সাহিত্যে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবেন, তাহাতে কেবল আমাদিগের ঘরই সুন্দর হইবে না—পরন্তু তাহা পরেরও প্রশংসা লাভ করিবে।

বাঙ্গালার যে সকল ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা চিত্রিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ললাটে গৌরবসমুজ্জ্বল টিকা অঙ্কিত করিয়া দিবেন, আমাদিগের আশার অবকাশ আছে তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হইবেন না—বাঙ্গালার প্রথম ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্র ও প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কেবল পাঠকদিগের চিত্তরঞ্জনের জন্য, কেবল তাঁহাদিগের আনন্দ বিধানের জন্য উপন্যাস রচনা করেন নাই; পরন্তু উপন্যাসের উচ্চ আদর্শ ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আর তাঁহারা বিমলীর কথা মনে রাখিবেন—আমাদিগের জ্ঞানের ও উদারতার প্রসার সাধনই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। তাহা হইলে তাঁহারা বাঙ্গালীর ও জগদ্বাসীর চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসাধারণের শিক্ষাবিধানও করিতে পারিবেন। আর চূতমুকুলগন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরের মত সাহিত্য-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট পাঠক-সম্প্রদায় চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের সৃষ্ট সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া আপনাদিগের সৌন্দর্য্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াধন্য হইবেন।

পরিশিষ্ট

॥ ২ ॥

(বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা)

১১ই আষাঢ় ১২৪৫ বঙ্গাব্দে—২৭শে জুন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম।

১৮৪৪ খৃঃ— মেদিনীপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ।

১৮৪৯ খৃঃ—হুগলী কলেজে পাঠারম্ভ।

১৮৫২ খৃঃ—'সংবাদ প্রভাকরে' প্রথম পদ্য রচনা প্রকাশ।

১৮৫৩ খৃঃ—'ললিতা' ও 'মানস' রচনা।

১৮৫৪ খৃঃ—জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার।

১৮৫৬ খৃঃ—'ললিতা' ও 'মানস' প্রকাশ। সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার।

১৮৫৭ খৃঃ—প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ।

১৮৫৮ খৃঃ—বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্তি; 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'পত্রে' "রাজমোহন্‌স ওয়াইফ" নামক ইংরেজী উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ।

১৮৬৫ খৃঃ—'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ।

১৮৬৭ খৃঃ—'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশ।

১৮৬৯ খৃঃ—বি-এল পরীক্ষায় সাফল্যলাভ, 'মৃণালিনী' প্রকাশ। 'হিন্দুর পূজা-উৎসবের উৎপত্তি' সম্বন্ধে ইংরাজীতে প্রবন্ধ পাঠ।

১৮৭০ খৃঃ—'বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য'—ইংরেজীতে প্রবন্ধ পাঠ।

১৮৭২-৭৩ খৃঃ—'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ, বঙ্গদর্শনে "বিষবৃক্ষ" এবং বহু প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৮৭৩ খৃঃ—'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' পুস্তকাকারে প্রকাশ। 'সাধারণী'তে "জাতিবৈর" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৮৭৩-৭৪ খৃঃ—"বঙ্গদর্শনে" 'যুগলাঙ্গুরীয়' গল্প প্রকাশ এবং 'চন্দ্রশেখরে'র প্রকাশারম্ভ; বঙ্গদর্শনে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৮৭৪ খৃঃ—'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'লোকরহস্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

১৮৭৪-৭৫ খৃঃ—'বঙ্গদর্শনে' 'চন্দ্রশেখর' সমাপ্ত ও 'রজনী' প্রকাশ আরম্ভ।

১৮৭৫ খৃঃ—'চন্দ্রশেখর' ও 'বিজ্ঞানরহস্য' পুস্তকাকারে প্রকাশ।

১৮৭৫-৭৬ খৃঃ—'বঙ্গদর্শনে' 'রজনী' সমাপ্ত ও 'রাধারাণী' প্রকাশিত; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশ আরম্ভ।

১৮৭৬ খৃঃ—'কমলাকান্তের দপ্তর' (প্রথম ভাগ) ও 'বিবিধ সমালোচন' পুস্তক প্রকাশ : 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা' রচনা (১২৮৩ বঙ্গাব্দ)।

১৮৭৭ খৃঃ—'রজনী' পুস্তকাকারে প্রকাশ ; 'উপকথা', ('ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী') প্রকাশ।

১৮৭৮ খৃঃ—'কবিতা-পুস্তক' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ।

১৮৭৯ খৃঃ—'প্রবন্ধপুস্তক' প্রকাশ।

১৮৮০ খৃঃ—'বঙ্গদর্শনে' (সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত) 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' প্রকাশ।

১৮৮১ খৃঃ—'বঙ্গদর্শনে' 'আনন্দমঠ' প্রকাশ আরম্ভ।

১৮৮২ খৃঃ—খৃষ্টধর্ম্মযাজক হেষ্টির সহিত হিন্দু পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বিতর্ক। 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ' পুস্তকদ্বয় প্রকাশ ; 'বঙ্গদর্শনে' 'দেবীচৌধুরাণী' প্রকাশ আরম্ভ।

১৮৮৩ খৃঃ—'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১৮৮৪ খৃঃ—'নবজীবনে' 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র প্রবন্ধ প্রকাশ আরম্ভ। 'প্রচারে' 'সীতারাম', 'কৃষ্ণচরিত' প্রকাশ আরম্ভ। 'প্রচারে' বেদ সম্বন্ধীয় আটটি প্রবন্ধ ও 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ও 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' প্রবন্ধ প্রকাশ। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রকাশ ; 'দেবীচৌধুরাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশ।

১৮৮৫ খৃঃ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতা-সংগ্রহে'র ভূমিকা রচনা।

১৮৮৬ খৃঃ—'কৃষ্ণচরিত' পুস্তকা'কারে প্রকাশ ও 'প্রচারে' শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র ভাষ্য প্রকাশ আরম্ভ।

১৮৮৭ খৃঃ—'সীতারাম' পুস্তকাকারে প্রকাশ ; 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রকাশ।

১৮৮৮ খৃঃ—'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'সীতারাম' (পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশ।

১৮৯২ খৃঃ—'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধ—ক্যানিং লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত প্যারীচাঁদের গ্রন্থাবলীর (লুপ্তরত্নোদ্ধার) ভূমিকারূপে রচনা।

১৮৯৩ খৃঃ—'সঞ্জীবনীসুধা' সম্পাদন।

১৮৯৪ খৃঃ—মৃত্যু (২৬শে চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দ)।

॥ ৩ ॥

'আনন্দমঠ' ও মুসলমান

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয়, তখন এ দেশে জাতীয় আন্দোলন কেবল বাঙ্গালায় শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হইতেছে এবং বাঙ্গালার সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যান্য প্রদেশে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। তখনও কংগ্রেস কল্পিত হয় নাই।

এত দিন পরে বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায় আদমশুমারের হিসাবে বাঙ্গালায় (সে কালের বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় গঠিত বাঙ্গালায় নহে—বিহার ও উড়িষ্যা-বর্জ্জিত বাঙ্গালায়) সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিজেতা ইংরেজের কৌশলে রচিত ম্যাকডোন্যাল্ডের সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার ফলে ব্যবস্থা পরিষদেও প্রাধান্যলাভ করিয়া 'আনন্দমঠে'র প্রচার নিষিদ্ধ করিবার প্রয়াস করিতেছেন।

যে পুস্তক বিশ্বসাহিত্যে সুপরিচিত এবং যাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অলঙ্কার, এতদিন পরে তাহাতে বাঙ্গালার মুসলমানের আপত্তির কারণ যে মনোযোগ সহকারে বিবেচ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার কারণ, এ দেশে ইংরেজ সরকার এককালে দীনবন্ধুর একখানি নাটক নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কয়খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস সেইগুলির পরিশিষ্টাংশের জন্য (সেই অংশে ইংরেজের রচিত পুস্তকাদি হইতে পুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলির প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছিল) নিষিদ্ধ করিয়াছেন, কয়খানি নাটক নিষিদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং মুসলমানপ্রধান সচিবসঙ্ঘের নির্দ্দেশ এবং অ-মুসলমান সচিবদিগের মৌন সমর্থনে 'আনন্দমঠ'ও নিষিদ্ধ হইতে পারে। বিশেষ মুসলমান শিক্ষা-সচিবের নির্দ্দেশে যে ভাবে ইতোমধ্যেই ইতিহাসের অঙ্গহানি করা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এই আশঙ্কার কারণ প্রবলই হইতে পারে।

মুসলমানদিগের 'আনন্দমঠে' আপত্তির কারণ—ইহাতে মুসলমান-বিদ্বেষ সপ্রকাশ। এই আপত্তি যদি সকারণ হয়, তাহা হইলেও তাহা কোন সাহিত্যশিল্প-নিদর্শন নিষিদ্ধ করিবার কারণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, ইহাই আমাদিগের মত। সেক্সপীয়রের নাটকে ইহুদীদিগের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর উক্তি কোন কোন পাত্রের কথায় থাকিলেও ইহুদীরা কখন উহা নিষিদ্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করেন

নাই এবং গিবনের ইতিহাস হইতে 'ওয়েলসের পুস্তক পর্য্যন্ত বহু ইংরেজী পুস্তকে মুসলমানদিগের পক্ষে অপ্রীতিকর মত গ্রন্থকারদিগের দ্বারা ব্যক্ত হইলেও নিরপেক্ষ আইন সে সকল নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হয় নাই। আমরা যতদূর সংবাদ লইতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়—তুর্কী, মিশর প্রভৃতি মুসলমান-শাসিত দেশেও এই সকল পুস্তকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। অথচ যে দেশে মুসলমানরা স্বাধীন নহেন, পরন্তু ইংরেজের অধীন, সেই দেশেই তাঁহারা এইরূপ পুস্তকের প্রচার নিষিদ্ধ করিতে প্রয়াস করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের দৌর্ব্বল্যের হাস্যোদ্দীপক দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

কিন্তু মুসলমানদিগের আপত্তি যে অকারণ এবং বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত, তাহা নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া 'আনন্দমঠ' পাঠ ও আলোচনা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বরং তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, যে অবস্থায় বাঙ্গালার কতকগুলি লোকের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে বর্ণিত এদেশের তৎকালীন মুসলমানদিগের—বিশেষ মুসলমান শাসকদিগের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর উক্তি ব্যক্ত করাইয়াছেন, সে অবস্থায় তাহারা তাহা না করিলেই অস্বাভাবিক হইত—সে অবস্থায় লোকের পক্ষে শাসক-দিগকে শ্রদ্ধার ও প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাই অসম্ভব। তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গালায় যাহা হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে বলা যায়—

—"a great outcry arose, not only against the men who had jobbed and blundered, but against the system under which they worked."

সেই অবস্থা কি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা 'আনন্দমঠে' মুসলমানদিগের আপত্তি সাধারণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি :—

(১) মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদসাধনে আগ্রহ ;

(২) তুলনায় সমালোচনায় মুসলমানগণের অধঃপতনদশায় তাহাদিগের নিকৃষ্টতা প্রদর্শন।

প্রথমের সমর্থনে ভবানন্দের উক্তিই যথেষ্ট :

"এই নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে ?'

দ্বিতীয়ের সমর্থক—ভবানন্দের ইংরেজের সহিত তৎকালীন মুসলমানগণের তুলনা :

"ধর। এক—ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—

সরবৎ খুঁজিয়া বেড়ায়; ধর—তার পর, ইংরেজদের জিদ আছে—যা ধরে তা করে—মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না। তার পর শেষ কথা সাহস—কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়ে না—সুতরাং একটা গোলা দেখে দশ জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানেরা গোষ্ঠীশুদ্ধ পালায়—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরেজ পলায় না।"

আমরা প্রথমোদ্ধৃত উক্তির কারণ যে ঐ উক্তির প্রথমাংশেই আছে, তা পরে. দেখাইব এবং প্রথম উক্তির সহিত দ্বিতীয় উক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও দেখাইব; কারণ অধঃপতন যেমন বাঙ্গালায় মুসলমান শাসকদিগের কুশাসনের কারণ, কুশাসন তেমনই তাঁহাদিগের অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত ও সুগম করিয়াছিল—পশুত্ব শাসকোচিত গুণ নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

'আনন্দমঠের' আখ্যানবস্তু যে সময়ের, তখন বাঙ্গালার ব্যবস্থা অধঃপতিত শাসকদিগের কুশাসন অপেক্ষাও প্রাকৃতিক নির্য্যাতনে শোচনীয় হইয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙ্গালায় কিরূপ আতঙ্কজনক, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে আর বলিয়া দিতে হইবে না। তাহার ফলে বাঙ্গালার এক-তৃতীয় ভাগ অধিবাসীর জীবনান্ত ঘটে, এবং লোকের অভাবে যেমন কৃষিক্ষেত্র অকর্ষিত অবস্থায় পতিত থাকে, তেমনই লোকের বাসস্থান শ্বাপদের আশ্রয়ে পরিণত হয়। তখনও এ দেশের শাসনভার ইংরেজ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নাই—কেবল কয় বৎসর পূর্বে তাহারা দেওয়ানী পাইয়াছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও অনাচার; দেশের অত্যাচারপীড়িত লোক ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের দৌরাত্ম্যে ও ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারে নিঃস্ব হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার অবস্থার যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই এ বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে :—

"১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম,

বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

ইংরেজ নবাবকে বৎসরে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা দিতেন এবং নবাব উহার অর্দ্ধাংশ দিল্লীর বাদশাহকে দিতেন।

নবাব তখন পুত্তলিকামাত্র ("A puppet Nawab was still maintained at Murshidabad") আর দেশে কোন দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিলে সে জন্য কোন্ পক্ষ অর্থাৎ নবাব কি ইংরেজ কোম্পানী দায়ী, তাহা স্থির করা—দায়িত্ব কাহার তাহার নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব ছিল। "There was thus a divided responsibility and when any disaster occurred it was impossible to find out who was really to blame."

"বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপরে।......... খাজনা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা হইতে আমরা মন্বন্তরের বিষয় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা একসন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোক ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে কিছুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহণ ফলিয়াছিল, রাজপুরুষরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোক আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুইসন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।"

তখনও দেশে শস্যসঞ্চয়ের প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই; নহিলে ১১৭৬ সালের পূর্ব্বেই

সর্ব্বনাশ হইত। সেই প্রথাহেতু সর্ব্বনাশ কিছু বিলম্বিত হইল। তাহা বিলম্বিত হইল বটে, কিন্তু নিবারিত হইল না। কাজেই—

"লোক প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, জোৎজমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে মেয়ে স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।"

এই যে দেশত্যাগ—ইহা এ দেশের হিন্দু কৃষকদিগের পক্ষে প্রায় মৃত্যুরই নামান্তর। কারণ, এ দেশের হিন্দু কৃষক ধর্ম্ম, সামাজিক সম্বন্ধ প্রভৃতিতে এতই ও এমনভাবে জড়িত যে, তাহার পক্ষে স্থান ত্যাগ প্রায় অসম্ভব। পূর্ব্বে সকল দেশেই অবস্থা এইরূপ ছিল—কিন্তু কোথাও তাহা এ দেশের হিন্দু সমাজের মত প্রাবল্য লাভ করে নাই। ঐতিহাসিক হাণ্টার ইহা লক্ষ্য করিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন :—

"Among an old-fashioned rural community there are grave deterrents to changing one's abode. Localities exercise an influence which modern Englishmen are wholly unable to comprehend.···Such ties attain their maximum strength in India. They have struck their roots in the religion, the superstitions, and the neccessities of the people. The whole social system of the Hindus is one continuous chain, from which, if a link drops out, it finds nothing to attach itself to, and no recognised place to fill.........

এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙ্গালার সমাজ-ব্যবস্থায় একরূপ বিপ্লব প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। একদিকে তাহা লোকক্ষয় করায় বাঙ্গালায় যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—"আমি এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, হিন্দুস্থানে কোম্পানীর অধিকৃত অংশের এক-তৃতীয়াংশ

এখন বন্যজন্তুর আবাস—অরণ্য।" আর এক দিকে ইহা লোককে গৃহ ও গ্রাম ত্যাগে বাধ্য করায় সামাজিক অবস্থার অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

এই দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয়ের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়াছেন; কারণ, তৎকালে তাহা নির্ণয়ের কোন চেষ্টাই হয় নাই। গ্রাণ্টের মতে বাঙ্গালার অধিবাসীর এক-পঞ্চমাংশ, মার্শম্যানের মতে এক-তৃতীয়াংশ ও মীলের মতে আট ভাগের পাঁচ ভাগ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন কার্টিয়ার ইংরেজ কোম্পানীর কর্ত্তা। তিনি প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করেন নাই। তাই 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে কোন লেখক লিখিয়াছিলেন,—চারিদিকে অন্নাভাবে মরণাহত লোকদিগের জন্য ইংরেজ সরকার কি করিয়াছিলেন? "To our everlasting shame be it said,—nothing aye, literally nothing!"

অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড মেকলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইরূপ:—

"যে সকল কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোক কখন জনসাধারণের সম্মুখে অনবগুণ্ঠিতা হয়েন নাই, তাঁহারাও অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া পথিকদিগের সম্মুখে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শিশুদিগের জন্য একমুষ্টি চাউল ভিক্ষা করিতেন। বিজেতা ইংরেজদিগের গৃহদ্বার ও উদ্যানের সম্মুখে জাহ্নবীর প্রবাহে প্রতিদিন সহস্র সহস্র শব ভাসিয়া যাইত। কলিকাতার রাজপথ মৃতে ও মরণাহতে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারাও দৌর্ব্বল্যহেতু মৃত আত্মীয়-স্বজনের শব শ্মশানে বা নদী পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতে অশক্ত ছিল—এমন কি দিবালোকে যে বহু শৃগাল ও শকুনি অনায়াসে শব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া উদরপূর্ত্তি করিত, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার সামর্থ্যও তাহাদিগের দেহে ছিল না।"

তখন কলিকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের পক্ষ হইতে বিলাতে লিখিত হয়:—

"It is scarcely possible that any description could be an exaggeration."

অর্থাৎ—কোন বিবরণেই অবস্থা অতিরঞ্জিত করা যায় না।

এই দুর্ভিক্ষ যে সময় আরম্ভ হয়, তখন একজন ইংরেজ কোম্পানীর চাকরী লইয়া কলিকাতায় উপনীত হয়েন। তিনি (জন শোর) ক্রমে পদোন্নতি লাভ করিয়া লর্ড টেনমাউথ হইয়াছিলেন। তিনি যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, জীবনে কখন তাহা তাঁহার স্মৃতিপট হইতে অপনীত হয় নাই। তিনি যখন উচ্চপদে অবস্থিত, তখন

অন্নকষ্টের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিলেই—পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতায়—বিচলিত হইয়া প্রতীকারোপায় চিন্তা করিতেন; তিনি যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের "চিরস্থায়ী" ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি বলিয়াছিলেন—যে দেশের এক-তৃতীয়াংশ "পতিত" এবং যাহার জনসংখ্যাও ভূমির তুলনায় অর্ধেক, সে দেশে "চিরস্থায়ী" বন্দোবস্ত করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

একান্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি তাঁহার দৃষ্ট অবস্থার কোন বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই; করিলে আমরা বে-সরকারী প্রত্যক্ষদর্শীর নির্ভরযোগ্য বিবরণে বঞ্চিত থাকিতাম না। তিনি কবিতায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে শীর্ণকায়, কোটরগতচক্ষু, মৃত্যুচ্ছায়াপাণ্ডুবর্ণ ক্ষুধিতদিগের চিত্র যেন নয়নের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে; শিশুর ক্ষীণ কণ্ঠের ক্রন্দন ও জননীর আর্তনাদ যেন শ্রবণপথে প্রবেশ করে; মৃতস্তূপের মধ্যে শৃগাল ও শকুনের সানন্দ বিচরণ আমরা কল্পনানেত্রে দেখিতে পাই। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue;
Still hear the mothers' shrieks and infant's moans,
Cries of despair and agonising groans
In wild confusion dead and dying lie;—
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, as midst the glare of day
They riot unmolested at their prey!
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface."

লোকের এই দুঃসময়ে ইংরেজ কোম্পানীর ভৃত্যগণ খাদ্যশস্যের ব্যবসা করিয়া বিশেষ লাভবান্ হয়—অর্থাৎ তাহারা দেশবাসীর মৃত্যুর বিনিময়ে অর্থলাভ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

এই সংবাদ বিলাতেও প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে কেবল যে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের "রেগুলেটিং" আইন, ও ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়া" আইন (পীটের) বিধিবদ্ধ হয় তাহাই নহে; পরন্তু কবি ক্যাম্পবেল নিম্নলিখিতরূপে তাঁহার বিরক্তি ও ক্রোধ ব্যক্ত করেন:—

"Rich the gem's of India's gaudy zone,
And plunder pil'd from kingdoms not their own.
Degenerate trade ! thy minions could despise
The heart-born anguish of a thousand cries ;
Could look with impious hands their teeming store.
While famish'd nations, died along the shore ;
Could mock the groans of fellow-men and bear
The curse of kingdoms peopled with despair ;
Could stamp disgrace on man's polluted name,
And barter, with their gold, eternal shame."

বাঙ্গালার প্রজাদিগের সর্ব্বনাশের দূরাগত সংবাদে বিলাতে কবির মনে এইরূপ বিক্ষোভ লক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু এদেশে ও বিদেশে কেহই তাহাদিগের অবস্থার প্রতীকারচেষ্টা করেন নাই। তৎকালে যিনি বাঙ্গালার নবাব—অর্থাৎ শাসনের জন্য দায়ী, তাঁহার কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—তিনি গুলি খাইতেন ও ঘুমাইতেন। আর যাঁহারা রাজস্ব আদায় করিতেন তাঁহারা ? তাঁহারা এ বিষয়ে তাঁহাদিগের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতেন কি না এবং উপলব্ধি করিলেও স্বীকার করিতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ, তাঁহারা রাজস্ব আদায়ে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদিগের রাজস্ব-সংগ্রাহকদিগের অত্যাচারের কথা আমরা পরে বলিব। যখন লোক অন্নাভাবে প্রাণ হারাইতেছিল, তখন মুসলমান শাসকের অধীনস্থ ইংরেজ কোম্পানী লোকের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া কিরূপে তাহাদিগের নিকট হইতে অধিক রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ প্রদানের পূর্ব্বে আমরা বাঙ্গালার এই দুর্ভিক্ষের ফল সম্বন্ধে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথা পাঠকগণকে উপহার দিব। দুর্ভিক্ষের দুই বৎসর পরে তিনি দুর্ভিক্ষের ফল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বাঙ্গালার নানা স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া তাঁহার মত প্রকাশ করেন—বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের এক-তৃতীয়াংশ অনাহারে বা দুর্ভিক্ষের অন্যবিধ ফলে প্রাণত্যাগ করে।

হাণ্টার বলিয়াছেন :—

"It represents an aggregate of individual suffering which no European nation has been called upon to contemplate within historic times."

দুর্ভিক্ষের ২০ বৎসর পরে বাঙ্গালার জনসংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৩ কোটি নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে, ৯ মাসের মধ্যে অন্ততঃ ১ কোটি লোকের মৃত্যু হয়।

দুর্ভিক্ষের পর কয় বৎসর সুজন্মা হয়—ধরিত্রী পরবর্ত্তী ৩ বৎসর শস্যপূর্ণা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দানে বাঙ্গালার পূর্ব্বসমৃদ্ধি ফিরিয়া আইসে নাই; বাঙ্গালা তখন জনবিরল—মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে বাঙ্গালার জনসংখ্যা এক-তৃতীয় ভাগ হ্রাস পায়; জুন মাসে ১৬ জনে ৬ জনের মৃত্যু ঘটে এবং তখন আশঙ্কা হয় বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসীর মৃত্যু হইবে। বর্ষাকালে ও তাহার পরে ইংরেজ কোম্পানী বিলাতে শ্রমক্ষম কৃষক ও শিল্পীদিগের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ দেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কৃষিকার্য্যের সময়ে শোচনীয় অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। তখন দেখা যায়—বাঙ্গালায় ভূমিকর্ষণের উপযোগী লোক-সংখ্যা নাই।

এই অবস্থায়ও যে বাঙ্গালায় বিষম বিপ্লব উদ্ভূত হয় নাই—বাঙ্গালীর সহ্য করিবার অসাধারণ ক্ষমতাই তাহার কারণ। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষে এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বাঙ্গালী যথেষ্ট দিয়াছিল। হাণ্টার সেই সময়ের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—

"The Bengali bears existence with a composure that neither accident nor chance can ruffle. ......The emotional part of his nature is in strict subjection; his resentment enduring, but unspoken."

লোকের এই দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া যে কোম্পানীর বহু ইংরেজ ও ভারতীয় কর্ম্মচারী ধনী হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ২৮শে আগষ্ট তারিখে বিলাত হইতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টারস এই বিষয়ে লিখেন:—

"We are led to these reflections by perusing the letters from Mr. Becher and Mahomed Reza Khan, which accuse the gomastas of English gentlemen (i. e. English servants of the company) not barely for monopolizing grain, but for compelling the poor ryots to sell even the seed requisite for the next harvest."

"Rich the gem's of India's gaudy zone,
And plunder pil'd from kingdoms not their own.
Degenerate trade ! thy minions could despise
The heart-born anguish of a thousand cries ;
Could look with impious hands their teeming store.
While famish'd nations, died along the shore ;
Could mock the groans of fellow-men and bear
The curse of kingdoms peopled with despair ;
Could stamp disgrace on man's polluted name,
And barter, with their gold, eternal shame."

বাঙ্গালার প্রজাদিগের সর্ব্বনাশের দূরাগত সংবাদে বিলাতে কবির মনে এইরূপ বিক্ষোভ লক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু এদেশে ও বিদেশে কেহই তাহাদিগের অবস্থার প্রতীকারচেষ্টা করেন নাই। তৎকালে যিনি বাঙ্গালার নবাব—অর্থাৎ শাসনের জন্য দায়ী, তাঁহার কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—তিনি গুলি খাইতেন ও ঘুমাইতেন। আর যাঁহারা রাজস্ব আদায় করিতেন তাঁহারা ? তাঁহারা এ বিষয়ে তাঁহাদিগের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতেন কি না এবং উপলব্ধি করিলেও স্বীকার করিতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ, তাঁহারা রাজস্ব আদায়ে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদিগের রাজস্ব-সংগ্রাহকদিগের অত্যাচারের কথা আমরা পরে বলিব। যখন লোক অন্নাভাবে প্রাণ হারাইতেছিল, তখন মুসলমান শাসকের অধীনস্থ ইংরেজ কোম্পানী লোকের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া কিরূপে তাহাদিগের নিকট হইতে অধিক রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ প্রদানের পূর্ব্বে আমরা বাঙ্গালার এই দুর্ভিক্ষের ফল সম্বন্ধে ওয়ারেন হেষ্টিংশের কথা পাঠকগণকে উপহার দিব। দুর্ভিক্ষের দুই বৎসর পরে তিনি দুর্ভিক্ষের ফল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বাঙ্গালার নানা স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া তাঁহার মত প্রকাশ করেন—বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের এক-তৃতীয়াংশ অনাহারে বা দুর্ভিক্ষের অন্যবিধ ফলে প্রাণত্যাগ করে।

হাণ্টার বলিয়াছেন :—

"It represents an aggregate of individual suffering which no European nation has been called upon to contemplate within historic times."

দুর্ভিক্ষের ২০ বৎসর পরে বাঙ্গালার জনসংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৩ কোটি নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে, ৯ মাসের মধ্যে অন্ততঃ ১ কোটি লোকের মৃত্যু হয়।

দুর্ভিক্ষের পর কয় বৎসর সুজন্মা হয়—ধরিত্রী পরবর্ত্তী ৩ বৎসর শস্যপূর্ণা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দানে বাঙ্গালার পূর্ব্বসমৃদ্ধি ফিরিয়া আইসে নাই; বাঙ্গালা তখন জনবিরল—মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে বাঙ্গালার জনসংখ্যা এক-তৃতীয় ভাগ হ্রাস পায়; জুন মাসে ১৬ জনে ৬ জনের মৃত্যু ঘটে এবং তখন আশঙ্কা হয় বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসীর মৃত্যু হইবে। বর্ষাকালে ও তাহার পরে ইংরেজ কোম্পানী বিলাতে শ্রমক্ষম কৃষক ও শিল্পীদিগের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ দেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কৃষিকার্য্যের সময়ে শোচনীয় অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। তখন দেখা যায়—বাঙ্গালায় ভূমিকর্ষণের উপযোগী লোক-সংখ্যা নাই।

এই অবস্থায়ও যে বাঙ্গালায় বিষম বিপ্লব উদ্ভূত হয় নাই—বাঙ্গালীর সহ্য করিবার অসাধারণ ক্ষমতাই তাহার কারণ। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষে এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বাঙ্গালী যথেষ্ট দিয়াছিল। হাণ্টার সেই সময়ের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—

"The Bengali bears existence with a composure that neither accident nor chance can ruffle. ......The emotional part of his nature is in strict subjection; his resentment enduring, but unspoken."

লোকের এই দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া যে কোম্পানীর বহু ইংরেজ ও ভারতীয় কর্ম্মচারী ধনী হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ২৮শে আগষ্ট তারিখে বিলাত হইতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টারস এই বিষয়ে লিখেন:—

"We are led to these reflections by perusing the letters from Mr. Becher and Mahomed Reza Khan, which accuse the gomastas of English gentlemen (i. e. English servants of the company) not barely for monopolizing grain, but for compelling the poor ryots to sell even the seed requisite for the next harvest."

অর্থাৎ :—

লোক যে দেশের জনগণের দুর্দ্দশায় সুযোগে আপনারা লাভবান হইয়াছে, ইহা আমরা মিষ্টার বেচার ও মহম্মদ রেজা খাঁ'র পত্র পাঠে বুঝিতে পারিলাম। এই সকল পত্রে কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের গোমস্তাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে, তাহারা কেবল যে শস্য একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই নহে ; পরন্তু দরিদ্র প্রজাদিগকে তাহাদিগের পরবর্ত্তী ফসলের জন্য প্রয়োজন বীজও বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে।

যখন বাঙ্গালার সমগ্র অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ এবং কৃষকদিগের অর্দ্ধাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন রাজস্বের শতকরা ৫ টাকাও হ্রাস না করিয়া শতকরা ১০ টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

পূর্ব্ব হইতেই যে ভাবে রাজস্ব আদায় করা হইতেছিল, তাহা ইংরেজের মতেই—বলপূর্ব্বক অন্যায় আদায়। তাহার পর কি হইল? ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে যে রাজস্ব আদায় করা হইল, তাহা ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বের আদায়ের তুলনায় অধিক! মুর্শিদাবাদে অবস্থিত বোর্ড অব রেভিনিউয়ের রিপোর্ট হইতে আমরা ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪ বৎসরের মোট আদায় রাজস্বের হিসাব নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

বৎসর টাকা

১৭৬৮ খৃঃ (বঙ্গাব্দ ১১৭৫)...১,৫২,৫৪,৮৫৬

১৭৬৯ খৃঃ (বঙ্গাব্দ ১১৭৬—এই বৎসর অজন্মা হওয়ায় পরবৎসর দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়)...১,৩১,৪৯,১৪৮

১৭৭০ খৃঃ (বঙ্গাব্দ ১১৭৭—এই বৎসর দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষসম্ভূত ব্যাধিতে বিষম লোকক্ষয় হয়)...১,৪০,০৬,০৩০

১৭৭১ খৃঃ (বঙ্গাব্দ ১১৭৮)...১,৫৭,২৬,৫৭৬

'ফোর্থ রিপোর্টে' (১৭৭২ খৃঃ) দেখা যায় "কমিটী অব সিক্রেসীতে" লিখিত হয় :

"কিরূপে ইহা (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় হইলেও সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ-বৃদ্ধি) সম্ভব হয়, তাহার সকল কারণ নির্ণয় সহজসাধ্য নহে। * * * কিন্তু আমরা একটি উপায়ের বিষয় বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব। ......ইহাকে 'নাজাই' বলা

হয়। যে সব জমির অধিকারীদের মৃত্যু হইয়াছিল বা অধিকারীরা (দুর্ভিক্ষ হেতু) পলাইয়া গিয়াছিল—তাহাদিগের জমি ও বাস্তু 'পতিত' থাকিলেও তাহাদিগের দেয় রাজস্ব তাহাদিগের প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে আদায় করা হয়। *** এই কর কোন নির্দ্দিষ্ট হারে আদায় হয় নাই (অর্থাৎ আদায়কারীরা ইচ্ছামত ইহা আদায় করিত); সুতরাং যে সব গ্রামের লোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে এবং সেইজন্য সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ লাভের অধিকারী, এই করে সেই সকল গ্রামের দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পীড়িত হইয়াছে।"

ইহা ইংরেজের স্বীকারোক্তি। আমরা উপরে যে কমিটীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই কমিটীই বলেন, দুর্ভিক্ষের ফলে রাজস্ব আদায় কমিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক থাকিলেও রাজস্ব আদায় পূর্ব্ববৎ রাখিবার উৎকট চেষ্টায় তাহা হয় নাই ("That it did not was owing to its being violenty kept up to its former standard.")

দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পরে কিভাবে বাঙ্গালার রাজস্ব আদায় করা হইয়াছিল, তাহার হিসাব উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব:

বৎসর		মোট আদায় রাজস্ব (পাউণ্ড—অর্থাৎ ১৫ টাকা)
১৭৭১—৭২	...	২,৩৭৩,৬৫০
১৭৭২—৭৩	...	২,৩২৭,১৩৭
১৭৭৩—৭৪	...	২,৪৮১,৪০৪
১৭৭৪—৭৫	...	২,৮২৩,৯৬৪
১৭৭৫—৭৬	...	২,৯৬৬,৩৮৭
১৭৭৬—৭৭	...	২,৭৮৪,৫০২
১৭৭৭—৭৮	...	২,৫৬৭,৪৫২
১৭৭৮—৭৯	...	২,৬৮৭,৬৫৭

সুতরাং দেখা যাইতেছে, লোকের যখন দুরবস্থার শেষ ছিল না, তখনও অত্যন্ত ও অন্যায় কঠোরতা সহকারে রাজস্ব আদায় করায় সেই দুরবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

যাহারা ক্ষুধায় দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য, তাহারা যদি অনাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে কি তাহা অসঙ্গত বলা যাইতে পারে?

'আনন্দমঠে' ভবানন্দের উক্তি সত্য—"এখন সকল গ্রামের চাষাভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজকাল কে ডাকাত নয়?" কিন্তু এই নিরন্ন লোকরা যদি ডাকাইত হয়, তবে রাজস্ব আদায়কারীরা কি?

মীরজাফর প্রজার প্রাণরক্ষার কোন চেষ্টাই করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার মুসলমান শাসকদিগের নানারূপ অত্যাচারে লোক জর্জ্জরিত হইয়াছিল—এই দুর্ভিক্ষে তাহাদিগের অসন্তোষ আর সংযমসীমায় বদ্ধ থাকিতে পারে নাই। ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে যে কোথাও অত্যুক্তি নাই, তাহার কতক প্রমাণ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, অবশিষ্ট প্রমাণ ইহার পরে উদ্ধৃত করা হইবে। ভবানন্দ বলিয়াছিলেন:

"দেখ যত দেশ আছে—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা? কোন্ দেশের মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়, কাঁটা খায়, উইমাটি খায়, বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুক্কুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল—এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়।"

যে সময়ে—যে অবস্থায় বাঙ্গালার লোকের মুখে এই উক্তি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে কি ইহা অসঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করা যায়?

যে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা আমরা 'আনন্দমঠে' পাই এবং যাহাকে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ বলা যায়, তাহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র মীরজাফরকে প্রধানতঃ দায়ী করিয়াছেন এবং ইংরেজ কোম্পানীকেও দোষ দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বাস্তবিক এই দুর্ভিক্ষের জন্য উভয়েই দায়ী। ঐ দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বেই রোগজীর্ণ ও ইংরেজদিগের উৎপীড়নে উৎপীড়িত মীরজাফরের দেহ সমাধিস্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সময়—তিনি নবাব হইবার জন্য যে অর্থ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতেই নবাবের সঞ্চিত ধনরাশি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কেবল যে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীরাই প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠনে রত ছিলেন, তাহা নহে—নিম্নপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা ব্যবসার নামে এই কাজ করিতেন। মধ্যে যখন কিছুদিনের জন্য ইংরেজ দুর্ব্বল, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মীরজাফরকে

পদচ্যুত করিয়া মীর কাসিমকে গদী দেন, তখন মীর কাসিম ভ্যান্‌সিটার্টকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, ইংরেজ কর্ম্মচারী প্রভৃতির অত্যাচারে তিনি জর্জ্জরিত—

"All the English chiefs, with their gumashtas, officers, and agents, in every district of the Government, act as collectors, renters and magistrates, and, setting up the Company's colours, allow no power to my officers. And besides this, the gumashtas and other servants in every district, in every market and village, carry on a trade in oil, fish, straw, bamboo, rice, paddy, betelnuts, and other things ; and every man with a Company's dastak in his hand regards himself as not less than the Company."

এইসব ইংরেজ যথেচ্ছাচার করিত—লোককে প্রহার করিয়া তাহারা যে মূল্য দিত সেই মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিতে ও তাহারা যে মূল্য চাহিত তাহাতে জিনিষ কিনিতে বাধ্য করিত।

এই বিষয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের উক্তিই যথেষ্ট। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাটনায় যাইবার সময় তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই গভর্ণরের নিকট বিবৃত করেন। তিনি দেখেন, নদীতে যত নৌকা—সে সকলেই কোম্পানীর পতাকা উড়িতেছে এবং নদীকূলে অনেক স্থানেও ঐ পতাকা উড্ডীন দেখা যাইতেছে। প্রায় সকল গ্রামেই দোকান বন্ধ—লোক পলায়িত—ইংরেজ বণিক্‌দিগের ও তাহাদিগের কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারভয়ে তাহারা পলাইয়াছে। ইংরেজদিগের বে-আইনী কার্য্যে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে—"bade no good to the Nawab's revenues, the quiet of the country, or the honour of our nation."

ট্রটার বলেন :

"It was the old tale of masterful adventurers working their mad will on neighbours too weak, timid, or indolent to withstand them. On the one side towered 'the strength of civilisation without its mercy' ; on the other crouched multitude of feeble folk...The people of Bengal in fact were as sheep waiting to be shorn by men who would certainly shear them to the skin."

এই অবস্থার পর দুর্ভিক্ষ।

রেজা খাঁ'র নির্ম্মম ব্যবহারের বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা একটু পূর্ব্বকথার আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। পাঠানরা যে সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহাদিগের ১,৪০,০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান ছিল। সে সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই। সেই সময় বাঙ্গালীর অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়:

"লিখিত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারম্ভসময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন এবং যিনি নিমন্ত্রিতসভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও তৎকালীন বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য, শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন এ দেশে স্থাপত্য-বিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বাস করিত। দেশে অনেক ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত আইনী-আকবরীতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদাররা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১,১৫৯ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।" (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস')

ইহার উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন:—

"যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনি বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানি আরম্ভ। ***মোগল অধিকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন পর্য্যন্ত ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের

রক্তশোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য? তক্তৃতাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুম্মা মসজিদ, সেকেন্দ্রা, ফতেপুর সিকরি বা বৈজয়ন্তীতুল্য সাহজাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্ত দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শুনি যে, নাদের সাহ বা মহারাষ্ট্রীরা দিল্লী লুঠ করিল, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে? বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে; সে পথে বাঙ্গালার ধন ইরাণ তুরাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে।"

বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য যে সকল স্থানের লোককে আকৃষ্ট করিত, তাহা তৎকালীন পর্য্যটকরা লিখিয়া গিয়াছেন। বার্ণিয়ার এমন কথাও বলিয়াছেন যে, লোক মনে করে—বাঙ্গালায় লোকের প্রবেশের বহু দ্বার আছে, তথা হইতে বাহির হইবার পথ নাই। অর্থাৎ যে বাঙ্গালায় আইসে, সে আর সে প্রদেশ ত্যাগ করিতে চাহে না। বাঙ্গালায় আসিয়া যদি কেহ অর্থার্জ্জন করিতে না পারিত, তবে সে আপনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিত। তাই প্রচলিত কথা ছিল :—

"আমি যাব বঙ্গে—
আমার কপাল যাবে সঙ্গে।"

মোগল সম্রাট্‌রা বাঙ্গালার প্রয়োজন বিশেষভাবে বুঝিতেন বলিয়াই, সায়েস্তা খাঁ'র মত সম্রাট্-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ ব্যক্তিরাই যে কেবল বাঙ্গালার শাসক নিযুক্ত হইতেন, তাহা নহে, পরন্তু রাজপুত্ররাও সেই পদ লোভনীয় মনে করিতেন। শাহজাহানের পুত্র সুজা বাঙ্গালায় শাসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ঔরঙ্গজেব ভ্রাতৃরক্তে সিক্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পর তাঁহার এক পৌত্র আজিম উস্‌শান ঐ পদ লাভ করেন।

মুর্শীদকুলী খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া পুণ্যাহের পর দিল্লীতে বাদশাহের নিকট যাহা পাঠাইয়াছিলেন, তাহার তালিকা এইরূপ :

(১) দুই শত গোযানে—৩ শত অশ্বারোহী ও ৫ শত পদাতিক সৈনিক এক জন দারোগার অধীনে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বহন করিয়াছিল।

(২) জায়গীরের ও খাসনবিশীর সঞ্চয় স্বতন্ত্রভাবে প্রেরিত হয়।

(৩) হস্তী।

(৪) টাঙ্গন (ঘোড়া)।

(৫) গুন্থ নামক এক জাতীয় পার্ব্বত্য অশ্ব।

(৬) মহিষ।

(৭) হরিণ।

(৮) বাজপাখী।

(৯) ঢাকায় বয়ন করা—সম্রাটের ব্যবহার্য্য সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র (মসলিন)।

(১০) গণ্ডারচর্ম্মের ঢাল।

(১১) শ্রীহট্টের পাটী (স্বর্ণের তার ও গজদন্তের)।

(১২) মৃগনাভী।

(১৩) আসামী কাপড় (মুগা ?)

(১৪) তরবারের ফলক ; প্রভৃতি।

মুর্শীদকুলীর পর তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজ মাতামহ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া বাঙ্গালার নবাব-নাজিমের পদ পাইয়া দিল্লীতে সনন্দের জন্য টাকা পাঠাইয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার পিতা পুত্রের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে যখন মাতা ও মাতামহীর পরামর্শে পুত্র পিতাকেই অধিকার ছাড়িয়া দেন, তখন তিনি আবার নজর পাঠান। সুজার মৃত্যুর পর সরফরাজ নবাব-নাজিম হইলে অকৃতজ্ঞ স্বার্থসর্ব্বস্ব ভৃত্য আলিবর্দ্দী প্রভুকে হত্যা করিয়া নবাব-নাজিম হইবার সময় পুনরায় ঐরূপ অর্থ প্রেরণ করেন। এই সকল অর্থ বার্ষিক দেয় রাজস্বাতিরিক্ত। এই অর্থ বাঙ্গালীর জমিদার হইতে প্রজা সকলের পীড়নলব্ধ। তাহার পরে আলিবর্দ্দী বাধ্য হইয়া মার্হাট্টাদিগকে "চৌথ" দেন এবং তাঁহার শাসনকালে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা যে অমিতব্যয়িতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি পলাশীর ক্ষেত্রে তাঁহার পরাভবের পর মীরজাফরকে গদীতে বসাইবার সময় ইংরেজরা কিরূপ অর্থ—নবাবের ভাণ্ডার হইতে লইয়াছিলেন, তাহা পরে বিলাতে ক্লাইবের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রকাশ পায়। সে সম্বন্ধে মেকলে লিখিয়াছিলেন—তখন ইংরেজ কোম্পানীর ও কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের উপর অর্থ অজস্রধারায় বর্ষিত হইয়াছিল। যে রৌপ্যমুদ্রা মুর্শিদাবাদ হইতে জলপথে কলিকাতায় দুর্গে প্রেরিত হয়' তাহার মূল্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। শতাধিক নৌকায় যখন এই অর্থ বাহিত হয়, তখন সে সব নৌকায় পতাকা উড্ডীন করা হইয়াছিল—বাদ্যধ্বনি হইতেছিল। কয় মাস মাত্র পূর্ব্বেও যে কলিকাতা শূন্যবৎ হইয়াছিল—তাহা পূর্ব্বে কখন সেরূপ সমৃদ্ধ হয় নাই। ব্যবসার উন্নতি সাধিত হয়

এবং প্রত্যেক ইংরেজের গৃহে আর্থিক প্রাচুর্য্যের চিহ্ন সপ্রকাশ হয়! ক্লাইব যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারিতেন—তাঁহার সংযম ব্যতীত তাঁহার ইচ্ছাপূরণে কোন বাধাই ছিল না ("there was no limit to his acquisitions but his own moderation") বাঙ্গালার কোষাগার তখন তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত—তাঁহার পক্ষে অনর্গল। ভারতীয় শাসকদিগের প্রচলিত প্রথানুসারে তথায় রজতরাশি স্তূপীকৃত ছিল—তাহার মধ্যে বিদেশী মুদ্রারও অভাব ছিল না। কারণ—উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া য়ুরোপীয়দিগের কোন জাহাজ ভারতে আসিবারও পূর্ব্বে (স্থলপথে বাণিজ্যার্থী) ভিনীসিয়রা এ দেশের তন্তুজাত পণ্য ও মসলা কিনিতে আসিত এবং সেই সূত্রে তাহাদিগের দেশের মুদ্রাও এ দেশে আনীত হইত। সেই রৌপ্যমুদ্রার স্তূপশীর্ষে বহুমূল্য রত্নরাজিরও অভাব ছিল না। ক্লাইভ যথেচ্ছা সে সব লইতে পারিতেন ("was at liberty to help himself")

তিনি যে তাঁহার পক্ষে প্রভূত অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি "সংযমের" পরিচয় প্রদান করিয়া যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ—২০ লক্ষ টাকা হইতেও অধিক। মেকলে তাঁহার সমর্থনে অতি বিস্ময়কর যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন—"He deserves praise for having taken so little."

মেকলেই বলিয়াছেন, ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেবল ক্লাইবই মীরজাফরের নিকট হইতে অর্থ লাভ করেন নাই, পরন্তু সকলেই অংশ পাইয়াছিলেন। এই সময় ও ইহার পরে বাঙ্গালা হইতে যে অর্থ ইংলণ্ডে যায়, তাহাই যে দেশের শিল্প-সমৃদ্ধির কারণ, তাহা ডীন ইঞ্জে তাঁহার 'Out spoken Essays' নামক পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই পাপার্জ্জিত অর্থেই বিলাতের কলকারখানার মূলধন পাওয়া গিয়াছিল এবং এই ভাবেই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পরাভূত ফ্রান্সের নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিয়া জার্ম্মাণী সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন:

"The industrial revolution came upon us (the English) suddenly ; it changed the whole face of the country and the character of the people....The first impetus was given by the plunder of Bengal which, after the victories of Clive, flowed into the country in a broad stream for about 30 years. This ill-gotten

wealth played the same part in stimulating England's industries as the 'five milliards' extorted from France did for Germany after 1870."—("The Future of the English Race")

অর্থাৎ—বিলাতে শিল্পসম্বন্ধীয় বিপ্লব অতর্কিতভাবে হইয়াছিল এবং তাহার দ্বারা দেশের রূপ ও জাতির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। ক্লাইবের জয়ের পর বাঙ্গালা লুণ্ঠনে যে অর্থ, বিস্তৃত প্রবাহে ৩০ বৎসর কাল বিলাতে গিয়াছিল, তাহাতেই এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়।

মীরজাফর কেবল যে প্রভুর সম্বন্ধে কৃতঘ্নতার মূল্যেই বাঙ্গালার গদী ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাই নহে—সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঙ্গালার শাসকদিগের সমস্ত সঞ্চয়ও দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "তিনি আত্মরক্ষায়ও অক্ষম ছিলেন।"

মুর্শাদকুলী খাঁর সময় হইতেই কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় আরম্ভ হয়। তিনি ১৭২২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের যে কাগজপত্র প্রস্তুত করান, তাহারই নাম "জমা কামেল তুমারী।" এই বন্দোবস্তই পরবর্ত্তী রাজস্ব-ব্যবস্থার ভিত্তি। তিনি বাঙ্গালার পূর্ব্বতন সরকারগুলিকে ১৩টি চাকলায় বা বিভাগে বিভক্ত করেন এবং তখনই পরগণার সংখ্যা ১৬৬০০ হয়। জায়গীর জমা ধরিয়া সমগ্র রাজস্ব ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯ শত ৮৬ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন অতিরিক্ত কর বা "আবওয়াব" ছিল এবং বাদশাহ সরকারে বার্ষিক নজরানা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথমে ইহা মোট ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪ শত ৫৭ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়া বাঙ্গালার ভূসম্পত্তির উপর পড়তা করা হইত। এই আবওয়াবের পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া যায় এবং আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনের শেষদশায় নিম্নলিখিত নূতন আবওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়:—

(১) নজরানা মন্‌সুরগঞ্জ… ৫০১৫৯৭ টাকা

(২) (ক) আহুক্ প্রভৃতি (ইহার অধিকাংশই রাজসাহী, দিনাজপুর ও নদীয়ার জমীদারদিগের নিকট আদায় হইত)… ১৮৪১৪০ টাকা

(খ) খেস্ত গৌড় (গৌড় হইতে ইষ্টকাদি লইয়া বিক্রয়ের জন্য)"… ৮০০০ "

(৩) মার্হাট্টাদিগের চৌথ… ১৫৩১৮১৭ "

মোট—২২২৫৫৫৪ টাকা

মুর্শীদকুলীর জমীদার-পীড়নের অনেক কথা শুনা যায়; তবে সে সকলের সত্যাসত্য নির্ণয় করা সমসাময়িক বিবরণের অভাবে দুষ্কর। সে সময় এইরূপ উৎপীড়ন ও অত্যাচার অতি সাধারণ ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল।

মুর্শীদকুলীর জামাতা নবাব সুজা উদ্দীনের ব্যয় অত্যন্ত অধিক ছিল। তিনি প্রতি বৎসর জন্মদিনে তুলট হইয়া দরিদ্রগণকে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিতরণ করিতেন, দানে মুক্ত-হস্ত ছিলেন, পানভোজনে—গীতবাদ্যে অনেক ব্যয় হইত। সেইজন্য জমিদারী বন্দোবস্তের উপর কয়টি আবওয়াব স্থাপিত করা হয়:

(১) নজরাণা মোকররী

(২) জার মাথট (ইহা ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়)—

(ক) নজর পুণ্যাহ

(খ) বয় খিলাৎ

(গ) পোস্তবন্দী

(ঘ) রসুম নেজারৎ

(৩) মাথট পিলখানা

(৪) আবওয়াব ফৌজদারী

এই সকল আবওয়াবে তিনি বার্ষিক ১৯,১৪,০৯৫ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "জমিদারের কর বর্দ্ধিত হইলে, অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ প্রজাবর্গের স্কন্ধে চাপে ইহা বুঝিতে, বোধ হয়, কাহারও কষ্ট হইবে না।" বাণিজ্য সম্বন্ধেও কতকগুলি নিয়মহেতু আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়।

তাঁহার পুত্র সরফরাজও অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। তথাপি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ যখন বাঙ্গালার গদী লাভ করেন, তখন তিনি সরফরাজের ধনভাণ্ডারে নগদ ৭০ লক্ষ টাকা ও ৫০ কোটি টাকার হীরকাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সকল হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালার নবাবরা নানা উপায়ে প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া বিলাস-লালসা পরিতৃপ্ত ও অর্থ সঞ্চয় করিতেন।

সুজা খাঁর ও সরফরাজের অমিতব্যয়ের পর এবং আলিবর্দ্দীর মার্হাট্টাদিগের চৌথ প্রদানের ও সিরাজউদ্দৌলার যথেচ্ছা ব্যয়ের পরেও যে অর্থ ধনভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল, তাহা আমরা মেকলের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি।

মনে রাখিতে হইবে—এই অর্থ বাঙ্গালার জমিদারদিগের নিকট হইতে ন্যায্য

ও অন্যায় ভাবে সংগৃহীত হইত—সে জন্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা হইত এবং জমীদাররা সেই অর্থ প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতেন—জনগণ ইহাতে দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িত।

মীরজাফরের সময় হইতে আর এক প্রকার লুণ্ঠন হইতে থাকে—ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের লুণ্ঠন। তাহার ফলে বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প নষ্ট হইয়া যায়।

ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের অনাচারের পরিচয় আমরা পূর্ব্বে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। ইংরেজ কোম্পানীর অত্যাচারই যে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

উইলিয়ম বোণ্ট সেই সময় কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারে ভারতে রেশম-শিল্পের সর্ব্বনাশের উল্লেখ করিয়াছেন। কোম্পানী রেশমের ব্যবসা একচেটিয়া করায় রেশমসূত্র প্রস্তুতকারীদিগের প্রতি ও বয়নকারীদিগের সম্বন্ধে যে সব অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত, অর্থাৎ কোম্পানীর অর্থলাভের জন্য যে সব বর্ব্বর ব্যবহার হইত, তাহা মনে করিলেও বিক্ষুব্ধ হইতে হয়। কোন রেশমী বস্ত্রবয়নকারী যদি কোম্পানীর নিকট—কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের নির্দ্দিষ্ট অতি অল্পমূল্যে—বস্ত্র সরবরাহ করিবার জন্য দাদন লইতে বাধ্য হইয়া পরে একখানিও বস্ত্র অন্য কাহাকেও বিক্রয় করিত এবং দালাল ও পাইকাররা তাহাদিগের সেই কার্য্য উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিত, তবে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে ধরিয়া জরিমানা করিত, বেত মারিত এবং যাহাতে তাহারা জাতিচ্যুত হয়, সেরূপ কার্য্যও করিত ("seized and imprisoned, confined in irons, fined considerable sums of money, flogged and deprived, in the most ignominious manner, of what they esteemed most valuable, their castes")

যাহারা রেশমের সূতা প্রস্তুত করিত, তাহারা অত্যাচারের ভয়ে আপনাদিগের অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়া অব্যাহতিলাভের উপায় করিত ("Instances have been known of their cutting off their thumbs, to prevent their being forced to wind silk.)

কোম্পানীর আয় বৃদ্ধির জন্য এই সব লোকের উপর আরও নানারূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত :

"This last kind of workmen were pursued with such rigour during Lord Clive's late government in Bengal, from a zeal for increasing the Company's investment of raw silk, that the most sacred laws of society were atrociously violated; for it was a common thing for the Company's sepoys to be sent by force of arms to break open the houses of the Armenian merchants established at Sydabad (who have from time immemorial, been largely concerned in the silk trade) and forcibly take the 'Nagaads' from their work, and carry them away to the English factory."

আজকাল কেহ কেহ বোল্টের এই বিবরণ অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি পার্লামেন্টের "নাইন্থ রিপোর্ট" পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ তারিখে কোম্পানী বাঙ্গালায় কর্ম্মচারীদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন—বাঙ্গালায় রেশমী কাপড় বয়নের চেষ্টা প্রহত করিয়া লোককে কেবল রেশম প্রস্তুত করিতে বাধ্য করা হউক এবং তাহারা যাহাতে স্ব স্ব গৃহে কাজ না করিয়া কোম্পানীর কুঠীতে কাজ করে, সে ব্যবস্থা করা হউক।

সিলেক্ট কমিটী মন্তব্য প্রকাশ করেন, ইহাতে লোককে প্রলুব্ধ ও বাধ্য করিয়া বাঙ্গালার রেশমী কাপড়ের শিল্প নষ্ট করিতে বলা হয়। এই নীতির ফলে শিল্পপ্রধান বাঙ্গালার শিল্প নষ্ট হইবে এবং বাঙ্গালা কেবল বিলাতের রেশমশিল্পের জন্য পণ্যোপকরণ (রেশম) যোগাইবে।

এ দেশের কার্পাসপণ্য বিলাতে আমদানী বন্ধ করিবার জন্য যে আইন বিলাতে বিধিবদ্ধ হয়, তাহা ইহার পরবর্ত্তী এবং বাঙ্গালার দারুণ দুর্ভিক্ষের সমসাময়িক। তাহার সম্বন্ধেই উইলসন বলিয়াছেন—ইংরেজ রাজনীতিক অনাচারের বাহু বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষের শিল্পের শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটাইয়াছিল ("The foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended on equal terms.")

দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য মুসলমান শাসকদিগের নামের সুযোগ লইয়া প্রবল ও স্বার্থসন্ধ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা যে অনাচারের ও অত্যাচারের

অনুষ্ঠান করিতেন—তাহাতে বাঙ্গালার প্রজার সর্ব্বনাশ হয়। বিলাতে ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত ইংরেজদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লোক তাহাদিগকে 'নবাব' বলিত এবং গল্প ছিল, এ দেশে টাকার গাছ আছে—তাহা নাড়িলেই টাকা পতিত হয়।

কাজেই মুসলমান শাসকদিগকে দায়ী করিয়া কোম্পানী স্বার্থসিদ্ধি করিত। সেই সময় রেজা খাঁ রাজস্ব আদায় করিবার ভার পাইয়াছিল। সে "একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল," রেজা খাঁ'র অত্যাচারের বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা একখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে লিখিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম। পুস্তকখানির নাম Transactions in India from the commencement of the French War in 1756 to the Conclusion of the Late Peace in 1783 containing a History of the British Interests in Indostan during a period of 30 years (London Printed for J. Debrett Opposite Burlington House in Piccadilly, 1786) এই পুস্তকে লিখিত আছে :—

"Mahummed Raza, the ostensible minister of finance, studied the character of his masters. He knew the influence of money. Possessed of talents for business, an accurate discernment of men in active life, and a genius for all the refinement and obliquities of the deepest intrigue, his situation. gave him the command of treasures and he applied them with dexterity in accomplishing at once his interest and ambition."

সে তাহার পোষ্য ও কুকার্য্যের সাহায্যকারীদিগকেই বৎসরে ৭৫ লক্ষ টাকা দিত।

ইংরেজের নিকট অভিযোগ করিলে কোন ফল হইত না। কারণ, ইংরেজরাও রেজা খাঁর অর্থে বশ থাকায় অভিযোগ যে আদালতে পাঠান হইত, সে সব আদালতের বর্ণনা এইরূপ :

"The men who presided in these prostituted courts, were the summary executioners of the partial and arbitary mandate of a monster"—যে could "riot in the catastrophe of his country."

ব্যবসায় ব্যাপার সম্বন্ধে লিখিত আছে :

"The system of commerce and regulation established by the Select Committee, under the Government of Lord Clive, united the Company's servants and all the various creatures in the country districts, in one black, bloody and indissoluble association against the inhabitants."

কাযেই বাঙ্গালার সাজান বাগান শ্মশান হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের পর দেখা গেল, বাঙ্গালার উর্ব্বর ক্ষেত্রে চাষ করিবার লোক নাই—বাস্তু উদ্বাস্তু হইয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার শিল্প গিয়াছে। বাঙ্গালা ইহার পূর্ব্বে কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও কৃষিপ্রাণ ছিল না—এই বার তাহা হইল। ইহার প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে বার্ণিয়ার বাঙ্গালার বর্ণনায় লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা হইতে মৌশালীপট্টন প্রভৃতি স্থানে যেমন চাউল রপ্তানী হয়, তেমনই গোলকুণ্ডা প্রভৃতি স্থানে—এমন কি আরবে ও ইরাকেও চিনি রপ্তানী হয়, বাঙ্গালায় এত কার্পাশ ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করা হয় যে, ইহা কেবল হিন্দুস্থানেরই নহে, পরন্তু য়ুরোপেরও বাজার বলা যায়।

"I have been sometimes amazed at the vast quantity of cotton cloths, of every sort, fine and coarse, white and coloured, which the Hollanders alone export to different places, especially to Japan and Europe. ...The same may be said of the silks and silkstuffs of all sorts."

পূর্ব্বে যে দেশ হইতে রুশিয়াতে (জলপথে—পারস্য উপসাগর অতিক্রম করিয়া) মালদাহী কাপড় রপ্তানী হইত, তাহার প্রমাণ আছে। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে শেখ ভিক এইরূপ কাপড় ৩ জাহাজ ভরিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

যখন বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসন শেষ হয়, তখন এই ভাবে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হয়। সুতরাং সেই সময় বাঙ্গালী যদি মুসলমান শাসকদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিকই নহে কি? ফরাসী-বিপ্লবের মূল কারণ—সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য দরিদ্রের অর্থাভাব। সে সময় বাঙ্গালায়ও সেই অবস্থারই উদ্ভব হইয়াছিল।

সেই সঙ্গে আরও যে কারণ ছিল, তাহার আলোচনা আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করিব। তাহারই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র-সৃষ্ট ভবানন্দ বলিয়াছিলেন—

বাঙ্গালার লোকের "ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই।"

ফরাসী-বিপ্লবের মূল কারণ, জনগণের আর্থিক দুর্গতি। একদিকে দেশের অভিজাত সম্প্রদায়, আর এক দিকে ধর্ম্মযাজকরা দেশের আয়ের সিংহভাগ সম্ভোগ করিতেন—দরিদ্ররা করভারপীড়িত হইত। "They (the nobles)...together with the clergy, monopolised the principal share of the national revenues, and left to the lower classes the burden of labour and of paying the taxes.'' বিলাসের সঙ্গে ব্যসন আইসে এবং তাহার পর পাপ আসিয়া প্রবেশ করে।

বাঙ্গালায় মোগল সম্রাটদিগের প্রতিনিধিরাও এই দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। 'রিয়াজউস-শলাতিন' নামক বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনের মুসলমান-রচিত প্রামাণ্য ইতিহাসের অনুবাদক মৌলবী আবদুস সালাম একান্ত আক্ষেপ সহকারে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। সরফরাজ খাঁর পতন ও আলিবর্দ্দীর গদী অধিকারের সংবাদ অবগত হইয়া বাদশাহ নসীরুদ্দীন মহম্মদ শাহ বলিয়াছিলেন—"নাদির শাহের জন্য আমার সমগ্র সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।"—'রিয়াজের' এই কথার টীকায় অনুবাদক বলিয়াছেন—সম্রাট্ মহম্মদ শাহের নিদান-নির্ণয় নির্ভুল বলা যায় না। কারণ, তাঁহার বলা উচিত ছিল, ভারতবর্ষে তৈমুরের বংশের গৌরবময় সাম্রাজ্য-বিলাস, আরামপ্রিয়তা, ভ্রাতৃবিরোধ, অর্থগৃধ্নুতা, দুর্নীতি প্রভৃতি বিবিধ কারণে শিথিলভিত্তি হইয়া নষ্ট হইয়াছিল। মন্ত্রীদিগের ও নানা স্থানে রাজপ্রতিনিধিদিগের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও এই সকল কারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দিল্লীতে সাম্রাজ্যের হৃদয়ে নৈতিক পঙ্গুতার উৎপত্তি হয় এবং তাহা অতি দ্রুত সকল প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হয়। ভারতে মুসলমানরা প্রথমে তাঁহাদিগের ইসলামীয় সদ্‌গুণ হারাইয়া পরে রাজ্য হারাইয়াছিলেন। ("A moral paralysis had seized the heart of the Empire of Delhi, and it quickly extended to and affected its distant limbs in outlying Provinces. The Mussalmans in India had lost their Islamic virtues first, and next their Empire.")

বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন, কোন ওমরাহ অতিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা ব্যক্ত করিলে ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে না। রাজাকে বিপদের সময় নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও প্রজারক্ষা করিতে হয়। অথচ বিজ্ঞ ও বিবেচক

ওমরাহ আমাকে বলিতে চাহেন যে, আমি আমার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাতেই অবহিত থাকিব—আমি প্রজার জন্য বিনিদ্র রজনী যাপন না করিয়া হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিব, উজীরদিগকে কার্য্যভার দিয়া আমি আরাম উপভোগ করিব। স্বভাবতঃই আমরা আরাম ও ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করিতে চাহি—সেজন্য কোন উপদেশের প্রয়োজন হয় না। আমাদিগের পত্নীরাও আমাদিগকে বিশ্রাম ও বিলাসের কুসুমাস্তৃত পথে পরিভ্রমণ করিতে নিশ্চয়ই সাহায্য করেন।

ঔরঙ্গজেবের পত্নীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাতেই তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীকে তিনি বিলাসহচরীই মনে করিতেন। ঔরঙ্গজেব যত কঠোরতার সমর্থনই কেন করুন না, তাঁহার রাজ্যলাভের পূর্ব্বেই মোগল সম্রাট্‌রা বিলাসে ও ব্যসনে আপনাদিগের সর্ব্বনাশসাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাট্‌দিগের বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, বাবর হইতে ঔরঙ্গজেব এই কয় পুরুষে—বাবর মোগলসিংহ, হুমায়ুন ভাগ্যবিপর্য্যয়গ্রস্ত, আকবর সাম্রাজ্য-বিস্তারসাধক ও রাজনীতিক, জাহাঙ্গীর প্রতিভাবান্ মদ্যপ, শাহজাহান স্থাপত্যকীর্ত্তিস্থাপক আর, ঔরঙ্গজেব সন্দেহতিক্ত ও পরধর্ম্মদ্বেষী।

আকবর ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইসলামের মূল নীতি বর্জ্জন করিয়া নানা ধর্ম্মের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান নৃপতিরা এ দেশে দুই দিকের চাপে পিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়াছিলেন—একদিকে বিদেশ হইতে প্রবল জলস্রোতের মত আগত মুসলমান আক্রমণকারীর দল, আর এক দিকে বিরাট হিন্দুদল। তিনি এ দেশে "জাতীয়" শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া সাম্রাজ্যে স্থায়িত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হয়েন, পরধর্ম্মপরায়ণদিগের উপর কর বর্জ্জন করেন ও হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। একজন হিন্দু সেনাপতি তাঁহার জন্য বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা জয় করেন, এবং অর্থ-সচিবরূপে মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্ব-ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করেন। আর একজন হিন্দু তাঁহার পক্ষ হইতে পঞ্জাব শাসন করেন। আর একজন হিন্দু যখন কাবুলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তাঁহাকেই যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া, দ্বিসহস্র মাইল দূরে মুসলমান বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার কার্য্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। হিন্দুরা সেনাপতিরূপে যুদ্ধজয় করিতেন, শাসনকার্য্যের মেরুদণ্ড ছিলেন এবং হিন্দু সৈনিকরাই সাম্রাজ্যের শক্তি ছিলেন। "It was on

this political consideration of interests, Mussalman and Hindu, that the Mughal Empire rested, so long as it endured."

কিন্তু আকবর বুঝিয়াছিলেন, কেবল রাজনীতিক সন্ধ-গঠনের উপর সাম্রাজ্য স্থায়ী হইবে না, তাই তিনি নানা ধর্ম্মের মূল কথা লইয়া নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতীকরূপে সূর্য্যের পূজা করিতেন। লোককে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইত। মুসলমান-ব্যবসায়ীরা সম্রাটের এই ব্যবহার সমর্থন করেন; মুসলমান চিকিৎসকগণ মত প্রকাশ করেন—হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ গোমাংসভক্ষণে স্বাস্থ্যহানি হয়। মুসলমানদিগের পক্ষেও শ্মশ্রুমুণ্ডন প্রচলিত হয়। শেষে সম্রাট্-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ইসলামের স্থানে প্রতিষ্ঠার জন্য ঘোষণা প্রচারিত হয়! কিন্তু আকবরের সময়েই বিলাসের সঙ্গে ব্যসনের ব্যাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরের মদ্যাসক্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তাঁহার আর এক পুত্র মদ্যপানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার সঞ্চিত মদ্য নিঃশেষ হইলে, তিনি বন্দুকের নলেও গোপনে মদ্য আনাইতেন।

আকবরের রাজত্বকালেই দিল্লীতে "শয়তানপাড়া"—দুর্নীতিপঙ্কপূর্ণ পল্লী প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ কুসংস্কার প্রবল হইয়া উঠে। ডাইনী, ঐন্দ্রজালিক, করকোষ্ঠিবিচারক প্রভৃতি রাজধানীতে আসিয়া সমবেত হইয়া থাকে। মোগল-রাজসভার কোন ফরাসী চিকিৎসক লিখিয়াছেন—ভবিষ্যদ্বক্তারা দুই পয়সা লইয়া দরিদ্রদিগকে তাহাদিগের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দেয়। একজন পর্ত্তুগীজ ফেরারী আসামীও একখানি আসনে বসিয়া ভাগ্যগণনা করিবার ভাণ করিত; তাহার সম্বল ছিল—একটি পুরাতন নৌ-দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ও রোমক প্রার্থনাপুস্তক—সেই প্রার্থনা-পুস্তকের চিত্রগুলি সে রাশিচক্র বলিয়া দেখাইত।

কিন্তু আকবরও বহু রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার অসংযতচরিত্র পুত্র জাহাঙ্গীর দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠেন। তিনিই পিতার শ্রদ্ধেয় বন্ধু আবুল ফজলের হত্যা সংঘটিত করান এবং সেই ঘটনায় আকবরের মৃত্যুকাল সমাগত হয়।

জাহাঙ্গীরের মদ্যপানপ্রিয়তার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। তিনি যে তাঁহার যৌবনের মোহিনীর স্বামীর হত্যার পর তাঁহাকেই সম্রাজ্ঞী করিয়াছিলেন, সে দৃষ্টান্ত রাজোচিত হয় নাই। তিনি আকবরের নীতি বর্জ্জন করেন। সেই কথাই কবি টেনিসন তাঁহার কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—আকবর স্বপ্ন

দেখিয়াছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে অসীম সহিষ্ণুতা সহকারে যে মন্দির নির্ম্মিত করিয়াছেন, জাহাঙ্গীর ও তাঁহার পরবর্ত্তীরা তাহা নষ্ট করিতেছেন।—

"I dream'd
That stone by stone I rear'd a sacred fane
A temple neither Pagod, Mosque nor Church.
But loftier, simpler always open-door'd
To every breath from heaven and Truth and Peace
And Love and Justice came and dwelt therein

* * * *

I watch'd my son
And those that follow'd, loosen, stone from stone
All my fair work."

কিছুদিন পরে জাহাঙ্গীর রাজকার্য্যের ভার নুরজাহানকে দিয়া বিলাসে কালযাপন করিতেন। তিনি মুসলমানধর্ম্মের অনুষ্ঠান পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মে তাঁহার কোনরূপ অনুরক্তি ছিল না। তাঁহার ব্যবহারে অনেক সময় যে ভাব লক্ষিত হইত, তাহা গাম্ভীর্য্যদ্যোতক নহে। তাঁহার দরবারে বার্ণার্ড নামক একজন য়ুরোপীয় চিকিৎসক থাকিতেন এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহভাজন ছিলেন এবং অনেক সময় সম্রাট্ তাঁহাকে রাত্রিকালে মদ্যপান সঙ্গী করিতেন। এই বিষয়ে কাতরু (মেনুসীর গ্রন্থাবলম্বনে ইনি মোগল রাজ্যের ইতিহাস রচনা করেন) লিখিয়াছেন, আগ্রায় য়ুরোপীয়রা প্রাসাদে অবাধে প্রবেশ করিতে পাইতেন এবং সম্রাট্ তাঁহাদিগকে লইয়া সমস্ত রাত্রি মদ্যপান করিতেন। যে সময় মুসলমানরা উপবাস করেন, সেই সময়ে তিনি (যেন ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া) এই নৈশ অনাচারে বিশেষভাবে আনন্দ উপভোগ করিতেন। ("He abandoned himself especially to these midnight debaucheries at the season which the Mohomedans observe as a fast with the most scrupulous exactness." কোন্ ধর্ম্মে মদ্য ও সর্ব্ববিধ মাংস গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে জিজ্ঞাসায় তিনি যখন জানিতে পারেন, খৃষ্টধর্ম্মে ঐ সকলে কোন বাধা নাই, তখন তিনি বলেন—তিনি খৃষ্টান হইবেন। কাতরু লিখিয়াছেন, ইহাতে মুসলমান কাজী ও ইমামরা ভীত হইয়া

বলেন—কোরাণের নির্দ্দেশ নৃপতির প্রতি প্রযোজ্য নহে এবং তিনি যাহা ইচ্ছা পান ও ভোজন করিতে পারেন ("He might without scruple, make use of what meats and what liquors he liked best")। ডাক্তার বার্ণার্ডও বিলাসী ও মুক্তহস্ত ছিলেন। বিশেষ তিনি কাঞ্চনী (নর্ত্তকী)-দিগকে বহু অর্থ দিতেন। যে সব নর্ত্তকীকে তিনি প্রতি রাত্রিতে নিজগৃহে আনিতেন, তাহাদিগের মধ্যে একজন তাঁহাকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাহার মাতা তাহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিল—কারণ, তাহার বিশ্বাস ছিল—কাহারও গৃহিণী হইলে কন্থার অর্থোর্জ্জনের উপায় যৌবনও ক্ষয় হইবে। এই সময় বার্ণার্ড অন্তঃপুরে কোন দুরারোগ্য রোগ চিকিৎসায় আরোগ্য করিলে, জাহাঙ্গীর—তাঁহার ওমরাহগণের সম্মুখে—আম খাসে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহেন। সেই নর্ত্তকী তখন অন্যান্য নর্ত্তকীর সঙ্গে সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিতে আসিয়াছিল। বার্ণার্ড পুরস্কাররূপে তাহাকেই চাহিলেম। সভাস্থ সকলে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল, সম্রাট্ কথনই এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না; কারণ, বার্ণার্ড খৃষ্টান এবং নর্ত্তকী মুসলমান ও নৃত্যব্যবসায়ী। কিন্তু জাহাঙ্গীরের ধর্ম্মের বিধানে শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি এই প্রস্তাবে উচ্চহাস্য করিয়া আদেশ করিলেন—"নর্ত্তকীকে ডাক্তারের ঘাড়ে চাপাইয়া দাও—ডাক্তার উহাকে বহন করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যাইবে।" তাহাই করা হইল এবং বার্ণার্ড সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইলেন। "In the midst of a crowded assembly the girl was placed on Bernard's back who withdrew triumphantly with his prize and took her to his house." (বার্ণিয়ার)

জাহাঙ্গীরের পর শাহজাহান। শাহজাহানের তাজমহল সমাধিসৌধ দেখিয়া আমরা যেন মনে না করি, তিনি প্রেমে একনিষ্ঠ ছিলেন। বার্ণিয়ার তাঁহার নর্ত্তকী-প্রিয়তার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া সময় সময় তাহাদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। বার্ণিয়ার বলিয়াছেন, 'এই কাঞ্চনীরা একটু "উচ্চ শ্রেণীর" বারাঙ্গনা—ওমরাহ, মনসবদার প্রভৃতির গৃহে উৎসবে গান ও নৃত্য করিত।

শাহজাহানের সময় প্রাসাদে দুর্নীতির যে-সব কথা বার্ণিয়ার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যে সকল অত্যন্ত দুষ্ট। বার্ণিয়ার শাহজাহানের সহিত তাঁহার রূপবতী ও বুদ্ধিমতী প্রথমা দুহিতা জিহানারার ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা

পিতাপুত্রীর পবিত্র সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া অবিশ্বাস্যই মনে করা যায় এবং কাতরুও তাহাই বলিয়াছিলেন—("This was a popular rumour which never had any other foundation than in the malice of the courtiers)"

কিন্তু বার্ণিয়ার রাজপুত্রীর গুপ্ত প্রেমলীলা সম্বন্ধে দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। পুত্রী গোপনে অন্তঃপুরে কোন প্রিয়পাত্রকে আনিয়াছেন জানিতে পারিয়া সম্রাট্ অসময়ে দুহিতার কক্ষে প্রবেশ করেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া জিহানারা যুবককে স্নানার্থ ব্যবহৃত বৃহৎ কটাহমধ্যে লুকাইয়া রাখেন এবং তাহা বুঝিতে পারিয়া সম্রাট্ কন্যাকে স্নান করিতে নির্দ্দেশ দিয়া ভৃত্যদিগকে ঐ কটাহতলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া জল উষ্ণ করিতে আদেশ করেন। যুবক দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাজপুত্রীর আর একজন প্রিয়পাত্রকে শাহজাহান নাকি দরবারে তাম্বুল দেন—তাহাতে বিষ ছিল এবং তাহাতেই যুবকের মৃত্যু হয়। এই জিহানারা যেমন জ্যেষ্ঠভ্রাতার, অপর কন্যা রৌশেনারা তেমনই ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতী ছিলেন। রৌশেনারার সম্বন্ধে বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন, তিনি অগ্রজার সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারই মত ব্যসনপ্রিয় ছিলেন ("possessed of the same vivacity and equally the votery of pleasure")

শাহজাহানের পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দারা মুক্তহস্ত ছিলেন; কিন্তু তিনি কাহারও পরামর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না এবং সংযমশূন্য ছিলেন। ক্রুদ্ধ হইলে তিনি কাহারও সম্মান রক্ষা করিতেন না। তিনি ইসলামের প্রার্থনা ও উপাসনাদি অনুষ্ঠান ভালবাসিতেন না এবং তাঁহার অন্তঃপুরেও খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু নারীর অভাব ছিল না। মধ্যম সুজা উদার, সাহসী ও চতুর ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিলাসপ্রিয়তা এমনই অসাধারণ ছিল যে, বিশেষ সঙ্কট-সময়েও তিনি কখন কখন সহসা অন্তঃপুরে যাইয়া সুরা লইয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেন—সে সময় কোন মন্ত্রীরও তাঁহার নিকট
উদার, শিষ্ট, যোদ্ধা ও ষড়যন্ত্র-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আহারে ও মদ্যপানে অতিরিক্ত আসক্তি দেখান।

যখন রাজপরিবারে এইরূপ বিলাস ও দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত, তখন ঔরঙ্গজেব চেষ্টা করিলেও সেই স্রোতের গতিরোধ করিতে পারিতেন না। কারণ, তখন সর্ব্বত্র সেই অবস্থা। তাঁহার আমীর ওমরাহরা সূক্ষ্ম মসলীনের নারীজনোচিত

বেশ পরিধান করিতেন, নরবাহ্যযানে শয়ন করিয়া যুদ্ধে যাইতেন। যখন তাঁহারা সম্রাটের সহযাত্রী হইতেন, তখন এক তাম্বু হইতে অন্য তাম্বু গমনকালে যানে নিদ্রিত থাকিতেন এবং তাঁহাদিগের পূর্ব্বেই পরবর্ত্তী গমনস্থানে পাকশালার সব ব্যবস্থা থাকিত।

ধর্ম্মে—"a hereditary system of compromise with strange gods had eaten the heart out of the State religion."

ঔরঙ্গজেব পত্নী সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। তিনি পত্নীকে বিলাসসঙ্গিনী বিবেচনা করিতেন—কিন্তু সেই জন্যই তাঁহার পত্নীদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ লালসাকলুষিত ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। তাঁহার কার্য্যে তাঁহার পত্নীদিগের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। মেনুসী বলেন, তাঁহার বিবাহিতা পত্নীদিগের মধ্যে প্রথমা রাজপুতকন্যা এবং তাঁহার গর্ভে ঔরঙ্গজেবের এক পুত্র (মোয়াজ্জম) ও এক কন্যা হয়; দ্বিতীয়া পারস্য দেশীয়ের দুহিতা এবং আজম ও আকবর নামক দুই পুত্রের ও দুই কন্যার জননী। তৃতীয়া কোন্ জাতীয়া তাহা জানা যায় না—তিনি এক কন্যার জননী হইয়াছিলেন। কামবক্সের জননী "উদীপুরী" জর্জ্জিয়ান খৃষ্টান ছিলেন। দারা ইঁহাকে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং দারার মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব ইঁহাকে অন্তঃপুরিকা করেন। লেনপুল বলেন, এই "উদীপুরীর" প্রতিই ঔরঙ্গজেবের কিছু আকর্ষণ লক্ষিত হইত এবং জীবনের শেষ দশায় তিনি ইঁহারই গর্ভজাত পুত্র কামবক্সের প্রতি অধিক স্নেহ দেখাইতে থাকেন। ঔরঙ্গজেব স্বয়ং পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, কাজেই আপনিও সর্ব্বদা শঙ্কিত ছিলেন—পাছে তাঁহার পুত্ররা তাহাদিগের পিতার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করে। বিলাসে, অবিশ্বাসে চারিদিকে অনিবার্য্য সর্ব্বনাশ লক্ষ্য করিয়া ঔরঙ্গজেব যখন জরাজীর্ণ দেহ ব্যর্থতার মধ্যে রক্ষা করেন, তখন তিনি হয়ত আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বুঝিয়াছিলেন—ধর্ম্মান্ধতায় অনেক ক্ষেত্রেই বিষময় ফল ফলিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'রিয়াজে'র ইংরেজী অনুবাদক লিখিয়াছেন, দিল্লী হইতে বিলাসের ও ব্যসনের ব্যাধি প্রাদেশিক শাসকদিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালায় মুরশিদকুলী খাঁর পরে তাঁহার একমাত্র কন্যা জিন্নেতুন্নেসার স্বামী

সুজাউদ্দীন নবাব-নাজিম হইয়াছিলেন। মুরশিদকুলীর জীবদ্দশায় জামাতার সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের উদ্ভব হয়। সুজার চরিত্রহীনতা—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোককে তাঁহার ন্যায়পরতাও ভুলাইবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দুশ্চরিত্রতার জন্য জিন্নেতুন্নেসা, সুজা উড়িষ্যার শাসনভার পাইলে, তাঁহার সহিত গমন না করিয়া পিত্রালয়েই থাকিতেন। এই সময় আলীবর্দ্দী ও তাঁহার ভ্রাতা সুজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা'-লেখক বলেন, উভয় ভ্রাতা আপনাদিগের পত্নী সুজার সেবায় নিযুক্ত করিয়া সুজার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। মুরশিদকুলী স্বীয় দৌহিত্র সরফরাজকেই উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু সুজা শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং মাতা ও মাতামহীর উপদেশে সরফরাজ পিতাকেই মসনদ ছাড়িয়া দিলেন। সুজাউদ্দীন রাজকার্য্যে অভিজ্ঞ ও স্বভাবতঃ দাতা ছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থায় শীঘ্রই শাসন-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলিতে লাগিল। তখন তিনি আবার বিলাসেই আত্মনিয়োগ করিলেন। মুরশিদকুলীর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া নূতন বৃহৎ ও সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল এবং ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ক্রোক-সাজোয়ালের কার্য্যে পাপার্জ্জিত অর্থে নাজির মহম্মদ যে বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া সুজা তাহা প্রমোদভবনে পরিণত করিলেন। বসন্তকালে সুন্দরীসঙ্গে তিনি এই প্রমোদভবনে কালাতিবাহিত করিতেন। ইহার নাম—ফররাবাগ বা আনন্দকুঞ্জ। রাজত্বের শেষভাগে তিনি মন্ত্রীদিগের উপর কার্য্যভার দিয়া এই প্রমোদভবনেই অধিক সময় যাপন করিতেন। 'মুতাক্ষরীণে'র ইংরেজী অনুবাদক বলিয়াছেন, তিনি এমনই প্রবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন যে, যখন দরবারে বিচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখনও মধ্যে মধ্যে সভা ত্যাগ করিয়া পর্দ্দার অন্তরালে কামিনীদিগের নিকট যাইয়া কিছু সময় অতিবাহিত করিয়া আসিতে লজ্জানুভব করিতেন না। এইরূপ গর্হিত কার্য্যের কারণ তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা লিখিতেও লজ্জা হয়।

এইরূপ লালসার ইন্ধনে কত পরিবারের সম্ভ্রম ও কত নারীর ভবিষ্যৎ ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, হিন্দুস্থানে আসিয়া মুসলমানরাও নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা শেরিডেন তাঁহার ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি ব্যবহারের তীব্র নিন্দায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তুরস্কের মত এ দেশে মুসলমান মহিলারা মসজেদে গমন করেন

না, কেবল সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনেই তাঁহারা আবৃতা থাকেন না—অন্তঃপুরের পবিত্রতা যোদ্ধারাও যেমন আইনও তেমনই স্বীকার করে ("held sacred even by the ruffian hand of war or by the more uncourteous hand of law.")

এ দেশের অন্তঃপুর সম্বন্ধে শেরিডেন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি এ দেশের লোকের মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি অন্তঃপুরের পবিত্রতার আবেষ্টনের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন—তিনি সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন :

"They are not confined from a mean and selfish policy of man—not from a coarse and sensual jealousy—enshrined rather than immured, their habitation and retreat is a sanctuary, not a prison—their jealousy is their own—a jealousy of their own honour, that leads them to regard liberty as: a degradation, and the gaze of even admiring eyes as inexpiable pollution of the purity of their fame and the sanctity of their honour."

যে সব স্থানে এই সম্ভ্রম নষ্ট হয়, সে সব স্থানে লোক যে অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। এ দেশে যে তাহাও হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

মুরশিদকুলী দুশ্চরিত্রতার জন্য জামাতার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দৌহিত্র সরফরাজকেও যে সংযমে শিক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। বরং মনে হয়, সরফরাজ তাঁহার পিতার স্বভাব উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন এবং চিত্তবৃত্তি দমনের কোন চেষ্টাও করেন নাই। পিতার শাসননৈপুণ্যও তাঁহার ছিল না। বিশেষ পিতার অনুগ্রহপুষ্ট আলিবর্দ্দী ও তাঁহার পরিবারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার সকারণ সন্দেহের অন্ত ছিল না। তিনি আপনাকে এমনই শত্রু-পরিবেষ্টিত মনে করিতেন যে, পিতার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার সময়ও তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাইতে সাহস করেন নাই। ইহাতে তাঁহার যত দৌর্ব্বল্যেরই কেন পরিচয় পাওয়া যাউক না—তাঁহার পিতার অনুগৃহীত ব্যক্তিদিগের স্বভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায়। শেষে যে সরফরাজের সন্দেহ অমূলক নহে প্রমাণিত হইয়াছিল, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

পিতার অন্তিমকালের উপদেশ স্মরণ করিয়া তিনি প্রথমে কিছুদিন হাজী

আহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু সে ব্যবস্থাও বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার অতিরিক্ত লালসাপরবশতার জন্য তিনি অমিতব্যয়ী, ক্রোধপ্রবণ ও রাজকার্য্যপরিচালনে অসমর্থ হইয়া উঠেন। বাস্তবিক নবীনচন্দ্র সিরাজদ্দৌলার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, সরফরাজ সম্বন্ধে তাহা বিশেষ প্রযোজ্য।—

"বিরাজিত বঙ্গেশ্বর বিচিত্র সভায়!
কামিনী কোমল-কোল রত্ন-সিংহাসন,
রাজদণ্ড সুরাপাত্র—যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য, ঘোরে ত্রিভুবন!
সুগোল মৃণাল ভুজ উত্তরীয়স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে; শুনিছে শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে!
রমণীর সুশীতল রূপের কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল।"

'তারিখ-ই-বাঙ্গালা'-লেখক বলেন—তাঁহার ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর থাকিলেও তিনি সুজাউদ্দীনেরই মত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ভোগার্থ ১৫ শত রমণী সংগৃহীত হইয়াছিল—তিনি ইহাদিগের সহিত বিভিন্ন উদ্যানগৃহে কাল কাটাইতেন। উপপত্নীর পীড়া হইলে রোজা রাখিয়া—মাথায় কোরাণ লইয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিতেন।—ইত্যাদি।

আলমচাঁদ অমিতব্যয়ের জন্য নবাবকে সতর্ক করিলে নবাব তাঁহার সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়া পিতার কল্যাণকামীকে শত্রুতে পরিণত করেন।

সরফরাজের ১৫ শত সুন্দরীর কথা 'রিয়াজে'ও দেখা যায়। উহাতে লিখিত আছে, আলিবর্দ্দী খাস তালুক হইতে সামান্য মাসহারার ব্যবস্থা করিয়া সরফরাজের পরিণীতা পত্নীদিগকে সন্তানসহ জাহাঙ্গীরনগরে (অর্থাৎ ঢাকায়) নির্ব্বাসিত করেন। অবশিষ্ট রমণীদিগের কি হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

সরফরাজের অসংযমের চরম নিদর্শন অসাধারণ ধনবান্ জগৎশেঠবংশকেও তাঁহার শত্রু করিয়া তুলে। এই জগৎশেঠ-পরিবারের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিষয় নবাবের অবিদিত ছিল না। পরবর্ত্তী কালেও এই পরিবারের ঐশ্বর্য্য-পরিচয়ে মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদক লিখিয়াছেন—তিনি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী

ছিলেন। এখনও (১৭৫৬ খৃঃ) তাঁহার গৃহে দুই সহস্র লোকের বাস। যখন মারহাট্টারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে, তখন তাহারা জগৎশেঠের গৃহ হইতে আর্কটের টাকায় মোট ২ কোটি টাকা লুণ্ঠিত করিলেও তিনি পূর্ব্ববৎই কোটি টাকার 'দর্শনী' হুণ্ডী কাটিতে থাকেন—যেন ইহাতে তাঁহার কোনরূপ ক্ষতিই হয় নাই। হলওয়েল বলেন, জগৎশেঠের (ফতেচাঁদের) পৌত্র মহাতাপ রায় এক অসাধারণ সুন্দরী একাদশবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করেন। এই বধূর অসামান্য রূপের খ্যাতি নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া জগৎশেঠের নিকট সেই প্রস্তাব করেন। ইহাতে বংশে অনপনেয় কলঙ্ক-কালিমালেপ হইবে বলিয়া জগৎশেঠ কাতরভাবে নবাবকে নিরস্ত হইতে বলিলেও নবাব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া শেঠগৃহ বেষ্টন করিবার জন্য একদল সৈনিক প্রেরণের আদেশ করেন। তিনি কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করেন, তিনি বালিকাকে দেখিয়াই ফিরাইয়া পাঠাইবেন। বলপ্রকাশভয়ভীত জগৎশেঠ অগত্যা নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হয়েন এবং রাত্রির অন্ধকারে শেঠবধূ নবাবভবনে প্রেরিতা ও পুনঃপ্রেরিতা হয়েন।

অর্ম্ম লিখিয়াছেন :

"His (Juggutseat's) eldest son...married a woman of exquisite beauty, the report of which alone inflamed the curiosity of the Nabab so much, that he insisted on seeing her, although he knew the disgrace which would be fixed on the family, by shewing a wife, unveiled, to a stranger. Neither the remonstrances of the father nor his power to revenge the indignity, availed to divert the Nabab from this insolent and futile resolution. The young woman was sent to the palace in the evening ; and, after staying there a short space, returned, unviolated indeed, but dishonoured, to her husband."

যিনি বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব-নাজিম, তিনি যে জগৎশেঠের প্রতিহিংসা গ্রহণের দুর্জ্জয় ক্ষমতা ও আপনার পদের সম্ভ্রম সব ভুলিয়া এমন কাজ করিতে পারেন, ইহাতে বিস্মিত হইবারই কথা। বোধ হয়, সেই জন্যই অর্ম্ম লিখিয়াছেন—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি নবাবের বুদ্ধিবিকৃতি ঘটাইয়াছিল।

সরফরাজের এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ কিম্বদন্তী অন্যরূপে সিরাজের সম্বন্ধে

আরোপিত করিয়াছে। নবীনচন্দ্র তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজদ্দৌলার সম্বন্ধে জগৎশেঠের উক্তি লিখিয়াছেন :—

"...বিদরে হৃদয়
বলিতে সে সব কথা তপ্তলোষ্ট্র সম
ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় ;
প্রতি কেশরন্ধ্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-নির্গম
হয় বিদ্যুতের বেগে। কি বলিব আর,
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর সম, ভূভারত জুড়ে
প্রজ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা সঞ্চার।"

নবীনচন্দ্র যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখনও বাঙ্গালার ইতিহাস যথাযথরূপে লিখিত হয় নাই। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লেখক নিখিলনাথ রায় লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সরফরাজের সহিত কতিপয় বিষয়ে সিরাজের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় একের দোষ অপরের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। সরফরাজ ও সিরাজ উভয়ে মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হন। যদিও সরফরাজের পিতা কিছুদিন তাহা ভোগ করিয়াছিলেন। উভয়ের চরিত্র দূষিত ছিল, উভয়েই আপন আপন কর্ম্মচারী দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন এবং উভয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেই জগৎশেঠরা বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন—এই সমস্ত কারণে সম্ভবতঃ সরফরাজের দোষ সিরাজের উপর অর্পিত হইাছে।" নবীনবাবু তৎকালপ্রচলিত কিম্বদন্তীই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র জগৎশেঠ-পরিবারের ঐশ্বর্য্যের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। সে কথা তখন সত্যই "সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র প্রবাদের মত।"

সেই জগৎশেঠ যখন এইরূপে অপমানিত হইয়াছিলেন—তখন সাধারণ গৃহস্থদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল ও হইতে পারিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

জগৎশেঠ অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন—এমন কি নবাবকেও কখন কখন তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইতে হইত, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং প্রতিহিংসা গ্রহণও করিয়াছিলেন। তিনি কৃতঘ্ন আলিবর্দ্দীর

সহিত যোগ না দিলে আলিবর্দ্দীর পক্ষে প্রভুকে হত্যা করিয়া তাঁহার স্থান গ্রহণ করা সহজসাধ্য হইত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু দরিদ্র ও মধ্যবিত্তরা—এমন কি সাধারণ ধনীরাও এইরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিলে তাহার প্রতীকারোপায় করিতে পারিতেন না। কাজেই লোকের মন এই সব মুসলমান শাসকের উপর একান্তই তিক্ত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' কেবল হিন্দুদিগের কথারই উল্লেখ করিয়াছেন ; কারণ তিনি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীই যে নানা অনাচারে অত্যাচারে পীড়িত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মুসলমান-দিগকে এইরূপ ব্যাপারে "জাতিচ্যুত" বা সম্প্রদায়ে হতমান হইয়া থাকিতে হইত না—এইটুকুই প্রভেদ ছিল। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের যে ইতিহাস পরবর্ত্তী কালে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এই সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দলবদ্ধ মুসলমানেরও অভাব ছিল না। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে "কাউন্সিল" লিখিয়াছিলেন—সন্ন্যাসী বা ফকীর নামে পরিচিত একদল দস্যু বহু দিন হইতে তীর্থভ্রমণের ছলে এ দেশে অনাচার করিয়া থাকে। ঐতিহাসিক হাণ্টার বলিয়াছেন—দুর্ভিক্ষের পর, যে সকল সর্ব্বস্বান্ত কৃষকের পুনরায় কৃষিকার্য্য করিবার জন্য আবশ্যক বীজ ও যন্ত্রাদি ছিল না, তাহারাও ইহাদিগের দল পুষ্ট করে এবং ইহারা এক এক দলে ৫০ হইতে ১ হাজার লোক দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিত ; দেশের জনগণও ইহাদিগের সহিত যোগদান করায় রাজস্ব আদায় করা অসম্ভব হয় এবং পল্লী অঞ্চলে শাসন শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যায়।

দেশের জনগণ বলিলে যে কেবল হিন্দুদিগকেই বুঝায় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একটি সম্প্রদায়কে লইয়াই তাঁহার উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং কেন তাহা করিয়াছিলেন, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সরফরাজের সময়—একদিকে দুর্নীতি আর একদিকে ষড়যন্ত্র কিভাবে বাঙ্গালার মুসলমান-শাসনে দেশবাসীর সমর্থন ও সহানুভূতি বিরূপ করিয়াছিল, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। ইহার পর এই দুই ব্যাপার কিরূপভাবে প্রবল হইয়াছিল তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। আলিবর্দ্দী অসহায় অবস্থায় ভাগ্যান্বেষণে বাঙ্গালায় আসিয়া যখন মুরশিদকুলীর অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয়া উড়িষ্যায় সুজার নিকট গমন করেন—তখন সুজার অনুগ্রহার্জ্জন জন্য তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা যাহা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা লজ্জাজনক। 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা'-লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অন্য কোন ইতিহাসে দেখা যায় না।

সে যাহাই হউক, তিনি বাঙ্গালার নবাব-নাজিম হইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কলঙ্কজনক। যে সুজা খাঁর অনুগ্রহ না পাইলে এক কালে তাঁহাকে ও তাঁহার স্বজনগণকে অন্নকষ্টে পীড়িত হইতে হইত, তিনি তাঁহারই পুত্র ও স্বীয় প্রভু সরফরাজকে বিনষ্ট করিয়া গদী লাভ করেন।

সরফরাজের বিরুদ্ধে তিনি অগ্রসর হইলে সরফরাজ তাঁহার প্রকৃত মনোভাব জানিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন—কারণ, তাঁহার পিতার অনুগ্রহে জীবন-ধারণকারী তাঁহার কর্ম্মচারী যে তাঁহার প্রতি চরম কুব্যবহার করিবে, ইহা তিনি তখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আলিবর্দ্দী ঐ সকল লোকের নিকট লিখিয়া পাঠান—

"আপনার পিতার অনুগ্রহে আমি যে দৈন্যের ধূলি হইতে উচ্চপদের গৌরবে উন্নীত হইয়াছি, ইহা আমি গর্ব্ব সহকারে স্মরণ করি। ...আমার প্রার্থনা, আপনি আমার দুইটি অনুরোধের একটি রক্ষা করুন। প্রথম—আপনার যে সকল পার্শ্বচর আমার ও আমার স্বজনগণের উন্নতিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া আপনাকে নূতন নূতন পরামর্শ দিতেছে এবং বর্ত্তমান ব্যাপারের কারণ হইয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করুন। ইহাদিগের নাম—মার্দ্দন আলি খাঁন, মীর মূর্ত্তিজা খাঁন, হাজী লুৎফালী খাঁন, মহম্মদ ঘোষ খাঁন। ইহারা দূরীভূত হইলে আপনার ভৃত্য (আমি) আপনাকে নিরাপদ বুঝিয়া আপনার নিকটে যাইয়া শ্রদ্ধানিবেদন করিব। দ্বিতীয়—যদি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করা সম্ভব না হয়, তবে আপনি প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ করুন। যদি ইহারা জয়ী হয়, ভাল; আর যদি আমি যুদ্ধে জয়লাভ করি, তবে তাহারা দূরীভূত হইলে আমি যাইয়া আপনার চরণ স্পর্শ করিব। আমার কথার আন্তরিকতার প্রমাণে আমি এই কোরাণ পাঠাইতেছি। এই কোরাণ স্পর্শ করিয়া আমি এই শপথ করিতেছি।"

'মুতাক্ষরীণে'র টীকায় ও 'রিয়াজে' দেখা যায়—এই 'কোরাণ' ইষ্টকখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে—ইষ্টক কোরাণের আকারে প্রস্তুত করিয়া জরীর কার্য্য করা বস্ত্রে আবৃত করিয়া পাঠান হয়।

যিনি প্রভুপুত্র প্রভুর সহিত এইরূপ আচরণ করিতে পারেন, তাঁহার স্বভাব কিরূপ ঘৃণিত তাহা যেমন সহজে অনুমান করা যায়, যিনি ইষ্টকখণ্ড কোরাণ বলিয়া প্রতারণা করিতে পারেন, তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি কিরূপ তাহাও তেমনই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যিনি রাজ্যলোভে এইরূপ প্রতারণা করিতে ও পরে সরফরাজের মৃত্যু ঘটাইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে পত্নীসম্বন্ধীয় রটনা হয়ত সত্য হইতেও পারে।

তাঁহার ধূর্ত্ততা ও নিষ্ঠুরতাও যে অসাধারণ ছিল, তাহার প্রমাণ—প্রভুর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া সরফরাজের জননী জিন্নেতুন্নেসা বেগমের প্রাসাদদ্বারে যাইয়া—তাঁহার শোকবিক্ষত হৃদয়ে ক্ষারক্ষেপের জন্য বিনীত ভাব দেখাইয়া কৃত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং কোন উত্তর না পাইয়া দরবারগৃহে যাইয়া সর্ব্বসমক্ষে গদীতে আরোহণ করেন। সরফরাজের ভগিনী নফিসা খাতুন্ ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের জীবনরক্ষার জন্য স্বয়ং অপমান সহ্য করিয়া নওয়াজিসের (আলিবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা) গৃহকার্য্যের ব্যবস্থাভার লইয়া মুর্শিদাবাদেই অবস্থান করেন। আলিবর্দ্দীর তিন কন্যার সহিত তাঁহার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হয়। প্রথমা ঘেসেটী বেগম, দ্বিতীয়ার নাম জানা যায় না; কনিষ্ঠা আমিনা বেগম—সিরাজদ্দৌল্লার মাতা। ইঁহার সম্বন্ধে 'মুতাক্ষরীণে'র টীকায় লিখিত আছে, তিনি বিধবা হইয়া ইন্দ্রিয়াসক্তির জন্য পরিচিতা হয়েন—"**became famous in Moorshoodabad, after her husband's death, by her amours and gallantry.**

'মুতাক্ষরীণে' দেখা যায়, সে সময় দিল্লীতে ফৈজী বা ফৈজন নামে এক নর্ত্তকী ছিল। তাহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি তাহার প্রতি অনেককে লোলুপ করিয়াছিল। সিরাজদ্দৌল্লা লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। দিল্লীর ঐতিহাসিক বলেন, ফৈজী আদর্শ সুন্দরী ছিল—স্বর্ণবর্ণ এবং তাহার ওজন ২২ সের মাত্র। সে তাম্বুল চর্ব্বণ করিলে তাহার চর্ম্মের মধ্য দিয়া পানের রসের গতি দেখা যাইত। যদিও নবাবের অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষ সতর্কতা সহকারে আবদ্ধ রাখা হয়, তথাপি তথায় যে অনেক ষড়যন্ত্র ও পাপানুষ্ঠান হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নর্ত্তকী সিরাজদ্দৌল্লার ভগিনীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর নিকট গোপনে আত্মদান করে। সৈয়দ মহম্মদের সৌন্দর্য্যই নাকি তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল (**"a very handsome man, as fair as an European, and of such a beauty of features, and stoutness of body, as would have done honour to any company in that part of the world"**)। সৈয়দ মহম্মদ গোপনে অন্তঃপুরে গতায়াত আরম্ভ করার পরই সিরাজদ্দৌল্লা ঐ বিষয় অবগত হয়েন। তিনি তখন ফৈজীকে বলেন, "তবে ত দেখিতেছি, তুমি বারাঙ্গনা!" ফৈজী বুঝিলেন, নিষ্ঠুর সিরাজের কোপানলে তাহাকে ভস্মীভূত হইতেই হইবে। সেই জন্য সে সাহস করিয়া তাঁহাকে উপহাসের ও তিরস্কারের ভাবে বলে—"তাহা

ত সত্যই। আমি বারাঙ্গনা—আমাকে বারাঙ্গনা বলিলে তাহাতে আমার লজ্জার কারণ হয় না; তবে আপনার মাতার পক্ষে ঐ উক্তি তিরস্কার বটে।" সিরাজদ্দৌলা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে একটি কক্ষে বদ্ধ করিয়া উহার দ্বার প্রাচীর গাঁথিয়া রুদ্ধ করিয়া দেন। অনাহারে তথায় ফৈজীর মৃত্যু হয়। 'মুতাক্ষরীণের' অনুবাদক নাকি তাহার কয়খানি প্রতিকৃতি বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন।

ফৈজীর তিরস্কারে মোপাঁসার একটি গল্প অনেকের মনে পড়িবে। এক কিশোরীর মাতার নৈতিক শৈথিল্য ছিল—সে কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিল। কিশোরীর রূপে ও গুণে বহু যুবক আকৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইত না। মাতার চরিত্রের জন্যই যে কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় না, তাহা জানিয়া কিশোরী সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিত; তাহার মাতা তাহার বিষাদের কারণ জানিতে পারিয়া বলিয়াছিল, যাহারা অভাবের তাড়নায় আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য না হইয়াও—কেবল লালসাহেতু বিপথগামিনী হয়, তাহারাই বারাঙ্গনা। "Do they starve themselves—your good women? Not they. It is they who are the drabs, do you hear? Because they are not obliged, they have money, plenty to live on, plenty to amuse them—and yet they have their lovers! Wantons! It is they who are the drabs!"

আলিবর্দ্দীর দুহিতাদিগের সম্বন্ধেও ইহাই বলা যায়। তিনি যে দুহিতাদিগকে ও দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে ধর্ম্মপথে—সংযমের পথে রাখিতে কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ দেখা যায় না।

আলিবর্দ্দীর সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-লেখক লিখিয়াছেন, তিনি জীবনে একাধিক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন নাই এবং অপরিচিতা নারীর সঙ্গও ভালবাসিতেন না। সেই কথা লইয়া তিনি গর্ব্ব করিতেন। ("Avoided the company of strange women, and did not care for this sort of pleasure, during his life he had only one wedded wife, and in fact, he often plumed himself on this circumstance.") আলিবর্দ্দীর একাধিক বিবাহিতা পত্নী ছিলেন না, এই উক্তিতে অবিবাহিতা পত্নীর কোন ইঙ্গিত আছে কি না বলা যায় না। তবে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী যে বিশেষ দৃঢ়চেতা ও সাহসী—যাহাকে "জবরদস্ত" বলা যায় তাহাই ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুজাউদ্দীনের জামাতা—উড়িষ্যার শাসক মুর্শিদকুলীকে পরাভূত করিবার জন্ম আলিবর্দ্দী যখন অগ্রসর হয়েন, তখন যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনা ঘটিলে আলিবর্দ্দী যে হস্তীর পৃষ্ঠে অনেকটা পথ সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীও সেই করিপৃষ্ঠে ছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'রিয়াজে'র অনুবাদক বলিয়াছেন, তখনও মুসলমান মহিলারা শুদ্ধান্তে অবরুদ্ধা থাকিবার প্রথা অবলম্বন করেন নাই। বাস্তবিক আলিবর্দ্দী যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বিব্রত থাকিতেন, তখন তাঁহার পত্নী রাজনীতিক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন।

'মুতাক্ষরীণে' দেখা যায়, রঘুজীর অধীন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধকালে একদিন আলিবর্দ্দী চিন্তান্ধকারমুখে কক্ষে প্রবেশ করিলে তাঁহার পত্নী তাঁহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আলিবর্দ্দী উত্তর দেন, তাঁহার আশঙ্কা হইতেছে, তাঁহার দলে বিশ্বাসঘাতকতার আবির্ভাব হইয়াছে। সেই কথা শুনিয়া বেগম নিজ দায়িত্বে ও নিজের ক্ষমতায় এক রাজনীতিক চাল চালেন—তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া কয় জন লোককে রঘুজীর নিকট প্রেরণ করেন। রঘুজী জালে পদার্পণ করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরামর্শদাতা মীর হবিব মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠনের লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন। 'রিয়াজে'র অনুবাদক বলিয়াছেন—

"The Begum must have been a lady of keen judgement and uncommon sagacity to have been relied upon at such a crisis by her shrewd husband."

বেগমের এইরূপ দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তাই আলিবর্দ্দীর দ্বিতীয় বিবাহের কল্পনা তাঁহার মনে স্থান লাভ অসম্ভব করিয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না।

আলিবর্দ্দী ও তাঁহার পত্নী কেহই যে কন্যাদিগের ও দৌহিত্রের চরিত্র-সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই, তাহাও উল্লেখযোগ্য। আবার উভয়েই যে হোসেন কুলীর হত্যার মত কার্য্যে সিরাজদ্দৌলার সমর্থক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সিরাজের জ্যেষ্ঠতাত ও তাঁহার মাতার অগ্রজার স্বামী নওয়াজিস মহম্মদ ঢাকার সহকারী নবাব হইলেও তাঁহার অনুগৃহীত হোসেন কুলী নামক এক ব্যক্তি দেওয়ান-রূপে তথায় কার্য্য-পরিচালনা করিতেন। ক্রমে এই ব্যক্তিই নওয়াজিসের গৃহে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে। আলিবর্দ্দীর প্রথমা কন্যা ঘেসেটী বেগমের সহিত তাহার অবৈধ ঘনিষ্ঠতার কথা চারিদিকে আলোচিত হইতে থাকে এবং শেষে সিরাজের মাতার

সহিত তাহার ঐরূপ ঘনিষ্ঠতার কথা প্রকাশ পায়। (He "had quitted this Princess for her younger sister, Amna Begum, of amorous memory, mother to Seraj-i-doula") এই হত্যাকাণ্ডে সিরাজদ্দৌলা তাঁহার মাতামহীর সম্মতি চাহিলে তিনি স্বামীকে উহা জ্ঞাত করান। আলিবর্দ্দী তাহাতে উত্তর দেন, নওয়াজিসের সম্মতি ব্যতীত তাহা করা সঙ্গত হইবে না। এইরূপে আলিবর্দ্দীর পরোক্ষ সম্মতি পাইয়া বেগম স্বীয় দুহিতা ঘেসেটির সাহায্যে জামাতার সম্মতিলাভের ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হোসেন কুলী তখন ঘেসেটীর পরিবর্ত্তে আমনার সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সেইজন্য ঘেসেটী তাঁহার উপর রুষ্ট ছিলেন। মাতাপুত্রীর প্ররোচনায় যখন নওয়াজিস ঐ কার্য্যে সম্মতি দেন, তখন আলিবর্দ্দী খাঁ শিকারের ছলে রাজমহলে গমন করেন। আলিবর্দ্দী রাজধানী ত্যাগ করিবার পর সিরাজদ্দৌলা জ্যেষ্ঠতাতের নিকটে যাইয়া অনুমতি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পথে হোসেন কুলীর গৃহদ্বারে আসিয়া হোসেন কুলীকে ও তাঁহার ভ্রাতাকে আনিতে বলিলেন। হোসেন কুলী বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। গৃহদ্বারে লোকসমাগম দেখিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী গৃহে (হাজী মেহেদীর) আশ্রয় লইয়া নওয়াজিসকে সংবাদ দিতে বলিলেন। নওয়াজিস বহুবার কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি হোসেন কুলীকে সকল বিপদে রক্ষা করিবেন। হোসেন কুলী তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। হাজী মেহেদী আশ্রিতের অনুরোধে নওয়াজিসের নিকট যাইয়া যখন কোন আশা পাইলেন না, তখন তিনি গৃহে ফিরিলেন। ততক্ষণে সিরাজদ্দৌলার অনুচরগণ হোসেন কুলীকে ও তাঁহার ভ্রাতা অন্ধ হায়দার আলীকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে। "নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, পিশাচ" সিরাজদ্দৌলা হোসেন কুলীকে দেখিয়াই তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিল এবং অনুচররা তাহাই করিল। হোসেন কুলীর ভ্রাতা নিহত হইবার পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলাকে, তাহার মাতাকে ও তাহার স্বজনগণকে গালি দিয়া বলেন—"অপদার্থ, তুই এইরূপে বীরদিগকে হত্যা করিস!"

'মুতাক্ষরীণের' গ্রন্থকার আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন,—"এইরূপে যে নিরপরাধের রক্তপাত করা হইল, তাহা নানারূপ বিপদের কারণ হইয়া উঠিল। আলিবর্দ্দী বহু কায়িক ও অনুরূপ শ্রমে যে ক্ষমতা ও রাজ্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারই সর্ব্বনাশ ঘটিল; ইহাতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহা ধূমান্বিত হইয়া আলিবর্দ্দীর বংশ ভস্মীভূত করে এবং এক দিন যে বাঙ্গালা সুখী ছিল,

তাহার বিশেষ অনিষ্টসাধন করে—বাঙ্গালাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করে। যে যেরূপ কার্য্য করে, সে সেইরূপ ফলভোগ করে।"

এরূপ ঘটিবার কারণ—আলিবর্দ্দীর পরিবারের হীন মনোবৃত্তি ও সেই পরিবারে পাপের প্রবাহ।

এইরূপ হত্যাকাণ্ড যে এই প্রথম ও শেষ, তাহাও নহে।

আলিবর্দ্দীর সম্মতিতেই সিরাজদ্দৌলা অত্যন্ত কুক্রিয়াসক্ত হইবার সুযোগ ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। হয়ত তিনি লালসাকলুষিতা জননীর নিকট হইতে তাঁহার প্রবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি আলিবর্দ্দীর চেষ্টায় সংযত হয় নাই; পরন্তু মাতামহ তাহাতে, প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে, উৎসাহ দিয়াছিলেন। যে সময় মহারাষ্ট্রীয়রা বাঙ্গালার প্রজাকে লুণ্ঠনে সর্ব্বস্বান্ত ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিতেছিল, সেই সময় তাহাদিগের আক্রমণ হইতে প্রজাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ নবাব দৌহিত্রের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় বা অর্থের অপব্যয় করিতেছিলেন। নওয়াজিস মহম্মদ মুর্শিদাবাদে মোতি ঝিলের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড গৃহে বাস করিতেন বলিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে সিরাজদ্দৌলার জন্য এক বৃহৎ গৃহ নির্মিত হয়—সম্মুখে হীরাঝিল খনিত হয়। গৌড় হইতে কারুকার্য্যসুন্দর ইষ্টক আনিয়া তাহা এই গৃহের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং জলকেলীর ব্যবস্থাও থাকে। গৃহের ও গৃহাধিকারীর ব্যয়ের জন্য "নজরানা মনসুরগঞ্জ" নামক এক নূতন কর প্রজার স্কন্ধে স্থাপিত হয়। এই নূতন কর ("নজরানা") সম্বন্ধে গ্রাণ্ট তাঁহার রাজস্ববিবরণীতে তৎকাল-প্রচলিত একটি প্রবাদ-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উহা এইরূপ—গৃহনির্ম্মাণ শেষ হইলে সিরাজদ্দৌলার নিমন্ত্রণে ধনী জমিদার প্রভৃতি সহ আলিবর্দ্দী তাহা দর্শন করিতে (গৃহপ্রবেশ?) গমন করিলে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে যাইতে নবাব দৌহিত্র কর্তৃক এক কক্ষে আবদ্ধ হইলেন। সমবেত ধনবান্ ব্যক্তিরা ৫ লক্ষ ১ হাজার ৫ শত ৯৭ টাকা দিয়া নবাবকে মুক্ত করেন এবং পরবৎসর হইতে ঐ টাকাই "নজরানা মনসুরগঞ্জ" নামে নূতন কররূপে আদায় হইতে লাগিল। গ্রাণ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—সম্ভবতঃ সিরাজের সহিত পরামর্শ করিয়া আলিবর্দ্দী এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তখন সিরাজদ্দৌলার অসাধ্য কিছুই ছিল না। নওয়াজিস মহম্মদ অত্যন্ত পীড়িত হইলে আলিবর্দ্দীর নির্দ্দেশে তাঁহাকে তাঁহার পোষ্যবর্গসহ প্রাসাদে আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যখন চিকিৎসায় কোন ফললাভ হইল না,

তখন সিরাজদ্দৌলা পিতার প্রাসাদেই তাঁহাকে বন্দী করিবেন, এই আশঙ্কায় ঘেসেটী বেগম কোনরূপে স্বামীকে লইয়া নিজগৃহে পলায়ন করেন।

'মুতাক্ষরীণ'-লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই আলিবর্দ্দীর পরিবারের পাপপ্রবণতা প্রকাশ পায়। নওয়াজিসের বিষণ্ণ ভাবের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:

"কেবল তিনিই যে বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু সেই সময় হইতে আলিবর্দ্দীর সমগ্র পরিবারই যেন শুকাইয়া যাইতেছিল। সরফরাজের মৃত্যুর পর আলিবর্দ্দীর ভ্রাতা হাজী আহম্মদ তাঁহার পরিজনগণের প্রতি যে কু-ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই সর্ব্বদর্শী ভগবান্ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর সম্মতি ব্যতীত সে কাজ কখনই সম্ভব হয় নাই। সরফরাজের অন্তঃপুরের পবিত্র আবরণ হাজী আহম্মদ অপসারিত করিয়াছিলেন—তিনি সেই অন্তঃপুরে পাপদৃষ্টি দিয়াছিলেন—তিনি সরফরাজের কোন কোন পত্নীকে লালসাবশে শয্যাসঙ্গিনী করিতেও দ্বিধানুভব করেন নাই—কাহারও কাহারও প্রতি বল প্রয়োগও করিয়াছিলেন। নবাব তাঁহার ভ্রাতার এই সকল কুকার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন নাই। তিনি তাঁহার পদের সঙ্গে সঙ্গে সুবার সর্ব্বপ্রধান বিচারক হইলেও যে সরফরাজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি এই সব অত্যাচারের প্রতীকার করেন নাই, সেইজন্য ঈশ্বর এইরূপ অত্যাচারীর ঐরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ঐ সব অত্যাচারের প্রতিশোধব্যবস্থা—পাপের প্রতিফল দান করেন। আলিবর্দ্দী যে সময় ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন, তখন তাঁহার পরিবারের কোন কোন মহিলা ও পুরুষ যেরূপ ঘৃণ্য দুশ্চরিত্রতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহাতে ঐ পরিবার চিরকালের জন্য ঘৃণ্য হয়। তাঁহার দুহিতারা সকলেই এবং তাঁহার পরম আদরের (দৌহিত্র) সিরাজদ্দৌলা যেরূপ কুকার্য্যে ও লাম্পট্যে—যেরূপ ঘৃণ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহা যে-কোন লোকের পক্ষে লজ্জাজনক—তাঁহাদিগের মত পরিবারের লোকের ত কথাই নাই। তাঁহার এই আদরের দৌহিত্র—সিরাজদ্দৌলা রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া এরূপ ঘৃণ্য আচরণ করিত যে, লোক তাহাতে স্তম্ভিত না হইয়া পারিত না। নবাব-পরিবারের এক দল কুক্রিয়াসক্ত সহচর সঙ্গে লইয়া সে পথে পথে যেরূপ জঘন্য ব্যবহারে কাল কাটাইত, তাহাতে পদমর্য্যাদা, বয়স বা স্ত্রীপুরুষ বিচার থাকিত না। আলিবর্দ্দী বহু শ্রমে ও বহু বিপদ সহ্য করিয়া যে ক্ষমতা ও সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন,

এই সব কুকার্য্য তাহা ধ্বংস করিতে থাকে। তাহার এইরূপ কুকার্য্যের প্রতিকার না হওয়ায়—নবাব পরোক্ষভাবে সে সকলের সমর্থন করায় এই যুবক যেরূপ কার্য্য করিতে থাকে, তাহাকে সর্ব্বদর্শী ভগবানের প্রতিশোধের অনলে কেবলই ইন্ধনযোগ হইতেছিল। আলিবর্দ্দী তাহার এইরূপ ব্যবহার উপেক্ষা করায় তাহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায় এবং সে নির্ভয়ে প্রতিদিন অতি ঘৃণ্য অনাচারের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। সে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিচারে যাহাকে ইচ্ছা তাহার লালসাতৃপ্তির উপকরণে পরিণত করিতে থাকে, যৌবনসুলভ চাপল্য-প্রণোদিত হইয়া যাহার উপর ইচ্ছা অনাচারের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। সে তাহারই মত চরিত্রের সঙ্গী লইয়া নানারূপ কুকার্য্য করিতে থাকে এবং হয় যৌবনের অজ্ঞতায়, নহে ত আলিবর্দ্দীর নিকট তিরস্কৃত হইবার ভয় না থাকায়, অনুশীলনফলে উহাই তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। শেষে এমনই হয় যে, যখনই সে অত্যাচার ও অনাচারের অনুষ্ঠান করিতে না পাইত, তখনই সে বিষণ্ণ হইয়া থাকিত। সেইরূপ কার্য্যে তাহার চিত্তে অনুতাপ হইত না এবং অনুষ্ঠানের পর সে সব সে আর মনেও রাখিত না। পাপপুণ্যে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় সে স্বজনগণকেও অনাচার হইতে অব্যাহতি দিত না এবং যে স্থানেই যাইত, সেই স্থানই পাপে কলুষিত করিত। সে পদমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিকৃতবুদ্ধি ব্যক্তির মত সম্মানিত উচ্চবংশীয়দিগের গৃহও তাহার কুক্রিয়ার স্থানে পরিণত করিত। অল্পকালমধ্যেই লোকে তাহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে এবং সহসা তাহার সম্মুখে পতিত হইলে লোকে ভগবান্‌কে স্মরণ করিত—'ভগবান্, আমাদিগকে উহার হস্ত হইতে রক্ষা করুন'।

সিরাজদ্দৌলার বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব। সেইজন্য এ বিষয়ে আর কোন কথা এই স্থানে বলিব না। কেবল সিরাজদ্দৌলার এইরূপ কার্য্যে যিনি বাঙ্গালার নবাব-নাজিম হইয়াও কোনরূপ বাধাপ্রদান করেন নাই, সেই আলিবর্দ্দীর মনোভাবের পরিচয়-প্রদানার্থ এই বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

'মুতাক্ষরীণ'-লেখক যে আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, তাহা আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। 'রিয়াজে'র ইংরেজী অনুবাদক মৌলবী আবদুস সালেমের উক্তিও এই স্থানে উল্লেখযোগ্য। আলিবর্দ্দী সরফরাজের মৃত্যুর কারণ হইয়া বাঙ্গালার গদী অধিকার করিয়া প্রতিপালক সুজা খাঁর জামাতা মুর্শিদকুলীকে উড়িষ্যার সহকারী শাসকের পদ হইতে উচ্ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই প্রসঙ্গে 'রিয়াজের' অনুবাদক লিখিয়াছেন :

"তিনি (মুর্শিদকুলী) সুজাউদ্দীনের জামাতা ছিলেন এবং পুত্র মহম্মদ তকীর মৃত্যুর পর সুজাউদ্দীন তাঁহাকে উড়িষ্যার সহকারী নাজিম নিযুক্ত করেন। আলিবর্দ্দী ও তাঁহার পাপিষ্ঠ ভ্রাতা হাজী স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রভু ও আশ্রয়দাতার আত্মীয়-স্বজনদিগের মধ্যে কোন উপযুক্ত পুরুষকে জীবিত রাখিবেন না। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় যে রাজত্বের আরম্ভ এবং যাহাতে নানা কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে তাহার শোচনীয় পরিণামই অনিবার্য্য। পাপী হাজী অতি অল্পদিনেই তাঁহার কার্য্যের প্রতিফল পাইয়াছিলেন। আফগানরা পাটনা আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র জৈমুদ্দীন খাঁকে (ইনিই সিরাজদ্দৌলার পিতা) বিশেষ নির্য্যাতন করিয়া নিহত করে। যে মহারাষ্ট্রীয়রা পুনঃ পুনঃ পঙ্গপালের মত বাঙ্গালায় আসিয়া সমগ্র প্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহাদিগের আক্রমণে আলিবর্দ্দী বিব্রত ও বিপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবানের এই দণ্ডের প্রতিকারে তাঁহার উদ্যম, সাহস ও বীরত্ব বিফলই হইয়াছিল। অবশেষে তিনি তাহাদিগের সহিত অপমানজনক সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—উড়িষ্যা প্রদেশ তাহাদিগকে প্রদান করিতে হয়। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁহার স্নেহের দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী অসদুপায়ে যে প্রাদেশিক শাসনপদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বংশীয়দিগের পক্ষে নিশ্চিহ্ন হইয়া অপরের হস্তগত হয়। আলিবর্দ্দী খাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটিতে বিলম্ব হয় নাই।"

যখন কোনরূপ অনাচারের অনুষ্ঠানে কুণ্ঠিত না হইয়া আলিবর্দ্দী ষড়যন্ত্র করিয়া পাপপথে বাঙ্গালার গদী লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই গদী তাঁহার আদরে সর্ব্ববিধ কুক্রিয়ায় পারদর্শী দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনোভাবে সেই কথা মনে পড়ে—

"ভাসল তরী সকাল বেলা ভাবিলাম, এ জলখেলা
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।"

"—Proudly riding o'er the azure realm
In gallant trim the gilded vessel goes ;
Youth on the proud, and Pleasure at the helm ;
Regardless of the sweeping whirlwind's sway,
That, hush'd in grim repose, expects his ev'ning prey."

আলিবর্দ্দী স্বয়ং নানারূপ পাপানুষ্ঠানফলে বাঙ্গালার গদী পাইয়াছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচার হইতে বাঙ্গালার প্রজাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালার] প্রজার কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহার পরিবারে যে পাপপ্রবাহ প্রবাহিত ছিল, তাহাতে জনগণের পক্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা অসম্ভব হয়। সিরাজদ্দৌলার দুশ্চরিত্রতা যে তাঁহার ব্যবহারেই প্রশ্রয় পাইয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সেই জন্যই একাধিক মুসলমান লেখক তাঁহার লাঞ্ছনা ও সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরিণাম পাপের ফল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সিরাজদ্দৌলার বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা আলিবর্দ্দীর কার্য্যে দেখিতে পাই, তিনিই বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়া সেই বৃক্ষ বিবর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছিলেন—তাহার বিষফলে সমগ্র প্রদেশ বিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছে।

আলিবর্দ্দী ও সিরাজদ্দৌলার কার্য্যে দেশের জনগণ বিপন্ন ও তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছিল।

আলীবর্দ্দীর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজদ্দৌল্লার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। একমাত্র সন্তান কন্যার স্বামী সুজাউদ্দীন চরিত্রহীন ছিলেন বলিয়া মুর্শিদকুলী তাঁহার প্রতি এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে একরূপ বর্জ্জনই করিয়াছিলেন—তাঁহার কন্যা ও স্বামীর সহিত বাস করিতেন না। আর আলীবর্দ্দীর প্রশ্রয়েই সিরাজদ্দৌলা যথেচ্ছা অনাচারের অনুষ্ঠান করিতেন। সিরাজের জননীর প্রকৃতি-প্রাবল্য তাঁহার পুত্রে আরও প্রবল হইয়াছিল, বলা যায়। আর মাতামহের ও মাতামহীর আদরে তাহা বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার প্রতি তাঁহার মাতামহ ও মাতামহী উভয়েরই স্নেহে যে অস্বাভাবিক আতিশয্য ছিল, তাহা বিস্ময়কর। আলীবর্দ্দী যখন যুদ্ধযাত্রা করিতেন, তখনও তাঁহার পত্নী এই দৌহিত্রকে লইয়া তাঁহার সহগামিনী হইতেন। কথিত আছে, প্রথম জীবনে নানারূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করিবার পর (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি ভাগ্যান্বেষণে স্বীয় পত্নীকেও সুজাউদ্দীনের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন) যখন তিনি বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার শাসকের অধীনে সর্ব্বপ্রধান পদ—বিহারের নায়েব-নাজিম হয়েন, তখনই এই দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করায় নবাবের ও বেগমের মনে কুসংস্কার জন্মিয়াছিল—ঐ শিশুই তাঁহাদিগের ভাগ্যোদয়ের

কারণ। এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার কারণ যে থাকিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ, সিরাজদ্দৌলাকে তাঁহাদিগের অদেয় কিছুই ছিল না।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার এই দৌর্ব্বল্যের সুযোগ সিরাজদ্দৌলা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই; তাঁহার অসাধু অনুচররা তাঁহাকে সেই সুযোগ গ্রহণে প্রোৎসাহিত করিত। সিরাজদ্দৌলার পিতা পাটনায় শত্রুহস্তে নিহত হইবার পর রাজা জানকী রাম বিহারে নবাবের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেছিলেন। মেহেদীনেশার প্রভৃতি কতকগুলি লোক সিরাজদ্দৌলাকে বুঝাইয়া দেন, নবাব তাঁহাকে তাঁহার পিতার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। তিনি আর বালক নহেন—সুতরাং তাঁহার পক্ষে তাঁহার পিতার পদলাভে কোন বাধা থাকিতে পারে না। নবাব যে মৌখিক স্নেহ দেখাইয়া তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখিতেছেন—সে কেবল তাঁহার ক্ষমতায় অবিশ্বাসহেতু এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য স্বাধীনতায় বঞ্চিত রাখিবার উদ্দেশ্যে। সিরাজ এই কথাতেই বিশ্বাসস্থাপন করিয়া পাটনায় অভিযান করিয়া বলপূর্ব্বক শাসনভার গ্রহণের দুরাশা-চালিত হইয়া পত্নী লুৎফুন্নেসাকে লইয়া গোপনে অনুচরবর্গসহ পাটনার অভিমুখে যাত্রা করেন। আলীবর্দ্দী তখন মেদিনীপুরে—বর্গীবিতাড়নে বিব্রত। সিরাজদ্দৌলার পাটনা যাত্রার সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া মীরজাফর ও রাজা দুর্লভরামকে সেনাদলের ভার প্রদান করিয়া স্বয়ং শরীররক্ষীদিগকে লইয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। সিরাজদ্দৌলা বলিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। বৃষ্টি, পথের কর্দ্দম—সব উপেক্ষা করিয়া বৃদ্ধ আলীবর্দ্দী খাঁ প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করিয়া চারি দিনে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন এবং তথায় একদিন মাত্র বিশ্রাম লইয়া পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 'মুতাক্ষরীণ'-লেখক লিখিয়াছেন, তিনি সিরাজদ্দৌলাকে যে পত্র লিখেন, তাহা প্রেমাস্পদের মুখদর্শনপ্রয়াসী প্রেমিকের পত্রেরই মত। ভাগলপুরে ঐ পত্র পাইয়া সিরাজদ্দৌলা উত্তর দিলেন, নবাব তাঁহার প্রতি যে স্নেহ প্রকাশ করেন, তাহা আন্তরিকতাহীন। তাঁহার এক পিতৃব্য (আলিবর্দ্দীর জামাতা) পূর্ণিয়ায় কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন—আর এক জন (ঘেসেটী বেগমের স্বামী) বাঙ্গালায় সর্ব্বেসর্ব্বা—আর তিনি কেবল কথা ও আদর পাইতেছেন। লোকের নিকট তাঁহার সম্মান দেখাইবার কিছুই তাঁহাকে প্রদান করা হয় নাই—কাজেই তিনি তাঁহার পিতার পদ অধিকার করিতে যাইতেছেন।—"আমি আপনাকে আর এক পদও অগ্রসর হইতে

নিষেধ করিতেছি; কারণ, তাহার ফলে হয়ত ইহাই হইবে যে, হয় আপনার মস্তক আমার অঙ্কে পতিত হইবে—নহেত আমার ছিন্ন শির আপনার হস্তিপদসংলগ্ন হইবে।”

সিরাজদ্দৌলার উত্তরের শেষাংশ শুনিয়া নবাব বলিলেন—“আমার মস্তক তাহার অঙ্কে বা তাহার করিপদে পতিত হইবে—ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। তুমি কিরূপে তাহার মস্তকের কথা আমাকে শুনাইতে সাহসী হইলে?” তিনি উত্তর পাঠাইলেন—সিরাজদ্দৌলা ভুল বুঝিয়াছেন—তিনি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত। পত্রের উপসংহারে তিনি কবির উক্তি উদ্ধৃত করেন—“গাজীরা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দেন। তাঁহারা জানেন না, সংসার-সংগ্রামে যাঁহারা নিয়ত স্নেহের সহিত যুদ্ধ করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ বীর। * * একজন শত্রুহস্তে নিহত হয়েন—আর একজন স্নেহের জন্য নিহত হইয়া থাকেন।”

ইহার পর মাতামহের সহিত সিরাজদ্দৌলার মিলন হইল। এ বার মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সিরাজের অনাচার আরও বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার সেই সময়ের অনাচারের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

ইংরেজ লেখক গ্রেটন মেকলের প্রবন্ধ-সংগ্রহের ভূমিকায় লিখিয়াছেন:

“The fashion for rehabilitating the outcasts of popular opinion from Tibarious to Titus Oates, which is one of the offsprings of modern historical methods.”

অর্থাৎ জনমতে যাঁহারা নিন্দিত হইয়া আসিয়াছেন, আজকাল তাঁহাদিগকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলার সম্বন্ধে এই রীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক পুস্তকলেখক সিরাজদ্দৌলাকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিয়াছেন। ইংরেজের নিকট যাহা সিরাজদ্দৌলার অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তাহার জন্য যে সিরাজদ্দৌলাকে দায়ী করা যায় না, তাহা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে। “অন্ধকূপ-হত্যা” যদি সত্য হয়, তথাপি তাহার জন্য সিরাজদ্দৌলার দায়িত্ব স্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। সে জন্য দেশের লোক যে সিরাজদ্দৌলার উপর বিরক্ত ছিল এবং সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা নহে। তাহার অন্য কারণ ছিল।

সিরাজদ্দৌলার শাসনকাল স্বল্পই ছিল। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেও তিনি

তাঁহার প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের কোন পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, মাতামহের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি শেষে সুরাপান ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিদমনের কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এ দেশের কিম্বদন্তী তাঁহার সম্বন্ধে এমন রটনাও করিয়াছিল যে, তিনি পুণ্যশ্লোকা মহারাণী ভবানীর অসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না দুহিতা তারাকে লাভ করিবার ব্যর্থ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীর পুণ্যপূত জীবনের কথা আজও "বঙ্গে যথা তথা"—তাঁহার কন্যার সম্বন্ধে লোক কোনরূপ ভিত্তি না থাকিলে যে এমন কথা রটনা করিতে পারিত, তাহা মনে হয় না। কারণ, এইরূপ রটনাও মহারাণীর পরিবারের পক্ষে কলঙ্কজনক। বলা বাহুল্য—সিরাজের সে চেষ্টা—সত্য হইলেও—ফলবতী হয় নাই।

তাঁহার সম্বন্ধে এ দেশে যে সব জনরব প্রচলিত ছিল, সে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে কেহ কেহ মিথ্যা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবও হয় নাই। য়ুরোপীয়দের মধ্যে তিনি ফরাসীদিগকেই অধিক অনুগ্রহ করিতেন। সেই ফরাসীরা বলিয়াছেন; তাঁহার বৈশিষ্ট্য—নিষ্ঠুরতা, অর্থগৃধ্নুতা ও কাপুরুষতা। যখন ইংরেজদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য তিনি ফরাসীদিগকে বিদায় দেন, তখনও ফরাসী ল'কে বিদায় দিবার সময় তিনি বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি ল'কে বলিয়াছিলেন—তিনি বিদায় লউন—যদি নূতন কোন অবস্থার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। ল তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন—"আমাকে আবার ডাকিয়া পাঠাইবেন? আমি নিশ্চিত জানি, আপনার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না।" তিনি নাকি ল'কে ১০ হাজার টাকাও দিয়াছিলেন। সেই ল সিরাজচরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাই উল্লেখযোগ্য:

"সিরাজদ্দৌলা ২৪ বা ২৫ বৎসরের যুবক। তিনি দেখিতে সুপুরুষও নহেন। শুনা যায়, আলিবর্দ্দী খাঁ'র মৃত্যুর পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র অতি জঘন্য ছিল। বাস্তবিক তিনি যে কেবল সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়লালসাতৃপ্তির জন্যই বিশেষ পরিচিত ছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু তাঁহার নিষ্ঠুরতার শেষ ছিল না। হিন্দু রমণীরা গঙ্গায় স্নান করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারা সুন্দরী, সিরাজদ্দৌলার চরেরা তাঁহাকে সে সংবাদ দিত এবং তাঁহার লোক গুপ্তভাবে ছোট ছোট নৌকায় থাকিয়া

(স্নানকালে) তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইত। যখন বর্ষাকালে নদী বেগবতী ও কূলপ্লাবিনী হইত, তখন দেখা যাইত, তিনি খেয়া নৌকা ডুবাইয়া দেওয়াইতেন এবং শত শত নর-নারী-শিশু ডুবিবার সময় কিরূপ ভীতিভাব প্রদর্শন করিত, তাহা দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। বলা বাহুল্য, আরোহীদিগের মধ্যে অনেকে সন্তরণ না জানায় ডুবিয়া মরিত। যখন কোন মন্ত্রী বা অন্য লোককে হত্যা করা হইত, তখন সিরাজদ্দৌলাই সে কার্য্যে অগ্রসর হইতেন ; যাহাতে আক্রান্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর না হয়, সেইজন্য আলিবর্দ্দী নগরের বাহিরে কোন গৃহে বা উদ্যানবাটিকায় গমন করিতেন।"

ইংরেজরা তাঁহাকে আপনাদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠীতে বা গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে চাহিতেন না। কারণ, তিনি যথেচ্ছা আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া দিতেন বা লইয়া যাইতেন।

সে সময় ইংরেজের সহিত ফরাসীর বিবাদ লাগিয়াই ছিল—বিশেষ এ দেশে বাণিজ্যব্যপদেশে পরস্পরের মধ্যে যে ঈর্ষ্যা ছিল, তাহাও সাধারণ নহে। যে পক্ষ নবাবের অনুগ্রহ ক্রয় করিতে পারিতেন, সেই পক্ষই বাণিজ্য বিষয়ে সুবিধা করিয়া লইতেন। আলিবর্দ্দীর উপর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলার অসাধারণ প্রভাব জানিয়া ফরাসীরা সিরাজদ্দৌলাকে তুষ্ট রাখিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতেন।

কার্য্যোদ্ধারের জন্য তৎকালে যুরোপীয়রা কিরূপ চেষ্টা করিতেন, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত আমরা পরে প্রদান করিতেছি।

সিরাজদ্দৌলার এইরূপ ব্যবহারের ফলে দেশের ধনী ও দরিদ্র সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং সকলেই তাঁহার দ্বারা বিপদের অনুষ্ঠানের আশঙ্কা করিতেন। তাঁহার উদ্ধত প্রকৃতি ও নিষ্ঠুর আচরণ আলিবর্দ্দীর আত্মীয়স্বজন ও কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। অপমানিত মীর জাফর দরবার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার নৈতিক হীনতা ও অর্থগৃধ্নুতা তাঁহার নিষ্ঠুরতারই মত প্রবল ছিল।

তিনি কিরূপে এ দেশের লোক ও বিদেশী বণিক সকলকেই শত্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহা কাশিমবাজারে ফরাসী কুঠীর কর্ত্তা ল কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণে পাওয়া যায় :

"যে সকল নবাব (বাঙ্গালায়) শাসনকার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত ধনী, সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার রাজত্বের

হিসাব দিল্লীতে দিতে হইত না। রাজস্ব ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ জন শাসক যে স্বর্ণ ও রৌপ্য, টাকা ও মণিমুক্তা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, সকলই তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি কেবলই আপনার ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। যদি কোন অসাধারণ ব্যয় করিতে হইত, তবে তিনি অমনই অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিতেন এবং কঠোরভাবে তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন। স্বয়ং কোন দিন অর্থের অভাব ভোগ না করায় তিনি মনে করিতেন, তাঁহারই মত সকল লোক অর্থশালী—বিশেষ য়ুরোপীয়-(বণিক্)দিগের অর্থের অন্ত নাই। এই বিশ্বাস তাঁহার য়ুরোপীয় বণিক্‌দিগের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহারের অন্যতম কারণ। বাস্তবিক তাঁহার ব্যবহার হইতে মনে হইত, তিনি সকলেরই সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চাহেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনকেও তিনি অব্যাহতি দিতেন না—তাঁহাদিগের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং আলিবর্দ্দী খাঁন তাঁহাদিগকে যে সকল পদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সে সকল পদ হইতে বিতাড়িত করা হয়। এইরূপ প্রকৃতির লোক কি কখন রাজ্য রক্ষা করিতে পারে?...এই অপদার্থ নবাবের শাসকোচিত কোন গুণই ছিল না। কেবল লোক তাঁহাকে ভয় করিত। তিনি স্বভাবতঃ কাপুরুষ ছিলেন। তিনি গদী পাইবার পর প্রথমে সেনাপতিদিগকে কিছু সম্ভ্রম দেখাইতেন বটে, কিন্তু (দিল্লীর বাদশাহ কর্ত্তৃক) তিনি বাঙ্গালার নবাব-নাজিম বলিয়া স্বীকৃত হইবার পর তিনি মনে করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার আর কোন প্রয়োজন নাই। প্রথমে তিনি কিছু উদারতার পরিচয়ও দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উদারতা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল; তাই তাহার স্থানে নিষ্ঠুরতা ও অর্থগৃধ্নুতা দেখা দিতে বিলম্ব হয় নাই। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, নবাব হইলে তিনি সংযম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন—তাঁহার ব্যবহারে তাঁহারাও তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিলেন।"

মুর্শিদাবাদে লোক তাঁহার উপর এমনই বিরক্ত হয় যে, পূর্ণিয়ার নবাব—তাঁহার খুল্লতাতপুত্র শৌকৎ জঙ্গ মনে করেন, সেই সুযোগে তিনি বাঙ্গালার গদী লাভ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। তিনি সেই চেষ্টা করিলেন। যে সময় মীর জাফর প্রভৃতি সেনাপতিরা শৌকৎ জঙ্গের পক্ষাবলম্বন করিতেছিলেন, সেই সময় পাটনার নবাব রামনারায়ণ সিরাজদ্দৌলার পক্ষাবলম্বন করিতে আগমন করেন। যখন মীর জাফর প্রভৃতি কি করিবেন, চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় শৌকৎ জঙ্গ অবিমৃষ্য-কারিতার পরিচয় দিয়া নবাবের সেনাদলকে আক্রমণ করেন। তিনি নিহত

হয়েন। ইহাতে অনেকে মনে করেন—সিরাজদ্দৌলার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তিনিও তাহাই মনে করিয়া অনায়াসে সর্ব্ববিধ অনাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন—"Sure of the good fortune which protected him, he abandoned himself more than ever to those passions which urged him to the commission of every imaginable form of violence."

কাশিমবাজারের ডাচ ও ফরাসী ব্যবসায়ীদিগের লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। নবাবের ভাব দেখিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীরাও কেবলই অর্থলাভের চেষ্টা ও তাঁহাদিগকে অপমান করিতে লাগিল। কুঠীর বাহিরে যাইলেই তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত হইতে হইত।

তখন সকলেই ইংরেজরা কি করে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন কিন্তু ইংরেজরা মাদ্রাজ হইতে সাহায্যের প্রতীক্ষায় ফলতায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইংরেজরা যে মুর্শিদাবাদে বিপ্লব করাইবার চেষ্টায় ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সুবিধা পাইতেছিল না। তাহার কারণনির্দ্দেশে ল যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যায়:

"বাঙ্গালায় হিন্দুদিগের মধ্যে মহাজন ও ব্যবসায়ীরাই সর্ব্বাপেক্ষা সকল সংবাদ অধিক অবগত ছিলেন। কারণ, ব্যবসাব্যপদেশে তাঁহাদিগকে নানাস্থানে যে পত্র-ব্যবহার করিতে হইত, তাহাতেই তাঁহারা সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। জগৎশেঠ-পরিবার ইচ্ছা করিলে ইংরেজদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারিতেন; কারণ ইঁহারা কেবল যে সব সংবাদ রাখিতেন, তাহাই নহে, পরন্তু সিরাজদ্দৌলার প্রতি তাঁহাদিগের বিরূপ হইবার একাধিক কারণও ছিল। আলিবর্দ্দী খাঁনের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পরিবার বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন; ইঁহারাই তাঁহার টাকার লেন-দেনের কাজ করিতেন এবং এমন কথাও বলা যায় যে, ইঁহারাই বাঙ্গালায় পূর্ব্ববর্ত্তী বিপ্লবসমূহের প্রধান কারণ ছিলেন। কিন্তু এখন অবস্থার অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হয়। বিবেচনাহীন সিরাজদ্দৌলা মনে করিতেন, তাঁহার মহাজনদিগের সাহায্যের কোন প্রয়োজন হইতে পারে না এবং তাঁহার তাঁহাদিগকে ভয় করিবারও কোন কারণ থাকিতে পারে না। সেইজন্য তিনি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শিষ্টাচার অবলম্বন করিতেন না। তিনি তাঁহাদিগের অর্থ হস্তগত করিতে চাহিতেন এবং সকলেই মনে করিত, একদিন তিনি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবেন। * * জগৎশেঠরা ইচ্ছা করিলে আপনারাই দল গঠিত করিয়া—য়ুরোপীয়

দিগের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই—অন্য কোন ব্যক্তিকে গদীতে বসাইতে পারিতেন। তবে সে কাজ সময়সাধ্য হইত।......বিশেষ হিন্দুরা সহসা কোন অনিশ্চিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। কাজেই তাঁহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে ইংরেজদিগের পক্ষে প্রথমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কিছু সাফল্য-লাভ করা প্রয়োজন ছিল। সিরাজদ্দৌলা যে সব কঠোর সর্ত্ত করিতেছিলেন, সে সকলেই সম্মত না হইলে ইংরেজের পক্ষে তাঁহার সহিত মীমাংসা করাও সম্ভব ছিল না। নবাব য়ুরোপীয়দিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং বলিতেন, য়ুরোপীয়-দিগকে শাসন করিবার জন্য পাদুকা প্রয়োজন—অর্থাৎ তাহাদিগকে জুতা মারিয়া শায়েস্তা রাখিতে হয়।"

ব্যবসার সুবিধার জন্য—অর্থার্জ্জনের জন্য য়ুরোপীয় জাতিরা এইরূপ অপমান সহ্য করিতেও প্রস্তুত ছিল। তাহারা প্রাচ্যের নানা দেশের নৃপতিদিগকে, এমন কি তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীদিগকেও, তুষ্ট রাখিতে যে চেষ্টা করিত, তাহা বিস্ময়কর। আমরা সেইরূপ ব্যবহারের দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(১) সুমাত্রার রাজা ইংরেজ-দুহিতালাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ব্যবসার সুবিধার জন্য ইংরেজ তাহাতেও সম্মত হইয়াছিল। ইংরেজের ঐতিহাসিক গ্রন্থে দেখা যায়, ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগের সভায় কোন "সম্ভ্রান্ত ভদ্রপরিবারের লোক" প্রস্তাব করেন, সঙ্গীতে ও সূচীকার্য্যে নিপুণা তাঁহার সুন্দরী দুহিতাকে তিনি সুমাত্রার রাজার শয্যাসঙ্গিনী হইবার জন্য দিতে প্রস্তুত। তাহাতে কোম্পানীর কিরূপ সুবিধা হইতে পারে, সে বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয় এবং সেরূপ কার্য্য যে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নহে, তাহাও বাইবেলের প্রমাণে দেখান হয়। কেহ কেহ আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ঐ কন্যাটি রাজার অধিক আদরিণী হইলে তাঁহার অন্য স্ত্রীরা তাহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিতে পারে। পিতা সে বিপদসম্ভাবনা অবহেলা করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

(২) বাঙ্গালায় বাণিজ্যের ছাড়লাভের চেষ্টায় কয়জন ইংরেজ মাদ্রাজ মসলী-পট্টনের কুঠী হইতে বাহির হইয়া ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল উড়িষ্যায় হরিশপুরে উপনীত হইয়া নৌকা নোঙ্গর করে। তাহারা কটকে উড়িষ্যায় বাঙ্গালার নবাব-নাজিমের নায়েবের দরবারে উপনীত হইলে নায়েব তাঁহার চরণ পাদুকামুক্ত করিয়া মিষ্টার কার্টরাইটকে তাহা চুম্বন করিতে দেন এবং কার্টরাইট সেই চরণ চুম্বন করেন। সেই কার্য্যের পুরস্কারে ৫ই মে ইংরেজ বণিকরা উড়িষ্যার যে কোন বন্দরে বিনা

মাশুলে ব্যবসা করিবার, জাহাজ সংস্কারের এবং জমি কিনিবার ও সেই জমিতে গৃহনির্ম্মাণের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

এইরূপ কারণে য়ুরোপীয় বণিক্‌রা লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইত না। তাহারা অর্থলোভে আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধ করিত এবং সেই সকল যুদ্ধে যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বর্ব্বরতাদ্যোতক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সকল বিবাদে ও যুদ্ধে শেষে ইংরেজ জয়ী হয় এবং পলাশীতে ইংরেজের জয়ে কেবল যে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আরম্ভ হয়, তাহাই নহে—যে অর্থ বিলাতে যায়, তাহাই ইংরেজের শিল্পে প্রাধান্যলাভের কারণ। ডীন ইঞ্জে সে সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই ইংরেজ বণিক্‌রা বাহুবলে কখনই সিরাজদ্দৌলার ধ্বংসের উপায় করিতে পারিত না।

সিরাজদ্দৌলা আপনার দোষে সকলকে শত্রু করিয়াছিলেন। তিনি গদী পাইয়া প্রথমেই ঘেসেটী বেগমের ধনরত্নাদি লুণ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। 'মুতাক্ষরীণ' লেখক লিখিয়াছেন :

"মতিঝিল (ঘেসেটী বেগমের বাসগৃহ) আক্রমণের পর রাজ-দরবারে নানারূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। মীরজাফর খাঁন এত দিন সেনাদলের দেওয়ান-ই-তন বা সৈন্য-পরিষদের প্রধান সদস্য ছিলেন। তাঁহার স্থানে নূতন লোক মীর মদনকে নিযুক্ত করা হইল। এই ব্যক্তিকে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) হইতে আনান হয়—তথায় ইনি হুসেনুদ্দীনের অনুচর ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার নিজ সম্পত্তির দাওয়ান মোহনলাল প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান দাওয়ানের পদে উন্নীত হইলেন। শাসনের সকল বিভাগে তাঁহার অবাধ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহাকে 'মহারাজা' উপাধি ও সঙ্গে সঙ্গে নক্‌ড়া, ঝালরদার পাল্কী ও পাঁচ হাজারী মন্‌-সবদারীও প্রদত্ত হইল। এই মোহনলালকে এত অধিক বিশ্বাসভাজন ও ক্ষমতাশালী করা হইল যে, যে প্রবীণ কর্ম্মচারী ও সেনাপতিরা তাঁহার লাম্পট্য, কুবাক্য ও নিষ্ঠুরতা হেতু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, এই নবাগত কর্ম্মচারীদ্বয়ের—বিশেষ দম্ভী মোহনলালের ব্যবহারে তাঁহাদিগের অসন্তোষের আর সীমা রহিল না সকলেই এই অযোগ্য শাসকের শাসন হইতে অব্যাহতি-লাভের বলবতী বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। সহসা উচ্চপদে উন্নীত উচ্ছৃঙ্খল কতিপয় যুবক ব্যতীত আর কেহই নবাবের পক্ষাবলম্বী রহিল না। রাজধানীর প্রধান ব্যক্তিরা

সকলেই এইরূপ লোককে শাসক হইতে দেখিয়া ছলে, বলে বা ষড়যন্ত্রে—যে কোন উপায়ে তাঁহার নিপাত কামনা করিতে লাগিলেন।"

একদিকে এই অবস্থা, অপর দিকে ইংরেজের সহিত সন্ধি-স্থাপনে তাঁহার দৌর্ব্বল্যের পরিচয় তাঁহার শত্রুপক্ষের মনে কার্য্যসিদ্ধির জন্য সাহস ও আশা আনিয়া দিল।

হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান সকলেই তাঁহার কুব্যবহারে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার সেনাপতি মুসলমান মীরজাফরও ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন, তখন সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ ঘটিতে আর বিলম্ব হইল না।

সিরাজদ্দৌলার মত অযোগ্য, নৃশংস ও চরিত্রহীন শাসক যে কখনও শাসিত-দিগের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে পারেন না, তাহা বলা বাহুল্য তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়, তাহাও মুসলমানের আধিপত্যের উচ্ছেদসাধন করিয়া হিন্দুর প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। পরন্তু দেখা যায়, তখন মুসলমানদিগকে এ দেশের হিন্দুরাও স্বদেশী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। নবীনচন্দ্র মহারাণী ভবানীর উক্তি বলিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই তখন বাঙ্গালায় জনসাধারণের অভিমত :

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি ; তবু ভেদ আকাশ-পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতাজিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।"

বাস্তবিক তখন বাঙ্গালার মুসলমান শাসকরাও বর্ত্তমানকালের পুঁটি মহম্মদ ও বকাউল্লার মত মুসলমান ধর্ম্মে গৃহীত বা ঐ ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য হিন্দুর বংশধরগণের মত ইরাক, ইরাণ, তুরাণের দিকে চাহিয়া লোকের হাস্যোদ্দীপন করিতেন না। 'রিয়াজ'-লেখক লিখিয়াছেন, ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উশ্‌শান ঢাকায় শাসক হইয়া আসিয়া হিন্দুদিগের সহিত "হোলা" খেলিয়া পিতামহের দ্বারা তিরস্কৃত

হইয়াছিলেন। আমরা বাঙ্গালার কথাই বলিতেছি, নহিলে বলিতে পারিতাম—বাদশাহরা হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারে অর্থ সাহায্য করিতেন। মীরজাফর খাঁন রোগাক্রান্ত হইয়া কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত ভক্তিভরে পান করিয়াছিলেন। সুজাউদ্দীন, সরফরাজ, আলীবর্দ্দী খাঁন—কেহই হিন্দুর দেবস্থান কলুষিত করেন নাই।

"অন্তরে—ইংরাজেরা নব পরিচিত ;
ইহাদের রীতি নীতি আচার-বিচার
অনুমাত্র নাহি জানি।"

কাজেই সিরাজদ্দৌলার উৎপীড়নে উৎপীড়িত না হইলে বাঙ্গালার হিন্দু প্রজারা কখনই তাঁহার শত্রু হইত না। আর তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান্ হইবার দুরাশায় আলীবর্দ্দী যেমন প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই, তেমনই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন সেই মীরজাফর খাঁন মুসলমান ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার পতনে আলিবর্দ্দীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল—ইহাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। যে সিরাজদ্দৌলার নিষ্ঠুর আচরণে হিংস্র জন্তুর ভাব প্রকাশ পাইত, মীরণ তাঁহাকেই ঘাতকের দ্বারা হত্যা করায় এবং যে আমিনা বেগম লালসা-কলুষিত জীবনে কখন অনুতাপের গ্লানি মনে স্থান দেন নাই, তিনিই অন্তঃপুর হইতে যাইয়া পুত্রের খণ্ডিত দেহ বক্ষে লইয়া আর্ত্তনাদ করিলে মীরণের ভৃত্যগণ তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন মুসলমান শাসকরা যেমন হিন্দুর ধর্ম্মাচরণে হস্তক্ষেপ করিতেন না—মসজেদের সম্মুখে রাজপথে হিন্দুর বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিতেন না, তেমনই হিন্দুরাও মনে করিত, মুসলমানগণ তাহাদিগের স্বদেশী। তাই সিরাজের পরাভব উপলক্ষ করিয়া নবীনচন্দ্র তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে হিন্দুর মুখে যে উক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য—

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
ভারতে আসিবে চির আঁধার-রজনী।
অধীনতা-অন্ধকারে চিরদিন তরে
ডুবায়ে ভারতভূমি যেও না তপন !

উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া আহা! ডুবিছ এখন!
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ-আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ-পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল যেমন!"

সিরাজদ্দৌলার রক্তপাতে—"বঙ্গ-স্বাধীনতা শেষ আশা বিসর্জ্জন।"

সিরাজদ্দৌলার সহিত তিনি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেজন্য মীরজাফর হিন্দুদিগের নিকট নিন্দিত ছিলেন।

আলিবর্দ্দী যে পাপ করিয়া গদী লাভ করিয়াছিলেন, মীরজাফরও সেই পাপে পাপী। কেবল আলিবর্দ্দী নিজ ভুজবলে সরফরাজকে নিহত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার নবাব-নাজীম হইয়াছিলেন—মীরজাফরের সে ক্ষমতাও ছিল না—তিনি বিদেশী বণিক্‌দিগের সহায়তায় আপনাকে গদীর অধিকারী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। উভয়েই বিশ্বাসঘাতক—উভয়েই স্বার্থসিদ্ধির জন্য মনুষ্যত্ব অবজ্ঞাকারী। মীরজাফরকে যে মূল্যে গদীতে বসিবার অধিকার ক্রয় করিতে হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। তিনি সঞ্চিত ধনরত্ন বিদেশীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদে বসিয়াছিলেন—কাজেই মসনদ রক্ষা করিতেও পারেন নাই। তিনি ইংরেজের হস্তে খেলিবার পুত্তলি হইয়া বাঙ্গলার নবাবী করিয়াছিলেন। প্রজার দিকে তিনি চাহেন নাই—দৃষ্টি দিবার সুযোগও তাঁহার ছিল না। তিনি এই অবস্থায় দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হইয়া—বোধ হয়, আপনার অবস্থা ভুলিয়া থাকিবার জন্যই অহিফেন সেবন করিতেন।

যিনি বৃটিশ শাসনে ভারতের ঐতিহাসিক বলিয়া ইংরেজ সমাজে সমাদৃত, সেই সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার লিখিয়াছেন:—

"মীরজাফরকে গদী প্রদানের জন্য প্রভূত অর্থ মূল্যরূপে, আদায় করা (exacted) হইয়াছিল। কোম্পানী ক্ষতিপূরণ বাবদে ১ কোটি টাকা দাবী করেন। কলিকাতার ইংরেজ, হিন্দু ও আর্ম্মাণী অধিবাসীদিগের জন্য যথাক্রমে ৫০ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাকা দাবী করা হয়। নৌবহরের ও সেনাবলের জন্য দাবী ২৫ লক্ষ হিসাবে ৫০ লক্ষ। কাউন্সিলের সদস্যগণ নিম্নলিখিতরূপে টাকা পাইয়াছিলেন:—

ড্রেক	... ২৮০,০০০ টাকা
ক্লাইব	... ২৮০,০০০ "

বেকার, ওয়াটস ও কিল্
প্যাট্রিক—প্রত্যেকে ··· ২৪০০০০ টাকা
ক্লাইব (সেনাপতিরূপে) ··· ২০০০০০ „
ঐ (ব্যক্তিগত দানরূপে) ··· ১৬০০০০০ „

কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরাও ইহা ব্যতীত আবার অর্থ লাভ করেন; একা ওয়াট্সনই ৮ লক্ষ টাকা পায়েন। বৃটিশের মোট দাবী—৪ কোটি ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ২ শত ৫০ টাকা। ভারতের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে ইংরেজের অতিরঞ্জিত ভ্রান্ত ধারণা ছিল। কিন্তু টাকা না থাকায় দাবীর অর্দ্ধাংশ লইয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হয়—তাহারও এক-তৃতীয়াংশ মণি-মুক্তা ও তৈজসে লইতে হইয়াছিল।"

ইহা ব্যতীত কোম্পানীকে ২৪ পরগণা জমিদারী দিতে হয়। আমরা সে সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা করিব না।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ লাভজনক বুঝিয়া মীরজাফরকে মসনদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে নবাব করেন।

"On this occasion besides private donations, the English received a grant of the three districts of Burdwan, Midnapur and Chittagong, estimated to yield a net revenue of half a million sterling a year."

কিন্তু মিরকাশিম ইংরেজের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে সম্মত হইলেন না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সকলেই বিনা শুল্কে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিল, তাহাদিগের অত্যাচারে দেশের লোক নদীকূলবর্ত্তী স্থানগুলি ত্যাগ করিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। শেষে মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ হইল এবং তিনি পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলে ইংরেজ আবার মীরজাফরকে নবাব করিয়া অর্থলাভ করিলেন।

"The English Council in Calcutta had thus twice found the profitable opportunity which they loved, of creating a new Nawab of Bengal, and of receiving the donations and large sums of money distributed to them by each of the Nawabs on his accession."

মীরজাফরই বাঙ্গালার নবাবের ধনাগার নিঃশেষ করিয়া—বাঙ্গালায় তথা ভারতে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করিয়া জরাজীর্ণ দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার পরও কিছুদিন ইংরেজ মুর্শিদাবাদে নবাব রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না—"A puppet Nawab was still maintained at Mursidabad, who received an annual allowance."

মীরজাফরের সময় হইতে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহারই ফলে দুর্ভিক্ষ। সেই দুর্ভিক্ষ লইয়া 'আনন্দমঠের' আখ্যানবস্তু রচিত হয়।

কেবল এই কথা মনে রাখিলেই স্বীকার করিতে হয়, 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কিছু লিখেন নাই—যাহা ঐতিহাসিক সত্য, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কোন কোন লেখকের মত ভয়ে বা অর্থলোভে সত্য গোপন করেন নাই। ইহা বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাটের উপযুক্ত কার্য্যই বলিতে হইবে। ইহাও যাহারা বুঝে না, তাহারা হয় বুঝিবার যোগ্যতাহীন, নহেত বিদ্বেষবিকৃতবুদ্ধি।

মীরজাফরের সময় যে সর্ব্বনাশ আরম্ভ হয়, তাহাই তাঁহার পরবর্ত্তী ইংরেজ শাসকদিগের সময় শেষ হয়—সেই শেষ মন্বন্তরে। তখনও ইংরেজ "শিখণ্ডী সম্মুখে করি" কাজ করার মত নবাবকে সম্মুখে রাখিয়া শোষণ কার্য্য করিতেছিল—তাহাদিগের দায়িত্ব অস্বীকার করিবার উপায়ও ছিল। তাহারাই মুসলমান রেজা খাঁ'র হস্তে কর্ম্মভার অর্পণ করে এবং সেই নর-পিশাচ রাজস্বের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া ইংরেজ প্রভুদিগের তুষ্টি-সাধনের ও আপনার ধনার্জ্জনের উপায় করে।

"The Nazims exacted what they could from the Zemindars and the great farmers of revenues, whom they left at liberty to plunder all below, reserving to themselves the prerogative of plundering them in their turn when they were supposed to have enriched themselves with the spoils of the country. The mutsuddis, who stood between the Nazim and the Zemindars or between them and the people, had each their respective shares of the public wealth."

যে দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল, তাহার প্রকোপেও যে রাজস্ব হ্রাস হয় নাই সে কেবল উৎপীড়নের—অত্যাচারের ফলে। বাঙ্গালার প্রজাকে সে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল—অনেকে মরিয়া যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। রেজা খাঁ ও তাহার মুসলমান ও ইংরেজ প্রভুরা বাঙ্গালা কি ভাবে শোষণ করিয়াছিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

বাঙ্গালায় যে ব্যাপক বিদ্রোহ হয় নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয় এবং তাহাই বাঙ্গালীর ধৈর্য্যের পরিচায়ক।

পরিশিষ্ট

(৪)

বঙ্কিমচন্দ্র *

চুঁচুড়ার সাহিত্যিকরা যখন আমাকে বঙ্কিম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিতে আহ্বান করিলেন, তখন তাঁহাদিগের সেই আহ্বান আমি কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। সত্য বটে, গত ৪৪ বৎসরকাল আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে, সংবাদ-পত্রে ও পুস্তকে এত কথা লিখিয়াছি যে, সহজে মনে হইতে পারে, নূতন লিখিবার বা বলিবার আর কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বৈচিত্র্যে, ভাবমাধুর্য্যে, গভীরতায় ও বিস্তারে কামরূপ সমুদ্রেরই সহিত তুলনীয়। সমুদ্র যেমন যত বারই কেন দেখা যাউক না, তাহা দেখিয়া শেষ করিয়াছি বলা যায় না, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার তেমনই যতই আলোচনা করি না কেন, মনে হয়—আলোচনার উপকরণ ভাণ্ডার শেষ হয় নাই। তাহার পর যখন মিণ্টনের সম্বন্ধে সমালোচক বিরেলের কথা মনে পড়িল, তখন চুঁচুড়ার আহ্বান—চুঁচুড়ার সাহিত্যিকদিগের আহ্বান অপেক্ষাও অধিক আকর্ষণে আমাকে আকৃষ্ট করিল। মিণ্টন লণ্ডন নগরের বহু স্থানে বাস করিয়াছিলেন—ইংরেজরা সে সকলের সমুচিত সন্ধান রাখেন না, অথচ ইংরেজ মহিলারা ফ্লোরেন্সে যাইয়া "জর্জ্জ ইলিয়টের" মানস কন্যা রোমোলা কোথায় বাস করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান করেন—ইহাতে বিরেল দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিণ্টন লণ্ডনে কোন্ কোন্ স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বিরেল লিখিয়াছিলেন :

"These are not vain repetitions if they serve to remind a single reader how all the enchantments of association lie about him. English women have been found searching about Florence for the street where George Eliot represents Romola as having lived, who have admitted never having been to Jewin Street, where the author of 'Lycidas' and 'Paradise Lost' did in fact live." —'Obiter Dicta'

চুঁচুড়ার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের এত স্মৃতি—এত সাহিত্যিক স্মৃতি বিজড়িত যে, বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যদিগের পক্ষে গুরুর এই সাময়িক কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলে বায়রণের

* হুগলী জিলা বঙ্কিমশতবার্ষিকী উৎসবে সভাপতির ভাষণ (১৬ই আষাঢ় ১৩৪৬)

সেই কথাই মনে পড়িবে—" 'Tis haunted holy ground." দিল্লী ও আগ্রা প্রভৃতি দেখিলে যেমন মনে হয়, আমরা সাম্রাজ্যের ধূলির উপর চরণক্ষেপ করিতেছি, তেমনই চুঁচুড়ার কথায় মনে হয়—এ ভূমি পবিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত চুঁচুড়ার সম্বন্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহার সহিত তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যিকদিগের বিষয় স্মরণ করিলে মনে হইবে, তখন চুঁচুড়ায় সাহিত্যিক পরিবেষ্টন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই পরিবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া তাহা আরও উজ্জ্বল করেন—তিনি সেই মণ্ডলের কেন্দ্র হয়েন।

চুঁচুড়ায় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাস ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন :

"চুঁচুড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান,
হৃদয় ক্ষীরের খনি —আকারে পাঠান।
হাসারঙা খাসা বুড়ো মাথা জ্ঞান-গুড়ে,
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।
ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী-শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চুড়ে।
তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।

সে কেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল।"

এই চুঁচুড়ায় গঙ্গাচরণ সরকার বাসস্থান রচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গাচরণবাবুর সাহিত্যিক খ্যাতি যেমনই কেন হউক না, তাঁহার সাহিত্যরসিক-খ্যাতি তাঁহার নাম স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়াছে। তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্য-বিষয়ক যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের ও সাহিত্যসমালোচকের গুণ প্রকাশ পায়।

গঙ্গাচরণ বাবুর পরেই তাঁহার পুত্র অক্ষয়চন্দ্রের উল্লেখ করিব। আমি তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়াছি—তাঁহার প্রশংসা আমাকে সাহিত্য-সেবায় উৎসাহিত করিয়াছে। তিনি আমার সম্পাদিত 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রবন্ধের পাদটীকায় ভাষা সম্বন্ধে আমার সহিত তাঁহার মতভেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ফোয়ারার' সমালোচনা করিতে যাইয়া তিনি ইচ্ছা করিয়া ললিত বাবুকে

"গুণবন্ত পুরুষ" বলিয়া—টীকায় লিখিয়াছিলেন—"সম্পাদক, আমার ত্রুটি মার্জনা করিবেন,—আমি 'স্বচক্ষুঃতে' লিখিতে পারিব না। 'গুণবৎ' পুরুষও লিখিতে পারিব না।" এই অক্ষয়চন্দ্রের রচনা বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে তাঁহার 'দপ্তরে' গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজ আমি আর এক জনের নামোল্লেখ করিব—তিনি দীননাথ ধর। তিনি রসের রচনায় চুঁচুড়া মুখর করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—আর কার্য্যব্যপদেশে সাহিত্যিক পরিবেষ্টনপূত চুঁচুড়ায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ায় আজ আর সেরূপ কোন বঙ্গবিশ্রুতকীর্ত্তি সাহিত্যিক হয়ত নাই—কিন্তু চুঁচুড়া এক কালে যে সব সাহিত্যিকের সাহিত্যসেবার কেন্দ্র ছিল, তাঁহাদিগের স্মৃতি ও তাঁহাদিগের সৃষ্টি অমর। তাই ভেনিসে যাইয়া বায়রণ যাহা লিখিয়াছিলেন, চুঁচুড়ার সম্বন্ধে আমরা সেইরূপ বলিতে পারি—

"But unto us she hath a spell beyond
Her name in story, and her long array
Of mighty shadows, whose dim forms despond
Above the dogeless city's vanished sway;
Ours is a trophy which will not decay
With the Rialto; Shylock and the Moor
And Pierre, cannot be swept or worn away—
The keystones of the arch! though all were o'er,
For us repeopled were the solitary shore."

"বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গে" শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন, ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে রথযাত্রার দিন তিনি চুঁচুড়ায় প্রথম বঙ্কিমতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহার সহগামী ছিলেন—অতুলকৃষ্ণ রায় এবং সেই দিনই চন্দ্রশেখর করও বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

এই চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত হইলে কোন রচনা বাঙ্গালীর চিত্ত জয় করিতে পারে না। সেই উপলব্ধির কথা তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের উপক্রমণিকায় লিখিয়া গিয়াছেন:—

"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষকাল—

প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্র-গামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদী-বক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্র-রশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তিসাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস-ভবভূতিও অনেক দূরে।

"মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

'সাধো আছে, মা, মনে
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।'

"তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

বাঙ্গালীর মনের আশা কি, তাহাও তিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার দুঃখে তাঁহার যে বেদনা তাহা তিনি নানা স্থানে নানারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশ মা। তিনি কি ছিলেন? ধনধান্যে, স্বাস্থ্যসম্পদে পূর্ণ এই বঙ্গদেশ বীর-প্রসবিনী ছিলেন। বাঙ্গালী অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া বাস করিত—আত্ম-রক্ষার ক্ষমতাও তাহার ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও বন্ধু দীনবন্ধু তৎকালীন বাঙ্গালী গৃহস্থের অবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য :

"স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমাজমি করে গিয়েছেন, তাতে কখনও পরের চাকরী স্বীকার কর্ত্তে হয় নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সংবৎসরের খোরাক হয়, অতিথি-সেবা চলে—আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া যাট সত্তর টাকায় বিক্রি হয়।** কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ।"

স্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহিত করিবার এমন সুন্দর ও মধুর ব্যবস্থা সচরাচর দেখা যায় না।

ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা পর্য্যটক বার্ণিয়ারের বর্ণনায় আমরা বুঝিতে পারি। সে ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের কথা। তিনি বলিয়াছেন, যুগে যুগে মিশরকে সৌন্দর্য্যে ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ বলা হয়; কিন্তু বাঙ্গালায় তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালাকে মিশর অপেক্ষা উচ্চ স্থান দিতে হয়। বাঙ্গালা হইতে কেবল অন্যান্য প্রদেশে নহে, পরন্তু সিংহলাদি বিদেশেও চাউল রপ্তানী হয়; বাঙ্গালার চিনি আরবে, ইরাকে ও পারস্যেও রপ্তানী হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় এত কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হয় যে, ইহা কেবল মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান বস্ত্রোৎপাদনকারী প্রদেশ নহে—পরন্তু ওলন্দাজ, ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজরা এই সব বস্ত্র বিদেশে রপ্তানীর ব্যবসা করিয়া থাকে। বাঙ্গালার উর্ব্বরতাহেতু একটি প্রবাদবাক্য বিদেশীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে—বাঙ্গালায় অনেকেই আইসে, কিন্তু আসিলে আর কেহই যাইতে চাহে না ("Bengal has a hundred gates open for entrance, but not one for departure.")।

পাঠান শাসনে বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার বিষয় ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"হোসেন শাহের রাজ্যারম্ভ-সময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও তৎকালীন বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য, শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন এ দেশে স্থাপত্য বিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল।*** দেশে অনেক ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল। পাঠান রাজ্য ধ্বংসের কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত আইন আকবরীতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদাররা ২৩,৩০০ অশ্বারোহী ৮০১,১৫৯ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ জন কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।"

এই অবস্থায় বাঙ্গালীর মনীষার স্ফূর্ত্তি হওয়া স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন:

"পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত; এই

সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক—ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়েই স্মার্ত্ততিলক রঘুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী; চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ইঁহাদিগের সকলের আবির্ভাব।"

ইহারও পূর্ব্বে বাঙ্গালী সমুদ্রতরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া যবাদি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং হিমগিরি অতিক্রম করিয়া তিব্বতে ও চীনে স্বীয় সভ্যতা ও শিল্প ব্যাপ্ত করিয়াছিল। বাঙ্গালী এক দিকে বারাণসীতে ও গঙ্গাযমুনার সঙ্গমক্ষেত্র প্রয়াগে, অপর দিকে উড়িষ্যার তালীবনশ্যামজলধিকূলে তাহার জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিল—বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৮১৫ অব্দে বা প্রায় সেই সময়ে বাঙ্গালার প্রকৃতিপুঞ্জ মাৎস্যন্যায় হইতে অব্যাহতিলাভকল্পে গোপালকে তাহাদিগের রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া যে গণ-তান্ত্রিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা গৌতম-বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থা হইতে অবগত হইতে পারি। কারণ, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে বাঙ্গালায় নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে প্রজাতন্ত্রশাসন প্রবর্ত্তিত ছিল।

বাঙ্গালার নারীরাও ধর্ম্মে ও কর্ম্মে অসাধারণ নিষ্ঠা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। বিষ্ণুপুরের রাজা যখন যবনীর মোহে মুগ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগের আয়োজন করেন এবং প্রজারঞ্জনে শিথিলপ্রযত্ন হয়েন তখন তাঁহার ধর্ম্মপত্নী পট্টমহারাণী তাঁহার হত্যার সহায় হইয়া পতির চিতায় সহমৃতা হইয়াছিলেন।

এই যে বাঙ্গালা—ইহাই মা যাহা ছিলেন। তখন মা'র সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। "ইনি কুঞ্জর-কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।"

কিন্তু তাহার পর? তাহার পর মা যাহা হইয়াছেন।—"কালী—অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিকাময়ী; হৃতসর্ব্বস্ব, সেইজন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!"

বঙ্কিমচন্দ্রের চক্ষু হইতে দরদর ধারা পড়িয়াছে। তিনি সেই শশ্মানে বসিয়া বাঙ্গালার জন্য রোদন করিয়াছিলেন:

"আমার এই বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি আছে,—নিদর্শন কই? দেবপালদেব,

লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখ চিহ্নও গিয়াছে।*** চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে—নবদ্বীপ। *** বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান ভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী নদী তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে বঙ্গলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, যবদ্বীপ, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সেই ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে যবনভয়ে ভীতা সেই বঙ্গলক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন।"

যেদিন বঙ্গলক্ষ্মী—বাঙ্গালার স্বরাজ-সাম্রাজ্ঞী অন্তর্হিতা হইলেন, সেদিন কি বিষম দিন!—

"সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল, নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্য বীথিকার দীপমালা নিভিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিত অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল।"

তাহার পর? তাহার পর—

"গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল;—আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদী, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। *** আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া

রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ জলে—ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে।"

কিন্তু মা জলতলে ডুবিয়া আছেন—বিলীন হয়েন নাই। তাই আশা—বাঙ্গালীর আশা—বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস, তিনি আবার আসিবেন। তাঁহাকে আনিতে হইবে। কেবল "কই আমার মা। ** এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি" বলিয়া কাঁদিলেই তিনি আসিবেন না—তাঁহাকে পাইব না। তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাঁহার নিকট বরাভয় চাহিতে হইবে:

"এস, মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নব দর্পে-দর্পিণি,—এস মা! গৃহে এস—ছয় কোটি সন্তান একত্রে, এককালে দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, 'মা' প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি, নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্র-ভালিকে!' ডাকিব,—'সিন্ধুসেবিতে', সিন্ধুপূজিতে, সিন্ধুমথনকারিণি, শত্রুবধে দশভূজে দশপ্রহরণধারিণি; অনন্তশ্রী, অনন্তকালস্থায়িনি, শক্তি দাও সন্তানে—অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি।"

মা অবলা নহেন—তিনি অনন্ত-শক্তিশালিনী। তিনিই সন্তানের বাহুতে ও মনে বল দিবেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে ডাকিয়াছিলেন:

"এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশকোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেচে, নিভিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

"—How can man die better,
Than facing fearful odds.
For the ashes of his fathers
And the temples of his gods?"

এই মা—জননী জন্মভূমি—মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। এই বাঙ্গালা। মা আবার এই রূপে সন্তানকে দেখা দিয়া ধন্য করিবেন। মা'র বর্ণনা—

"রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত ; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রু নিষ্পীড়নে নিযুক্ত। ** দিগ্ভুজা, নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

মা'র এই রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেশবাসীকে দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগপুণ্যে—সাধনায় আমাদিগের দেশাত্মবোধের সাধনা সিদ্ধিপথ পাইয়াছে। তাই অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার এই কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াছেন—এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি। তিনি বলিয়াছেন, মাতৃভূমির মনীষীপ্রসূত ধারণায় প্রেরণার অভাব—মুক্তিলাভের প্রয়োজনের স্বীকৃতিতেও তাহা হয় না। তাই অনেকে সে প্রয়োজন স্বীকার করিলেও তাহার জন্য ত্যাগ-স্বীকারে সম্মত হয়েন না। কিন্তু মা যখন দেবীর মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়েন, তখন সব দ্বিধা, সব ভয়—দূর হয়, মানুষ মা'র সেবা করিতে অগ্রসর হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রকে মা কৃপা করিয়া দর্শন দিয়া সেই কর্ত্তব্যভার দিয়াছিলেন। তাই তাঁহার ৩২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত মন্ত্র সহসা সুপ্ত জাতিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল—ভগীরথের সাধনায় ধরাধামে অবতীর্ণা জাহ্নবীর পূতসলিলস্পর্শে যেমন সগর-সন্তানগণের উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল, জাতি তেমনই জড়ত্বশাপমুক্ত হইয়া মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।—

"The 'Mantra' had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of partriotism. The Mother had revealed hereself. Once that vision has come to a people there can be no rest, no peace, no farther slumber till the temple has been made ready, the image installed and the sacrifice offered."

"বন্দে মাতরম্" সেই মহামন্ত্র। 'আনন্দমঠ' তাহার ব্যাখ্যা।

আজ যখন কোন কোন লোক, কোন কোন বাঙ্গালীও 'আনন্দমঠে'র ছিদ্রান্বেষণ করিতেছেন এবং "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রেও আপত্তি করিতেছেন, তখন ১৩১৩ বঙ্গাব্দের কথা আমাদিগের স্মৃতিতে সমুদিত হয়। তখন একজন বাঙ্গালী—হায়দ্রাবাদের 'ডেকান টাইমসের' সম্পাদক সিদ্ধমোহন মিত্র বিলাতের 'টাইমসের' স্তম্ভে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইলবার্টবিলের আন্দোলনকালে

'আনন্দমঠ' রচিত হয় এবং "বন্দে মাতরম্" ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত 'মার্সেলজের'ই বাঙ্গালা সংস্করণ। স্বাধীনতাপ্রিয় ও গণতন্ত্রশাসনপ্রয়াসী ফরাসী যুবকগণকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্যই 'মার্সেলজ' গীত রচিত হয়। উহাতে কতিপয় উত্তেজনাপূর্ণ শব্দ যোজনা করিয়া—লোক মাতাইবার চেষ্টা, সহজবোধ্য দেশপরিচিত কতকগুলি ভাবের বিন্যাস ছিল এবং তাহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হয়।

সিদ্ধমোহন বাবুর এই উক্তি লইয়া তখন কিছু আলোচনা হয়। তখন ইংরেজ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুখপত্র "পাইওনীয়ার' এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহার যে প্রতিবাদ করেন, তাহারই উল্লেখ আজ আমরা করিতেছি।

'পাইওনীয়ার' বলেন, কবিতা হিসাবে ও রচনাপারিপাট্যে "বন্দে মাতরম্" ফরাসী জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায় অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। "মার্সেলজ" বিদ্রোহদ্দীপক ও শাসনশৃঙ্খলাচ্ছেদক ; "বন্দেমাতরম্" কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ভক্তিমূলক। প্রথমটি ভাবোন্মাদনার প্রবর্ত্তক, দ্বিতীয় ভাবপ্রবণতার নিদর্শক। প্রথমটিতে আত্মদৃষ্টি নাই, পর পরকে মাতায়—সমাজকে নাচায়—নিজের দিকে চাহে না। "বন্দে মাতরম্" অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ; ইহার গায়ক আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ হইয়া মর্ম্মের কথার পরিচয় দেন; শ্রোতা শুনিয়া নিজের দিকে চাহেন এবং নিজ কর্ম্মহীনতার পরিচয় উপলব্ধি করিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গায়কের সুরে সুর মিশাইয়া গান করেন। "মার্সেলজ" শ্রোতার কর্ণে অহঙ্কারের মদিরাধারা ঢালিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলে ; "বন্দে মাতরম্" উপাসনার—প্রার্থনার সুধায় শ্রোতৃবৃন্দকে পূত ও উন্নত করে। "ম্যার্সেলজে" কবির হৃদয় নাই ; "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে কবি যেন আপনার আত্মা ঢালিয়া দিয়াছেন। উভয়ে এত প্রভেদ। "বন্দে মাতরম্" জাতির উদ্গত প্রার্থনা—আত্মাশক্তিকে স্বদেশের আধারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া "মা" বলিয়া তাঁহার উপাসনা অপরূপা শক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া জন্মভূমির জননী ও শক্তিরূপিণী জননীকে এক করিয়া "বন্দে মাতরম্" বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে বলিতেছে। ইহা রাজদ্রোহও নহে— প্রজার মনে বিদ্বেষ-বপনের চেষ্টাও নহে।

'পাইওনীয়ার' বলেন, 'আনন্দমঠ' বিদ্রোহের উপকথা (অর্থাৎ ইহার আখ্যানবস্তু বিদ্রোহ) হইলেও বিদ্রোহের উপন্যাস নহে। ইহা কেবল হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্মের উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। কোন্ পথে পুরুষাকারের বিকাশ করিলে, কোন্ সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, 'আনন্দমঠ' তাহাই শিক্ষা দিতেছে।

'আনন্দমঠে' চিকিৎসক সত্যানন্দকে যে কথা বলিয়া সঙ্গে লইয়া যায়েন—

"প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এ দেশে অনেকদিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রকাশ করা আবশ্যক। এখন এ দেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে।"

তাহার অনুবাদ করিয়া 'পাইওনীয়ার' বলেন—এ কথাও সত্য; য়ুরোপে খৃষ্টধর্ম্ম তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। য়ুরোপে জ্ঞানবিজ্ঞানের অত্যধিক প্রচার হইয়াছে; লোক নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে কর্ম্মপ্রধান হইয়া পুরুষকারবিশ্বাসী হইয়াছে। আদিমকালের অন্ধবিশ্বাসপূর্ণ, কুসংস্কারের নানা আবর্জ্জনাজড়িত খৃষ্টধর্ম্ম আপনা আপনিই অনেকটা অম্লানজ্যোতিঃ, যুক্তিসঙ্গত ও পবিত্র হইয়াছে। ইংরেজের সংস্রবে আসিয়া, বর্ত্তমান য়ুরোপের সমাজতন্ত্রের পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হইয়াছিল, যে উপায়ে খৃষ্টান য়ুরোপ "মানুষ" হইয়াছে, সেই উপায়ে প্রাচীন হিন্দু জাতিকে উন্নত করিতে হইবে। এই সুসঙ্গত বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠ" লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, জাতীয় স্থবিরতাই হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের অতঃপতনের মূল কারণ। স্থূল না ধরিলে সূক্ষ্ম পাওয়া যায় না। ইহকালের রক্ষা না হইলে পরকালের সাধনা সম্ভব নহে। হিন্দু স্থূল ছাড়িয়াছে, সুতরাং তাহার সূক্ষ্মের ধারণা নাই। হিন্দুর ইহকাল রক্ষা হয় না, কে পরকাল দেখিবে? 'আনন্দমঠে' প্রদর্শিত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যাহারা ইহকাল রক্ষা করিতে পারে না, পরকালে তাহাদিগের অধিকার নাই। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ইহকালের সাধনায় সিদ্ধ হইবার মানসে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসী—সর্ব্বত্যাগী হইবার সামর্থ্য অনেকের কেন, সকলেরই ছিল না। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠগণ ত্যাগের কষ্টিপাথরের যাচাইয়ে শ্যামিকাশূন্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারেন নাই। তাই সত্যানন্দের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। চিকিৎসক এই কারণেই উপদেশ দেন—যাহারা

বাহিরের দিকে দৃষ্টি দিতে জানে না, তাহাদিগের অন্তর্দৃষ্টি অসম্ভব; যে আপনার বিশ্লেষণ করিতে না পারে, সে সাধনার অধিকারী হয় না। যে আপনার সামর্থ্যের পরিচয় না রাখে, সে কর্ম্মী হইতে পারে না। কর্ম্মী ও সাধক হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাহ্য জগতের সংবাদ রাখিতে হয়। ইংরেজ জাতি এই শিক্ষার উপদেষ্টা। হিন্দু ঠেকিয়া, দুঃখ পাইয়া এই বহির্ব্বিদ্যা অর্জ্জন করুক, পরে অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা।

'পাইওনীয়র' বলেন—এই হিসাবে 'আনন্দমঠ' সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক। ডাক্তার গ্রিয়ার্শন বিলাতে এক বক্তৃতা করিবার সময় "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন এবং বলেন, যাঁহারা ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, যাঁহারা ভারতবাসীর কল্যাণকামী—ইংরেজ-ভারত-বাসি নির্ব্বিশেষে তাঁহারা সকলেই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন।

যখন এ দেশে দেশাত্মবোধের আন্দোলন বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের মত দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল—"overwhelming old traditions and carrying on its crest a flood of new ideas"—তখনই কোন ইংরেজ লেখক—এ দেশে ইংরেজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'পাইওনীয়ারে' "আনন্দমঠের" ও "বন্দে মাতরমের" এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। "বন্দে মাতরম্" মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র।

চুঁচুড়ায় এই "বন্দে মাতরমের" প্রসাধন হয়। গানে ও কবিতায় প্রভেদ আছে—গান যেমনভাবে ব্যাপ্তিলাভ করে, কবিতা তেমনভাবে ব্যাপ্ত হয় না। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের নব পর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' চুঁচুড়াবাসী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

"যখন 'আনন্দমঠ' সূতিকাগারে, তখন ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার একজন ডেপুটি ছিলেন; বঙ্কিমবাবু ত একজন ছিলেনই; উভয়ের পাশাপাশি বাসা। সন্ধ্যার পর তিনি আসেন, আমিও যাই, তিনি সুরজ্ঞ, টেবল হারমোনিয়ম লইয়া তিনি 'বন্দে মাতরম্' গানে মল্লারের সুর বসান। বঙ্কিমবাবুকে সুরের খাতিরে সামান্য অদল-বদল করিতে হয়।"

'আনন্দমঠে' তাহার মেরুদণ্ড "বন্দে মাতরমের" ঐ সুরটিই বঙ্কিমবাবু রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং "বন্দে মাতরমের" সহিতও চুঁচুড়ার যে সম্বন্ধ, তাহাও চুঁচুড়াকে বাঙ্গালার সাহিত্যিকের নিকট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। আজ আপনাদিগের আহ্বানে আমি সেই তীর্থে আসিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

এই চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের কথায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'সাধনায়'

লিখিয়াছিলেন—"আমার জীবনে সে একটা নবযুগ। সাহিত্য-চর্চ্চার সেই নবীন উৎসাহের সময় আপনা হইতে বঙ্কিমবাবু আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সৌভাগ্যগর্ব্বের একটা আনন্দ-হিল্লোল আমার শরীর মন অভিষিক্ত করিতেছিল।"

আজ চুঁচুড়ায় হুগলী জিলার বঙ্কিম শতবার্ষিকী উৎসবে আহূত হইয়া আমি আমার সাহিত্যিক-জীবনে তাঁহার উৎসাহের প্রভাব বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি। তখন আমি বালক। চৈতন্ত লাইব্রেরী "হিন্দু সমাজ ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেন। পরীক্ষক—বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসু। চন্দ্রনাথবাবু কোন কারণে প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিতে পারেন নাই—বঙ্কিমচন্দ্রই সে কাজ করিয়াছিলেন। যথাকালে লাইব্রেরীর সম্পাদক গৌরহরি সেন আমার গৃহে আসিয়া জানাইলেন—আমার প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন,—বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত লেখকের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমার বয়সের বিষয় অবগত হইয়া বলিয়াছেন—লেখককে বলিবেন, তিনি যে বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে প্রীতিলাভ করিয়াছি; তাঁহাকে বলিবেন, তিনি যেন লিখা ও পড়ার অভ্যাস রাখেন। আমি গুরুর আদেশজ্ঞানে তাঁহার সেই উপদেশ এই দীর্ঘকাল পালন করিয়া আসিয়াছি। আমার স্নেহভাজন—অকালনির্ব্বাপিতজীবনদীপ শিল্পী চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার একখানি ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন—তাহাতে তিনি আমাকে বহু ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন কাগজের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন—কাগজগুলিতে কালী ছড়ান। হয়ত আমার দীর্ঘ জীবনে লিখিত অনেক রচনাই কেবল সাদা কাগজে কালীর ছিটা—বিস্মৃত হওয়াই তাহাদিগের পরিণতি। হয়ত আমার অধ্যয়নেরও সম্যক সদ্ব্যবহার আমি করিতে পারি নাই। যদি তাহাই হয়, তবে সে জন্য আমার অক্ষমতাই দায়ী—গুরুর উপদেশ নিষ্ঠাসহ পালনে চেষ্টার শৈথিল্য সে জন্য দায়ী নহে।

আজ আমি তাঁহার উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। সে অর্ঘ্যও হয়ত তাঁহার উদ্দেশে নিবেদন করিবার যোগ্য নহে। কিন্তু আমি পুরাতন প্রসিদ্ধ কবি ভার্জ্জিল উদ্দেশে টেনিসনের কথা স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হইতেছি:—

"cast at thy feet one flower that fades away."

বন্দে মাতরম্